উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়

৺অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূরগতেষু—

বুলামণি

তোমার শেষ শয্যার শেষ অনুরোধে লেখা বই এই ছয় বৎসর বাদে শেষ হল। আমি তোমার বাড়ীতে এসেছি বটে, কিন্তু তুমি ত এলে না; আর তুমি যেখানে আছ সেখানে আমি যাবনা, সুতরাং দেখা আর হবে না। তোমার হুকুম [illegible] লেখা বই তুমি তোমার অদৃষ্ট-দেশ থেকে [illegible] [illegible]করিয়া কহিল, "দেখ তোমার যে নীল চোখ দুটি নি[illegible] [illegible]তে পারিবে না, তাহা বলিও এসেছিলুম তাই দিয়ে পোড়ে[illegible] [illegible], আর যাহাই হউক, অতিথি। অভুক্ত [illegible]হইতে ফিরিয়া গেলে অকল্যাণ হইবে। ঠাকুরপো!

[illegible] বৎস।"

আবার দৃষ্টী শক্তিহীন হইল। বন্ধু! নিকটে কি গ্রাম আছে? আমি আর চলিতে পারি না। বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে; আমাকে কিছু খাইতে দাও।" আগন্তুক এই বলিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। অন্ধ যুবা কহিল, "আপনি বিশ্রাম করুন। নিকটেই আমাদের গ্রাম। আমি একজন লোক ডাকিয়া দিতেছি। জনাব! আমরা হিন্দু, আমাদের ঘরে আপনাদের যোগ্য আহার ত মিলিবে না।"

মুসলমান বোধ হয় ক্ষুধার তাড়নায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধু! তুমি আর বিলম্ব করিও না,—আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উ[illegible]। মানুষে যাহা খাইতে পারে, তাহা পাইলেই আমি
তাঁহার আহার হয় না:

রমণী। হরির-লুটের সন্দেশ আছে। তুমি [illegible]
আমি লুচি ভাজিয়া আনিতেছি।

ব্রাহ্মণ। দেখ বড়বৌ, যা রয় সয় তাই ভাল বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। আমি জীবিত থাকিতে যদি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীর প্রসাদ ম্লেচ্ছ যবনের—

রমণী সহসা ব্রাহ্মণের মুখে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "দেখ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যে কথা রাখিতে পারিবে না, তাহা বলিও না। সে মুসলমান হউক, আর যাহাই হউক, অতিথি। অভুক্ত অতিথি গ্রাম হইতে ফিরিয়া গেলে অকল্যাণ হইবে। ঠাকুরপো! তুমি ব'স।"

"বৌদিদি ! আমি রাঙ্গাদাদার [illegible] চলিলাম। তুমি খাবার একখানা কলাপাতায় বান্ধিয়া রাখিও,—আমি অর্দ্ধ-দণ্ডের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

যুবা প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই গায়িতে বসিল,—

"ওমা শ্যামা হরমনোমোহিনী,
(আমি) তোমায় সেধে বেড়াই কেঁদে হৃরঙ্গবিলাসিনী—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোট রায়

গ্রামের অপর প্রান্তে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বিতলে এক মসীবরণা, প্রকাণ্ডকায়া, বিরলকেশা রমণী তাম্বুল সজ্জা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে রজত-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড তাম্বুলাধার,—তাহার উপরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য আধারে বহু উপকরণ। সম্মুখে দুই তিনজন দাসী,—কেহ সুপারি কাটিতেছে, কেহ বা পান ছিঁড়িতেছে। আরো দুইজন দাসী রূপার থালায় পান সাজাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিতেছে,—তিনি কেবল প্রত্যেক পানে মসলা দিতেছেন ; কারণ অঙ্গচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গৃহিণী যে স্থানে উপবিষ্টা, তাহা একটী দীর্ঘ দরদালান। তাহার এক

পার্শ্বে প্রশস্ত কাশ্মীরি গালিচা, সম্মুখে সতরঞ্চীর উপর তাম্বুল-সজ্জা বিস্তৃত। দরদালানের অপর প্রান্তে এক গৌরবর্ণ যুবা প্রবেশ করিল এবং গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠান! কর্ত্তার আমলের সোণার বাটাটা কোথায়?"

গৃহিণী সম্মুখের দাসী হস্তস্থিত রজতপাত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "তা আমি কি জানি,—ভাণ্ডারে গিয়া দেখ।"

দেখিয়াছি "ভাণ্ডারে নাই।" "তবে হয়ত চুরি গিয়াছে।"

"ভাণ্ডারী বলিল আপনার হুকুমমত তাহা উপরে আসিয়াছে।"

"আমি কি তোমার পানের বাটা চুরি করিয়া রাখিয়াছি না কি?"

"শুনিলাম সে বাটা ঈশ্বরগঞ্জে গিয়াছে।"

ঈশ্বরগঞ্জের নাম শুনিয়া গৃহিণী প্রশস্ত বদন উত্তোলন করিলেন। সুগোল আবলুস্ বৃক্ষ কাণ্ড সদৃশ বাহু কাণ্ডের তাড়নায় রজতপাত্রে সজ্জিত তাম্বুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পাত্রধারিণী দাসী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। গৃহিণী কহিলেন, "যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ঈশ্বরগঞ্জের লোক কি খাইতে পায় না, যে, রায় গোষ্ঠীর বাসন চুরি করিতে আসিবে? তুই আমার অন্নে মানুষ তোর এ কথা বলিতে লজ্জা হয় না? আমার স্বামীর বাসন,—আমি যাহা খুসী করি না কেন তাহাতে কাহার কি! তবুও যদি এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা থাকিত। আমি দেখিয়া লইব, তুই কি করিয়া আর এ বাড়ীতে বাস করিস্!"

এই বলিয়া গৃহিণী দরদালান ত্যাগ করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। যুবার মুখ ক্রোধে

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া একটা বিকট উত্তর দিতে যাইতেছিল—সহসা তাহার পশ্চাৎ হইতে একজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। যুবা আরো রাগিয়া গিয়া, নবাগতের হাত ধরিয়া তাহাকে দরদালানে টানিয়া আনিল। আগন্তুক উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদা! তুমি কিছু বলিতে পাইবে না। যাহা বলিতে হয় বড়দাদা আসিলে বলিও।"

প্রথম যুবা আগন্তুককে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাটিয়া গেল। দাসীরা তাহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া যে যে দিকে পথ পাইল, সরিয়া পড়িল। উত্তর না পাইয়া গৃহিণীর মনে বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল; তিনি দুয়ারের ফাঁক দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। পুরুষ দুইজনকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি কবাট খুলিয়া বলিলেন, "মারিবি নাকি, আয় না!"

আগন্তুক যুবাকে দৃঢ়তর ভাবে জড়াইয়া ধরিল এবং কহিল, "দাদা! দোহাই তোমার, কিছু বলিও না।"

যুবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, না ভাই, কিছু বলিব না। সে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "বৌঠাণ্! আমি ঈশ্বরগঞ্জের গোলাম কায়েত নহি। রায় বংশে কেহ কখনো স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে নাই। তুমি বড় ভাইয়ের স্ত্রী,—মাতৃতুল্যা। আজ তুমি আমার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছ। যে গৃহে তুমি বাস করিবে সে গৃহের অন্ন আর এ মুখে তুলিব না।"

যুবা এই বলিয়া দূর হইতে গৃহিণীকে প্রণাম করিল, এবং আগন্তুকের হাত ধরিয়া অট্টালিকা ত্যাগ করিল। পথে আসিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! কোথায় যাইতেছ?"

"যে দিকে দুই চোখ যায়। ভাইটী, তুমিও আমার সঙ্গে চল, তোমার মুখ চাহিয়া বহু অপমান, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। চুপ্! আজি আর পারিলাম না। তালুক-মুলুক, ঘর-বাড়ী—আমাদের যাহা ছিল, দাদা সমস্তই নিজে লইয়াছেন। বাবার আমলের অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রায় সমস্তই ঈশ্বরগঞ্জে গিয়াছে। একজোড়া সোণার বাটা অবশিষ্ট ছিল—এখন তুমি বড় হইয়াছ, আর কিসের জন্য অপমান সহ্য করিব ভাই?"

অন্ধের দৃষ্টিহীন নেত্রদ্বয় ভ্রাতার মুখের দিকে ফিরিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! বাড়ী ছাড়িয়া যাইব? তবে কি বাড়ী আমাদের নহে?"

"না ভাই—বাড়ী দাদার, অর্থাৎ বৌদিদির। পাছে আমাদের অংশ দিতে হয় সেই ভয়ে দাদা বাড়ীর জমি বৌদিদির নামে খরিদ করিয়াছেন।"

"তবে কোথায় যাইব?" "যেখানে ভগবান্ আশ্রয় দেন।" "বিদ্যালঙ্কার-বাড়ী গেলে হয় না?" "না ভাই, এ গ্রামে আর একদণ্ড থাকিব না। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে?"

অন্ধ উভয় হস্তে ভ্রাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদা! আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও বাঁচিব না। তুমি যে স্থানে যাইবে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। কিন্তু

তোমাকে একদণ্ড অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি গঙ্গার ধারে অশ্বথ-তলে এক অতিথি রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যাইতে পারিব না।"

"ভূপ্‌! এখন কোথায় কি পাইবি ভাই, যে অতিথিকে খাওয়াইবি?" "তুমি সে চিন্তা করিও না দাদা,—আমি ভট্টাচার্য্য-বৌকে খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। তুমি কি মনে কর যে, বৌঠান্‌ আমার অনুরোধে কোন দিন একটা কুকুরের এক মুষ্টিও অন্ন দিবে?" "কিন্তু ভূপ্‌! এখন বিদ্যালঙ্কার বাড়ী গেলে ধরা পড়িয়া যাইব।" "তুমি না হয় তফাতে থাক।" "না, চল্‌ যাই,—সুদর্শনকে বলিয়াই যাইব!" "অমন কাজটী করিও না দাদা;—তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য দাদা গ্রামময় ঢাক পিটাইয়া বেড়াইবে।" "ভাল, কিছু বলিব না। কিন্তু চল, তাহার সহিত দেখা করিয়া যাই,—আর হয় ত এ গ্রামে ফিরিব না।"

উভয়ে বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দূর হইতে সুদর্শন ভট্টাচার্য্যের গীতধ্বনি শ্রুত হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিল, "ভূপ্‌! সুদর্শন আলাপ করিতেছে, এখন কি বিরক্ত করিব?" "দাদা! বিলম্ব করিলে চলিবে না, আমার অতিথি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত।"

উভয় ভ্রাতা দ্বারে করাঘাত করিল। সুদর্শন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভূপেটা বুঝি! দাঁড়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" কিন্তু সে রুদ্ধ-দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, সম্মুখে আর

একজন দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে ব্রাহ্মণ-সুলভ ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কে, ছোটরায়! আয় ভাই, একটা নূতন গান বাঁধিয়াছি।" যুবা ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া পরে প্রণাম করিল, এবং কহিল, "দাদা! তোমার নূতন গান শুনিতে অনেক বিলম্ব হইবে, আমি এখন বিদেশে চলিয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর।"

এই সময়ে দুইটী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিল। একজন সধবা, অন্য জন বিধবা। সধবা কদলীপত্রে-জড়িত কিছু খাদ্য অন্যের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! ফিরিবার সময় এই পথ দিয়া যাইতে ভুলিও না,—তোমার জন্য প্রসাদ রাখিযাছি।"

বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া সুদর্শন ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আ মর মাগি, রাখ্ তোর প্রসাদ! অসীম আর ভূপেন যে বিদেশে চলিল!" রমণীদ্বয় আশ্চর্য্য হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বিদেশ! কোথায়?" যুবা কহিল, "দিল্লী।"

বিধবা আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এবং অন্ধের হস্তাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল। ব্রাহ্মণ বীণা পরিত্যাগ করিয়া যুবার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "হ্যাঁরে অসীম! তোরা চলিয়া যাইবি, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব?"

যুবা কহিল, "ভয় কি দাদা! আমরা ফিরিলাম বলিয়া। তুমি মন দিয়া গান বাঁধিতে থাক,—আমরা আসিয়া এক মজলিসে

সমস্ত গান শুনিয়া লইব। আর বিলম্ব করিব না, সওয়ারী দাঁড়াইয়া আছে।”

উভয় ভ্রাতা, সুদর্শন, তাহার পত্নী ও ভগিনীকে প্রণাম করিয়া বিদ্যালঙ্কার-গৃহ পরিত্যাগ করিল। আম্র-পনসবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম পরিত্যাগ কালে, পদশব্দ শুনিয়া উভয় ভ্রাতা চমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটী রমণী দ্রুতপদে তাহাদের নিকটে আসিল। যুবা জিজ্ঞাসা করিল, “কে ?” রমণী কহিল, “দাদা! আমি দুর্গা। অন্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কে দিদি? তুমি অন্ধকারে বাগানে আসিলে কেন ?” রমণী তাহাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া যুবাকে কহিল, “দাদা! আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে।” “কি অনুরোধ দিদি ?” “দেখ দাদা! তোমরা, পুরুষেরা যাহা কথায় প্রকাশ কর না, তাহা মুখের ভাবে প্রকাশ হইয়া যায়। সে মুখের ভাবের ভাষা পুরুষে সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু রমণী তাহা সহজেই পারে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তোমরা গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছ। কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছ, তাহা সকলেই জানে। দেখ দাদা! তোমার মত আমিও ভূপ্‌কে তিন বৎসরের ছেলে মানুষ করিয়াছি; সুতরাং আমিও তাহার উপর কিছু দাবী রাখি। এই পুঁটুলিতে যাহা আছে, তাহা আমার স্বামীর সম্পত্তি; সুতরাং এখন ইহাতে আমি ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। আমি। ইহা ভূপ্‌কে দিলাম, ইহা তাহার জন্য ব্যয় করিও।”

দুর্গাঠাকুরাণী যুবার হস্তে একটা গুরুভার পদার্থ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। এই সময় আম্রবৃক্ষের নিম্নের অন্ধকার হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি চাও?" যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ব্যক্তি প্রণাম করিল এবং কহিল, "কে, ছোট হুজুর? অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই, আমি নবীন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অতিথি

গ্রাম-সীমা পরিত্যাগ করিয়া যুবা অন্ধ বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপ্! তোর অতিথি কে ভাই?" বালক কহিল, "একজন চোগ্‌তাই।" "চোগ্‌তাই?" "হাঁ দাদা! খাঁটি মোগল! বাঙ্গলা বা হিন্দী একেবারে বুঝে না। শিকার করিতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কথা বুঝে না বলিয়া সারা দিন খাইতে পায় নাই। বৌঠানের কাছে যে কিছু পাইব না, সে ত জানাই কথা। আমি ভট্টাচার্য্য-বৌকে খাবার করিতে বলিয়া, তোমাকে ডাকিতে যাইতেছিলাম। দাদা! তাঁহাকে সহরে পৌছাইয়া দিতে হইবে।"

"ভালই হইয়াছে ভাই। সহরে গেলে বড় দাদার লোকে আমাদের সহজে মারিতে পারিবে না।" "হাঁ দাদা, বড়দাদা

আমাদের মারবে কেন?” “কি বুঝিবে ভাই! বিষয় বড়ই জঞ্জাল।” “বিষয় ত আমরা লিখিয়া দিয়াছি দাদা, তবে আমাদিগকে মারিবে কেন?” “পাছে আর কখনো দাবী করি। বিষয়ের কথা যদি নবাব-সরকারে বা বাদশাহের দরবারে পৌঁছে, তাহা হইলে বড়দাদার বড়ই অপমানের কথা।” “দাদা! তবে চল না নবাবকে বিষয়ের কথা বলিয়া দিই।” “নবাব বড়দাদার বড়ই বাধ্য, তাঁহাকে দয়িা আমাদের কোন উপকার হইবে না।” “বাদশাহও কি বড়দাদার বাধ্য?” “না। বাদশাহের দর-বারেই যাইব মনে করিয়াছি। বড়দাদার অবিচার দেখিয়া, অনেক দিন ধরিয়াই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি যে, একদিন দিল্লী যাইব। আজই সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। তোর অতিথি কোথায়?” “ঐ যে!”

এই সময়ে সেই পথভ্রান্ত মুসলমান অশ্বত্থ-তলের অন্ধকার হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দোস্ত! তুমি কি সেই?”

ভূপেন্দ্র পার্সিতে জবাব দিল, “জনাব! অপরাধ মাফ করিবেন,—আপনার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।” “তুমি যে মোটের উপর ফিরিয়া আসিয়াছ, এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। অন্ধকার হইয়া গেল, রাত্রিতে নদী পার হইব কি করিয়া?” “সে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।” “বন্ধু! তুমি একজন ফেরেশ্‌তা।”

উভয় ভ্রাতা অশ্বত্থ-মূলে কদলীপত্র বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য

সাজাইয়া দিল। তাহাদিগের অতিথি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; সে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষুধা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! তোমার সঙ্গে কে?" ভূপেন্দ্র কহিল, "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ। ইহাকে ডাকিতে গিয়াই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।" "বন্ধু! তুমি বোধ হয় আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে?" "হাঁ।" এই এই সময় ভূপেন্দ্র কহিল, "আমরা দুইজনেই যাইব।" আগন্তুক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও যাইবে? অন্ধকারে তোমার কষ্ট হইবে না দোস্ত?" ভূপেন্দ্র কহিল, "অন্ধকারে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি জনাব, এখনো বহুদূর যাইতে হইবে।" "কতদূর আসিয়াছ?" "বিশ বৎসরের পথ।" "অঃ! সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, মাফ্ করিও দোস্ত! আলোক ও অন্ধকার যে তোমার নিকট সমান, তাহা মনে ছিল না। তোমরা কি আজই রাত্রিতে ফিরিয়া আসিবে?" "না, রাত্রিতে সহরে থাকিয়া সকালে অন্যত্র যাইব।" "কোথায় যাইবে?" "সে কথা পরে বলিব। এখন চলুন, রাত্রি বাড়িয়া চলিল।"

অশ্বত্থ-তল ত্যাগ করিয়া তিনজনে নদীর দিকে চলিল। নদীতীরে বেণু-কুঞ্জের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে ক্ষুদ্র প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একজন মনুষ্য জাল বুনিতেছিল। ভূপেন্দ্র তাহাকে দূর হইতে ডাকিল, "কেনা দাদা!" ধীবর জাল রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? খোকাবাবু? অন্ধকারে

এতদূর কেন আসিয়াছ ভাই?" ভূপেন্দ্রের পশ্চাৎ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কেনা! আমি আসিয়াছি, শীঘ্র বাহিরে আয়।" তাহার কথা শুনিয়া ধীবর চমকিত হইয়া উঠিল; এবং জাল দূরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "হুজুর, যাই।" কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?" ধীবর তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "থাম মাগি, কাহাকে কি বলিস্. হুঁস্ থাকে না। দেখিতেছিস্ না, ছোটরায় আর খোকাবাবু আসিয়াছে!"

এই সময় ভূপেন্দ্র কহিল, "কেনা দাদা! নাও ঠিক্ কর,—আমরা সহরে যাইব।" "ছিপ্ আনিব? না, পান্সী বাহির করিব?"

"পান্সী।" কুটীরের নিম্নে একখানি ছোট পান্সী বাঁধা ছিল, ধীবর একখানি দাড় লইয়া পান্সীতে উঠিল এবং ভূপেন্দ্রের হস্তে হাল্ দিয়া নৌকা কিনারে টানিয়া আনিল; সকলে নৌকায় উঠিলে, সে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অল্প দূর উজাইয়া লইয়া গিয়া, কেনারাম পাড়ি জমাইল; এবং অনুচ্চ স্বরে ভূপেন্দ্রকে কহিল, "খোকাবাবু! কোথায় যাইতেছ?" ভূপেন্দ্র কহিল, "কেন, বলিলাম যে সহরে যাইব?"

"এত রাত্রিতে সহরে?" "নিমন্ত্রণ আছে।" "বড় কর্ত্তার নিমন্ত্রণ নাই?" "তিনি অনেক রাত্রিতে দরবার হইতে ফিরিবেন, যাইতে পারিবেন না।" "এ বেটা কে? মুসলমান দেখিতেছি?" "হ্যাঁ, চোগ্‌তাই।" "চোগদার ত ব্রাহ্মণ? এ বেটা নিশ্চয়

মুসলমান।" "মুসলমান-ই ত! চোগ্‌তাই মানে মোগল, চোঙ-দার নয়।" "ও বাবা, তাই বুঝি! খোকাবাবু, এ বেটা বাঙ্গলা বুঝে না কি?" "না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ও বাঙ্গলা, হিন্দী কিছুই বুঝে না।" "বাঁচলাম। বেটা যাইবে কোথায়?" "লালবাগে।" "লালবাগে শুনিয়াছি বাদশাহের নাতি থাকে। সেখানে গেলে রাত্রে ফিরিতে পাইব ত?" "ভয় কি কেনাদাদা, আমরা সঙ্গে রহিয়াছি।"

দেখিতে-দেখিতে নৌকা পরপারের নিকটে আসিল। তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিলেন, "ভূপেন! দেখ্‌ ত, দুর্গা কি দিয়া গেল!" ভূপেন্দ্র বস্ত্রমধ্য হইতে একটী থলিয়া বাহির করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে দিল। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "এ যে সমস্তই মোহর!"

"আমি তাহা স্পর্শ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।"

"গুণিয়া দেখ্‌।" ভূপেন্দ্র গুণিয়া কহিল, "এক হাজার এক।" "সে যে অনেক টাকা রে।" "দুর্গা-দিদির স্বামীকে ত্রিপুরার মহারাজা প্রণামী দিয়াছিলেন।"

এই সময় পান্‌সী তীরে লাগিল। নদীবক্ষে বিস্তৃত বালুকা-ক্ষেত্র, এবং নদীতীরে সুদৃশ্য, সুরম্য, নবনির্ম্মিত মুর্শিদকুলি খাঁর নগর। নৌকা হইতে তীরে নামিয়া অসীম ধীবরকে কহিলেন, "কেনারাম! তুমি ফিরিয়া যাও। বাড়ী ফিরিয়া রায়-গৃহিণীকে কহিও, ছোটরায় বিদায় হইয়াছে,—আর তাহার অন্ন ধ্বংস করিতে আসিবে না।" বৃদ্ধ ধীবর ভাগীরথীর জলে দাঁড়াইয়া

ক্ষুদ্র নৌকার কণ্ঠ আকর্ষণ করিতেছিল ;—সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা, ছোট হুজুর !"

"সত্য কথা। কেনারাম ! বড় কর্ত্তাকে বলিও, অন্নক্ষয়ের ভয়ে গৃহিণী আমাদিগকে বিদায় করিয়াছেন। ভূপেন্ ! কেনাকে একটা মোহর দে।" ভূপেন্দ্র যখন বৃদ্ধকে মোহর দিতে গেল, তখন কেনারাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং কহিল, "খোকা ভাই ! খোকা ভাই ! তুই কোথা যাবি ভাই ?"

আগন্তুক মুসলমান বিস্মিত হইয়া তাহাদিগের বিদায় অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি এই সময় অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোস্ত্ ! তোমরা কি দেশ ছাড়িয়া যাইতেছ ?" উত্তর হইল, "হাঁ, জনাব !"

"কেন ?" "উদরান্ন উপার্জ্জনের জন্য।" "কোথায় যাইবে ?" "জনাব ! অপরাধ মাফ্ করিবেন, এই প্রশ্নটীর উত্তর দিতে পারিব না। আর যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারই উত্তর পাইবেন।" "এই বৃদ্ধ নাবিক কে ?" "আমার পিতার পুরাতন ভৃত্য।"

মোগল বস্ত্রমধ্য হইতে একটী থলিয়া বাহির করিয়া, কয়েকটী মুদ্রা অসীমকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "ইহা তোমার ভৃত্যকে দাও।"

অসীম দেখিল মুদ্রা কয়টী স্বর্ণমুদ্রা। সে মোগলকে কহিল, "জনাব ! এ যে আশরফি !"

মুসলমান কহিলেন, "তাহাতে কি হইয়াছে ?"

"আমি মনে করিলাম যে, আপনি ভুল করিয়া টাকার বদলে মোহর দিয়াছেন।"

"না, জানিয়াই দিয়াছি।"

ভূপেন্দ্র বহু কষ্টে বৃদ্ধ ধীবরের আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া সৈকত ত্যাগ করিল। নদীতীরে রাজপথে জনৈক মুসলমান অশ্বারোহী নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল। মোগল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোস্ত তুমি কি আহদী?" অশ্বারোহী তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অভিবাদন করিল। মোগল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম নাম কি?" অশ্বারোহী কহিল, "জনাব! আমি লুৎফুল্লা। আপনি ফিরেন নাই বলিয়া চারিদিকে সওয়ার ছুটিয়াছে।"

"লালবাগ কতদূর?"

"পাও কোশ্।"

"আমি তোমার ঘোড়া লইয়া চলিলাম। তুমি এই দুইজন হিন্দুকে গোসলখানায় লইয়া আইস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

হিজরার ১১২৫ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ্ আলম বহাদুরের

মৃত্যু ও মোগল-গৌরব-রবির অবসান হইয়াছিল। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের বংশধরগণের মধ্যে যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ দাক্ষিণাত্যবাসী মারাঠার ভিক্ষান্নভোজী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—শাহজহানের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শাহ আলম বহাদর বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অভিষেকের সময় হইতেই তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেব যখন জীবিত, তখনই শাহ আলমের মধ্যম পুত্র আজীম-উশ্-শান্ পিতামহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু কাল বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ফরুক্‌খ্‌সিয়রকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া দিল্লী যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ফরুক্‌খ্‌সিয়র কিছু দিন ঢাকায় বাস করিয়া, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১২৪ হিজরায় মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসের পাত্র, মহারাষ্ট্রদেশে রাষ্ট্র-ব্যাপারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জফরকুলি খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি পাইয়া সুবা বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন আজীম্-উশ্-শান বাঙ্গালার সুবাদার। উদ্ধত প্রকৃতি আজীম-উশ্-শানের সহিত দেওয়ান্ মুর্শিদকুলির সদ্ভাব ছিল না। অল্প কাল মধ্যে আজীম-উশ্-শান্ মুর্শিদকুলিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেওয়ান্ বাদশাহের অনুমতি

লইয়া ঢাকা বা জহাঙ্গীর নগর হইতে রাজস্ববিভাগ মখ্সুসাবাদে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মখ্সুসাবাদ দেওয়ানের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার একটী প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে ঢাকা শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্প দিন মধ্যেই রাজধানী ও মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

বাদশাহী রাজস্ববিভাগ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিলে, বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশে আসিয়া ধর্ম্মান্ধ মুর্শিদকুলির নগরে বাস করেন নাই। মুর্শিদকুলি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের একজন প্রিয় ছাত্র। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ মরণকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এইজন্য কানুনগোই হরনারায়ণ রায় প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে একখানি নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রামের নাম ডাহাপাড়া অর্থাৎ ঢাকাপাড়া। মোগল-সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ডাহাপাড়া গ্রাম এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে বিদ্যমান আছে।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ডাহাপাড়া একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। কানুনগোই হরনারায়ণ রায় তখন এই গ্রামের অধিকারী। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ রায় দীর্ঘকাল রাজস্ববিভাগ পরিচালনা করিয়া প্রভূত অর্থ ও যশোপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনারায়ণ আওরঙ্গজেবের আদেশে কানুনগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যেদিন পথভ্রান্ত মোগল ডাহাপাড়া গ্রামে আসিয়াছিলেন, সেইদিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগে হরনারায়ণ কাছারী করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। কানুনগোইএর বৃহৎ ছিপ্ ডাহাপাড়ার ঘাটে আসিয়া লাগিল। চারি পাঁচজন মশালচি ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা ছিপ্ দেখিয়া মশাল জ্বালিল। মশালের আলোকে অ[illegible]র ঘাট দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হরকরা, আসা ও সোটাবরদার-পরিবৃত হইয়া সুবা বাঙ্গলার কানুনগোই হরনারায়ণ রায় ছিপ্ হইতে নামিলেন। এই সময়ে ঘাটের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষতল হইতে এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। হরকরা ও আসাবরদারেরা তাহাকে তফাৎ করিয়া দিতেছিল,—কিন্তু হরনারায়ণ তাহাদের নিষেধ করিয়া, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কেনা, কি হইয়াছে?" বৃদ্ধ কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ছোট কর্ত্তা আর খোকাবাবু গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"কোথায় গিয়াছে?" "তাহা ত বলিতে পারি না হুজুর! তবে তাহারা একেবারে গিয়াছে, আর আ[illegible]বে না।" "তুই কেমন করিয়া বুঝিলি যে, আর আসিবে [illegible]?" "আমাকে যে বলিয়া গেল!" "তাহারা কোন্ দিকে গেল, বলিতে পারিস্?" "আমি পান্সী করিয়া তাহাদের লালবাগের ঘাটে রাখিয়া আসিয়াছি।" "লালবাগ?" "হাঁ, হুজুর।" "সঙ্গে আর কে ছিল?" "একজন মুসলমান।" "মুসলমান কোথা হইতে

আসিল?" "তাহা বলিতে পারি না হুজুর।" "সে দেখিতে কেমন?" "গৌরবর্ণ, পাত্‌লা চেহারা; অন্ধকারে মুখ ভাল দেখিতে পাই নাই। পিঠে বন্দুক আর ধনুক, কোমরে তলোয়ার।" "তুই কাঁদিস্ কেন?" "হুজুর খোকাবাবু—" "ভয় নাই, তুই ঘরে যা, আমি কালই তাহাদের ফিরাইয়া আনিব।"

বৃদ্ধ ধীবর চোখ মুছিতে-মুছিতে বিদায় হইল। অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া হরনারায়ণ গৃহে চলিলেন। তাঁহার অট্টালিকার নিম্নতলে বৈঠকখানায় এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ একাকী নিবিষ্ট মনে সতরঞ্চ খেলিতেছিল। সুবা বাঙ্গলার প্রতাপান্বিত কানুনগোই গৃহে ফিরিলেন,—আম্‌লা চাকর নফর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল,—কিন্তু ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল না। বৈঠকখানার দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভট্টচাজ, এখনও বাড়ী ফির নাই যে?" ব্রাহ্মণ মুখ না তুলিয়াই কহিল, "তুমি যাও, যাও,—বিলম্ব করিও না,—কাপড় ছাড়িয়া আইস। এতক্ষণে তিনবাজি খেলা হইয়া যাইত।"

"রাত্রি কত, খবর আছে?"

"এই চারি দণ্ড।" "ঐ শোন, দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিল।" "দ্বিতীয় প্রহর? এত দেরী করিয়া আসিলে কেন?" "আজ আসল তুমার জমা'র খসড়া শেষ হইল।" "ঝাড়ু মারি তুমার জমার মুখে। একটা দিন মাটি হইয়া গেল!" "তুমি পলাইও না। শুনিতেছি, অসীম ও ভূপেন্ চলিয়া

গিয়াছে। পরামর্শ করিয়া যাহা ... একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

হরনারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কানুনগোইএর প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে প্রশস্ত দরদালানে বহু-নারী-পরিবেষ্টিত রায়গৃহিণী দরবার করিতেছিলেন। সেই দরবারে, কুলমহিলা ও দাসী-বেষ্টিতা গৃহিণীর মসনদের নিকটে একজন মাত্র পুরুষ বসিয়া ছিল। গৃহিণী সহাস্য বদনে তাহার সহিত আলাপ করিতে ছিলেন। কর্ত্তার পদশব্দ শুনিয়া গৃহিণীর প্রসন্ন মুখ সহসা অপ্রসন্ন হইয়া উঠীল। হরনারায়ণ দরদালানে প্রবেশ করিলে, অনুচরীবৃন্দ অবগুণ্ঠন টানিয়া পলাইল। নবীন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, গৃহিণী মুখ বাঁকাইলেন। হরনারায়ণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, “শুনিলাম, অসীম আর ভূপেন না কি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে?” গৃহিণীর বিপুল নাসিকায় বৃহৎ নথ প্রবল বেগে দুলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণ প্রমাদ গণিলেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, “ছোট কর্ত্তার মাথাটা একটু বিগড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।” এইবার গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মুখ বিপরীত দিকে ফিরাইয়া, গুরুগম্ভির কণ্ঠে কহিলেন, “আগে কিছুদিন দুধ দিয়া কালসাপ পোষ!” হরনারায়ণ এইবার সাহস পাইলেন। তিনি গৃণীর মসনদের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাইবার সময় কি তোমাকে কিছু বলিয়া গিয়াছে?” গৃহিণীর মুখ ফিরিল না,—তিনি উত্তর দিলেন না। তাঁহার প্রিয় বয়স্যা

দাসী রতনমণি ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া, দ্বারের অন্তরাল হইতে কহিল, "কর্ত্তা! আমাকে ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইয়া দেন,—আমি নিত্য-নিত্য মনিবের এত অপমান সহিতে পারিব না।" হরনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো রতন! আজ আবার কি হইল?" রতন মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আজ ঈশ্বরগঞ্জের বাবুরা চোর হইয়াছে।" এইবার গৃহিণীর বরবপু ফিরিল, সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার ঝঙ্কার করিয়া উটিল, তাঁহার রক্ত-নেত্রের ক্রুর দৃষ্টির উত্তাপে হরনারায়ণ যেন ঝলসিয়া গেলেন। গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "আর ঈশ্বরগঞ্জের চোদ্দপুরুষের সংবাদটা বলিতে পারিলি না?"

আওরঙ্গজেবের ছাত্র কূটনীতিবিশারদ হরনারায়ণ বুঝিলেন, যে রণনীতিকুশলা গৃহিণী দুর্ভেদ্য ব্যূহ সাজাইয়া বসিয়াছেন; এখন ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। তখন তিনি বিচক্ষণ সেনাপতির ন্যায় সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, ভাই বলিয়া এতদিন কিছু বলি নাই,—কিন্তু তাহার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—" গৃহিণী অবসর বুঝিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। প্রিয়া দাসী রতনমণি অশ্রুহীন নেত্রে বস্ত্র মার্জ্জনা করিয়া, তাহা রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। হরনারায়ণ এই অবসরে গৃহান্তরে পলায়নের উপক্রম করিতেছিলেন; তাহা দেখিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "যাও কোথা, গুণের ভাইয়ের গুণের কথাটা একবার শুনিয়া যাও।"

"আবার কি?" "আবার কি! তোমার প্রাণের বন্ধু হরি-

নারায়ণের রূপসী, বিদুষী, সতীলক্ষ্মী কন্যা দুর্গা ঠাকুরাণীর সহিত—"

"রাধে মাধব, বল কি!"

"বলি কি, এই নবীনের মুখে শুন। আজ রাত্রিতে কিরীটেশ্বরীর পথের ধারে, ষষ্ঠিতলার মাঠে, গাছতলার অন্ধকারে ভট্টাচার্য্যের কন্যা প্রাণেশ্বরের গলা জড়াইয়া হাপুস্ নয়নে কাঁদিতেছিল। নবীন তাহার নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, নিজের কাণে শুনিয়া আসিয়াছে। দুর্গার প্রাণেশ্বর কে জান? তোমার সোদর লক্ষ্মণ!"

এই সময়ে নরসুন্দরকুলতিলক নবীন বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হুজুর, ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি? দুই দণ্ড রাত্রিতে ষষ্ঠিতলার মাঠ পার হইতেছিলাম। কিরীটেশ্বরীর পথের ধারে ছোট হুজুর আর দুর্গা ঠাকুরাণী—"

হরনারায়ণ অবশিষ্টের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান

সত্বর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া হরনারায়ণ অন্য পথে সদরে ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালঙ্কার তখন সতরঞ্চের গুটি সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, হরনারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ভট্চাজ্! আজ হাতীর দাঁতের সতরঞ্চ উঠাও, দুনিয়ার সতরঞ্চ

খেলায় দুইটা বড় চাল দিতে চাহি, মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া "একটা পরামর্শ দাও দেখি?" বিদ্যালঙ্কার মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "দেখ এ হাতীদাঁতের সতরঞ্চের তুল্য জিনিষ আর নাই; তুমি ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলে না। অনিত্য সংসার চিন্তায় দিন কাটাইলে, সংসারে তোমার কে আছে বল দেখি?" "বাজে কথা রাখ, এই সংসারে যতক্ষণ আছি, নিত্য হউক অনিত্য হউক, ততক্ষণ এই সংসারের চিন্তা লইয়াই থাকিতে হইবে। দেখ বিদ্যালঙ্কার, আজ এক চালে জ্ঞাতি শত্রু দুইটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছি।" "কাজটা কি ভাল করিয়াছ ভাই?" তোমার মাতৃ-গর্ভজাত না হইলেও অসীম ও ভূপেন তোমার পিতার ঔরসজাত সন্তান। তুমি নিঃসন্তান, তোমার সন্তান লাভের আশা অতি অল্প। হরনারায়ণ! দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে হিসাব নিকাশের সময় অতি নিকট, অনাথ বালক দুইটিকে কেন তাড়াইলে?" "আরে তুমি থাম হে? ভাল ধর্ম্ম শাস্ত্রের বক্তৃতা জুড়িয়া দিলে। কথাটাই আগে শুন।" "কি করিয়া তাড়াইলে?" "কর্ত্তার আমলের সোনা রূপার বাসন যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ ঈশ্বরগঞ্জে সরাইতে ছিলাম, একটা পাঁচশত ভরির সোনার বাটা কর্ত্তা ব্যবহার করিতেন, আজ প্রাতঃকালে ভাণ্ডারীকে সেটা ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছিলাম। যখন যাহা ঈশ্বরগঞ্জে যায় ভাণ্ডারী আমার হুকুম মত সে সংবাদটা অতি গোপনে অসীমকে দিয়া থাকে। বাকীটা গৃহিণীর কল্যানে সুসম্পন্ন হইয়াছে; অসীম ভূপেনকে লইয়া বাড়ী

ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।” “আহা ভূপ একে অন্ধ তাহাতে আবার কখনও বিদেশে যায় নাই। পৈত্রিক তালুকের অংশটা দিবে ত?” “ভাল জ্বালা, তাহাই যদি দিব তবে তোমার সহিত পরামর্শ করিতেছি কেন? দেখ আলমগীর বাদশাহ ফৌৎ করিবার পরে তালুক মুলুক রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিষয়ের অংশটা আমার নামেই লিখাইয়া লইয়াছি।” “একাজ কবে করিলে?” “প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে।” “অসীম যে লিখিয়া দিল?” “তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে নাবালকের বিষয় রক্ষা করা একরকম অসম্ভব, বরঞ্চ সমস্ত তালুকটা যদি আমার নামে থাকে তাহা হইলে বাদশাহের কানুনগোই এর খাতিরে কেহ কিছু অনিষ্ট না করিতেও পারে। বাদশাহের বয়স সত্তর বৎসরের অধিক, তখ্‌ত লইয়া শীঘ্রই আবার একটা গজকচ্ছপের লড়াই বাধিবে। দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিলে তোমাদের অংশ আবার তোমাদের ফিরাইয়া দিব। এইকথা বলায় অসীম ও ভূপেন দুইজনেই পরগণে রোকনপুরের পাঁচ আনা ছয়গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি অংশ আমার নামে লিখিয়া দিয়াছে।”

“হর! তুমি আমার বাল্য বন্ধু। একটা কথা তোমাকে অনেক দিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি কিন্তু তাহাত কখনো কানে তুলিলে না? দেখ, তোমার পিতার অন্নে একদিন জাহাঙ্গীর নগরের অর্দ্ধেক লোক প্রতিপালিত হইত। তাঁহার তালু

পরগণে রোকণপুর একটা রাজার রাজ্য বলিলেও চলে, তাঁহার মত সোনা রূপার আসবাব অনেক আমীরের ঘরেও নাই। তুমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার পদ পাইয়াছ, তুমি হিন্দুস্থানের একজন আমীর, বাদশাহের মন্‌সব্‌দার, তোমার দর্শন লাভের জন্য বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার জমিদার মাত্রেই লালায়িত। তোমার অভাব কি? তুমি কিসের জন্য, কি অভাবের জন্য অসৎপথ অবলম্বন কর? অসীম ও ভূপেন তোমার অবর্ত্তমানে এই বিশাল ধন সম্পদের অধিকারী হইবে, দেশে ধর্ম্ম থাকিতে বা শাস্ত্র থাকিতে কেহ তাহাদিগকে অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তুমি আর কয় দিন? এই দুইদিনের জন্য মিথ্যা শঠতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়া ভাই দুইটীকে কেন পৈত্রিক বিষয়ে বঞ্চিত করিলে? বিষয় তোমার কি হইবে?"

"আরে থাম ঠাকুর, ধর্ম্ম শাস্ত্র একটু রাথ। বিষয় বুদ্ধি ব্রাহ্মণের কথনো হয় না, হইবেও না। দেখ বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যা তোমার অলঙ্কার হইতে পারে কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার নিতান্তই সূক্ষ্ম, একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। এই সংসারে কে কাহার, এইমাত্র সার আমি আমার। মাতাপিতা দারাসুত সমস্তই মিথ্যা, নিত্য কেবল আমি। আমার সুখ, ঐহিক পারত্রিক কায়িক মানসিক, ইহাই জগতের সার, এই সংসারে এক মাত্র কাম্য বস্তু। দেখ ভট্টাচার্য্য! পরগণে রোকনপুরের পাঁচ [illegible] ছয়গণ্ডা এককড়া একক্রান্তির মালিক হইয়া সুখ নাই, ষোল আনার মালিক হওয়া চাই। একথানা কম্বলে দশজন ফকিরের

স্থান অতি সহজেই হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতম রাজ্যেও একাধিক রাজার স্থান হয় না। পাঁচশত তোলা সোনার পানদানে আমার একশত ছষট্টি তোলা আছে বটে কিন্তু তাহা লইয়া ত মন খুলিয়া পানদানটা ব্যবহার করা যায় না? এই জন্য ছলে কৌশলে জ্ঞাতি শত্রুর অধিকার নষ্ট করিয়াছি।"

"তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"একটু কারণ আছে, বড়ই দুঃসময় পড়িয়াছে। বাদশাহের মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই, যে রকম অবস্থা বুঝিতেছি তাহাতে শাহজাদা আজীম-উশ্-শানের বাদশাহ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। দলিল খানা নবাবের সহি মোহর করাইয়া লইয়াছি বটে কিন্তু মুর্শিদকুলির সহিত আজীম-উশ্-শানের যে প্রেম তাহাত তোমার অবিদিত নাই? আজীম-উশ্-শান বাদসাহ হইলে মুর্শিদ কুলির নবাবী যাইবে, বৃদ্ধ উজীর আসদ্ খাঁ এখনো জীবিত। তখন কি করিব?"

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, তখন মরিবে।"

"তাহার জন্যত ভট্টাচার্য্যের পরামর্শের প্রয়োজন নাই, এখন কি করি বল দেখি?"

"আর একটা কথা ভাব নাই, ভাগিরথীর পর পারে লাল বাগে আজীম-উশ্-শানের পুত্র বসিয়া আছে। আজ যদি বাদ-শাহের মৃত্যু হয় কাল আজীম-উশ্-শান বাদশাহ হইলে, আসদ্ খাঁ রাজপ্রতিনিধি হইবে, মহম্মদ করিম ময়ুর সিংহাসনে পার্শ্বে বসিবে আর ফরুকখসিয়র তোমার দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা

হইবে। আজ যদি অসীম ফররুখ্‌সিয়রের দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কাল তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।”

“ভট্টচাজ! একথা ত একবার মনে হয় নাই।”

“এখনই যাও, যেমন করিয়া পার তাহাদের ফিরাইয়া আন।” হরনারায়ণ ডাকিলেন “চোপদার!” চোপদার আসিল, তিনি আদেশ করিলেন “বড় ছিপ এক দণ্ডের মধ্যে তৈয়ার করিতে বল্‌।”

রজনীর তৃতীয় প্রহরে হরনারায়ণ রায় স্বকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালবাগ যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজদর্শন

তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে একজন ক্ষুদ্রকায় হিন্দু লালবাগের চারিদিগের আম্রকাননমধ্যে সেনানিবাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তখন অধিকাংশ লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে দুই-একজন জাগিয়া ছিল, হিন্দু তাহাদিগকে বলিতেছিল, “আমাকে শাহ-জাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার?” কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে একজন দয়াপরবশ হইয়া কহিল, “দেখ বাপু! তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে শাহজাদার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে হইলে এক থলিয়া আশরফি খরচ করিতে হইবে, পারিবে?" হিন্দু বিস্মিত না হইয়া কহিল, "পারি না পারি চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"নগদ একখানি আশরফি যদি খরচ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে লুৎফুল্লাখাঁর তাম্বুতে লইয়া যাইব। সেখানে পরামর্শ পাইতে পার, কিন্তু তাহার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ আশরফি।"

"পাঁচ আশরফি দিয়া ত পরামর্শ লইব, লইয়া কি করিব?"

"দোস্ত! তোমার অদৃষ্টে আজ শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ নাই দেখিতেছি। তুমি একটা কাজ কর—নগদ একটা আশরফি খরচ করিয়া ফেল,—তাহা হইলে হয় ত হাত খুলিয়া যাইতে পারে।"

আগন্তুক বাক্যব্যয় না করিয়া একটা আশরফি সৈনিককে দিল। সৈনিক সেটীকে দীপালোকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! তোমার আশরফিটী জাল নহে ত?" হিন্দু হাসিয়া কহিল, "পরীক্ষা করিয়া ত দেখিলে, কি রকম বুঝিলে?"

"বিশেষ কিছু বুঝিলাম না; কারণ, শাহজাদা ফরুখ্‌-সিয়র বলিয়া বলিলেও হয়। আমাদের লস্করে বক্সীরাই খাইতে পায় না, তা, আমরা ত আহদী। শাহজাদা আজীম্‌-উশ-শান্‌ সত্য-সত্যই শাহজাদা ছিল, তাঁহার আমলে দুই-চারিটা আস্ল আশরফি দেখিতে পাওয়া যাইত।"

"ভাল, এখন কি করিব বল?"

"দেখ, ঐ সম্মুখের আম গাছের নীচে লুৎফুল্লাখাঁর তাম্বু,—সটান সেখানে চলিয়া যাও,—লম্বা একটা কুর্ণীস করিয়া পাঁচখানা মোহর নজর পেশ কর, আর বল যে যেমন করিয়া হউক শাহ-জাদার সাক্ষাৎ মিলা চাই।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর আর কি? যাইবার সময় আমাকে ভুলিও না।"

আগন্তুক সৈনিক-নির্দ্দিষ্ট শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল,—দূর হইতে এস্রাজের আওয়াজ তাহার কাণে পৌঁছিল। সে নিকটে গিয়া দেখিল যে, তাম্বুর ভিতরে একজন দীর্ঘাকার মানুষ এস্রাজ বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। আগন্তুক বাহিরে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল এবং পাঁচখান মোহর এস্রাজের সম্মুখে রাখিল। স্বর্ণের মধুর নিক্কন শুনিয়া লুৎফুল্লাখাঁর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—খাঁ-সাহেব এস্রাজ নামাইয়া আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। সে কহিল, "আসুন, বসুন।" হিন্দু অত্যন্ত কুণ্ঠীত হইয়া কহিল, "সে কি কথা, এমন গোস্তাকী কি আমি করিতে পারি? আপনার সম্মুখে বসিব? তাহার পূর্ব্বে নিজের মাথাটাই নিজে কাটিয়া ফেলিব। আমি নিতান্ত নাচার হইয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

"কি করিতে হইবে বলুন?"

"যেমন করিয়া হউক একবার শাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে।"

"কাজটা অত্যন্ত কঠিন,—আহমদবেগকে অন্ততঃ দশ আশরফি দিতে হইবে।"

আগন্তুক দশখানা মোহর বাহির করিয়া এস্রাজের পাশে রাখিল। লুৎফুল্লা আশরফি কয়খানা বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া কহিল, "আফ্‌রাসিয়াব খাঁও কি দশ আশরফির কমে ছাড়িবে?" আগন্তুক এইবার একটু হাসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মোট কত খরচ হইবে খাঁ-সাহেব?" লুৎফুল্লা বহুক্ষণ ধরিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া স্থির করিল যে, পঞ্চাশখানা মোহরের অধিক দাবী করিলে শিকার হাত-ছাড়া হইতে পারে; অতএব দশখান পাওয়া গিয়াছে, আরো চল্লিশখান দাবী করা যাইতে পারে। সে প্রকাশ্যে বলিল, "আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরো চল্লিশখান মোহর লাগিবে।" আগন্তুক কহিল, "দিতে স্বীকার আছি; কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক অগ্রিম দিতে পারিব না।"

"উত্তম কথা। আপনি এস্থানে অপেক্ষা করুন,—আমি শাহজাদার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে চলিলাম।"

"আগন্তুকের নিকট হইতে আরো দশখান মোহর লইয়া লুৎফুল্লা খাঁ হৃষ্টচিত্তে লালবাগে প্রবেশ করিল। আগন্তুক তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক গালিচায় উপবেশন করিল।

তখন রজনীর তৃতীয় প্রহর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—লালবাগের ভিতর মহলের আলো নিবিয়া গিয়াছে। কেবল ভাগীরথী-তীরে বিলাস-গৃহ আলোকোজ্জল,—সুকণ্ঠী গায়িকার কলকণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি যেন দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া লুৎফুল্লা খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাহজাদাকে অভিবাদন করি

এবং আফ্‌রাসিয়াব খাঁর নিকটে গিয়া বসিল। আফ্‌রাসিয়াব খাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং সেই বিরক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য লুৎফুল্লা খাঁর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। লুৎফুল্লা তখন এক-খানি আশরফি বাহির করিয়া তাহা আফ্‌রাসিয়াব খাঁর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিল। মজলিসের মধ্যে আহ্‌মদবেগ ও আফ্‌রাসিয়াব ব্যতীত আর কেহ আশরফি দেখিতে পাইল না। আফ্‌রাসিয়াব আশরফি পাইয়া একটু নরম হইল। তখন সুযোগ বুঝিয়া লুৎফুল্লা অতি ধীরে তাহার কর্ণমূলে কহিল, "জনাব! একবার বাহিরে আসিবেন কি?" আফ্‌রাসিয়াব খাঁ উঠিল, লুৎফুল্লাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিল, এবং একটী-একটী করিয়া আর নয়টী আশরফি আফ্‌রাসিয়াবের হাতে গণিয়া দিয়া কহিল, "জনাব আলি! গোলামের গোস্তাকী মাফ হয়, বিশেষ গরজ না থাকিলে আপনাকে এত তক্‌লিফ্‌ দিতাম না। একজন হিন্দু শাহ্‌জাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।"

"কত দিবে বলিয়াছে?"

"দশ আশরফি।"

"তাহাতে হইবে না,—আহমদ আশরফি দেখিয়াছে।"

"তাহাকেও দশ আশরফি দেওয়াইব।"

তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি। আফ্‌রাসিয়াব খাঁ কক্ষে ফিরিয়া গেল এবং আহমদ বেগকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সেই সঙ্গে আর এক ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিয়া আসিল; কিন্তু তাহারা কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

রজনীর তৃতীয় প্রহর শেষ হইল,—আম্রকাননে অনেকগুলা পেঁচক ডাকিয়া উঠিল,—আহমদবেগ শিহরিয়া উঠিল। তাহা আফ্‌রাসিয়াব খাঁ হাসিয়া কহিল, "কি খাঁ সাহেব! ভয় পাইলে না কি?" খাঁ সাহেব ভূমিতে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া কহিল, "এই চিড়িয়াগুলি আমার দুষ্‌মন্‌। সে কথা যাক, কি বলিতেছিলে বল?"

"একজন কাফের শাহজাদার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে,—নগদ দশ আশরফি পেশ্‌কশ্‌।"

আহমদ অভ্যাসবশতঃ হাত পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই?" তখন আফ্‌রাসিয়াব খাঁ লুৎফুল্লাখাঁকে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে আরো দশ আশরফি লইল এবং তাহা আহমদবেগকে দিল। আহমদবেগ প্রসন্ন হইয়া কহিল, "তোমার কাফেরকে ডাকিয়া আন, আমি জনাব আলিকে রাজী করিতেছি।" লুৎফুলাখাঁ উদ্যানের বাহিরে চলিয়া গেল এবং অপর দুইজন বিলাসগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল। যে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহাদিগের কথোপকথন শুনিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া একটা মশাল জ্বালিল; এবং তাহা একজন হরকরার হাতে দিয়া তাহাকে ঘাটের উপর দাঁড়াইতে আদেশ করিল; এবং বলিয়া দিল যে, কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন বলে, সে শাহজাদার আদেশে দাঁড়াইয়া আছে।

সে ব্যক্তি যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিল, তখন আহমদবেগের অনুরোধে ফর্‌রুখ্‌সিয়র হিন্দুকে দর্শন দিতে স্বীকৃ

হইয়াছেন। এই সময়ে সেই ব্যক্তি শাহজাদার কর্ণমূলে অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল। তাহা শুনিয়া শাহজাদা আহমদ বেগকে কহিলেন, "বেশ! ঘাটের উপরে চৌকি দিতে বল,—সেইস্থানে হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিল্লী যাত্রা

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। লালবাগে ঘাটের উপরে হরকরা তখনও মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের নীচে খাওয়ারার ছিপে পূর্ব্বদেশের নাবিকেরা অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে। শাহজাদা ফর্‌রুখসিয়র চন্দন-কাঠ-নির্ম্মিত বিস্তৃত আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন খর্ব্বাকৃতি হিন্দু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। সহসা একজন নাবিক কিঞ্চিৎ উচ্চ স্বরে কথা কহিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হরকরা হাঁকিল, 'সুম্‌সাম্,। একজন খাওয়াস্ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমার নাম কি?"

হিন্দু কহিল, "আমার নাম হরনারায়ণ রায়।"

"তোমার কি পেশা?"

"আমরা পুরুষানুক্রমে বাদশাহের গোলাম। স্বর্গগত শাহ-

জহান্ বাদশাহের আমল হইতে আমরা রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি।"

"তুমি কি কাজ কর?"

"আমি স্থবা বাঙ্গলার কানুনগোই।"

এই সময়ে পাঁচখানি ছিপ আসিয়া ঘাটের নীচে লাগিল। যে খাওয়াস্ নীচে নামিয়া গিয়াছিল, সে তাহার একখানিতে উঠিয়া অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠ মাণিকচাঁদ কোথায়?" শেঠ অন্য একখানি ছিপে ছিলেন; তিনি কহিলেন, "আমি এখানে, —কাঁটা কি নৌকাতেই লাগাইব না কি?" খাওয়াস্ তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "চুপ শেঠজি! ঐ লোকটা কে বলিতে পার?" যে ক্ষুদ্রকায় হিন্দু শাহজাদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া মাণিকচাঁদের মুখ শুকাইল, "সর্ব্বনাশ! খাঁসাহেব, উহাকে চিন না?" খাওয়াস্ বিস্মিত হইয়া কহিল, "না।"

"মুর্শিদকুলির বিশ্বস্ত অনুচর, দেওয়ানী শেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী এবং আমার প্রধান শত্রু কানুনগোই হরনারায়ণ রায়।"

"দেখ শেঠজি, রাত্রি বলিয়া প্রথমে লোকটাকে চিনিতে পারি নাই। লোকটা একদিন শাহজাদার দরবারে আসিয়াছিল বটে। কি মৎলবে আসিয়াছে বলিতে পার?"

"নিশ্চয় টাকার সন্ধান পাইয়াছে।"

"তোমরা টাকার কথাটাই পূর্ব্বে ভাব, কিন্তু সামান্য টাকার জন্য কানুনগোইএর মত পদস্থ ব্যক্তি এত রাত্রিতে শাহজাদা

সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবে কেন? দেওয়ানের পেস্কার তোমাকে ডাকিয়া আনিলেই পারিত; এবং তোমাকে নিষেধ করিয়া দিলেই তোমার হাত বন্ধ হইয়া যাইত। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অন্য কোন মৎলবে আসিয়াছে।"

এই সময়ে গঙ্গাবক্ষে আর একখানি ছিপ্ হইতে একজন পূর্ব্বদেশীয় মাল্লা হাঁকিল, "ইলাকা শাহান্‌শাহী নাওয়ারা,—ছিপ্ তফাৎ।" অন্ধকারে আর একখানি ছিপ্ অতি দ্রুতবেগে আসিতেছিল,—তাহা হইতে একজন উত্তর দিল, "আমল্ শাহান্‌শাহী-পথ ছাড়।" তৎক্ষণাৎ বহু নাবিক একত্র হইয়া ছিপের জন্য পথ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ছিপখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল। খাওয়াস্ মাণিকচাঁদকে কহিল, "তুমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাক,—ব্যাপারটা কি জানিয়া আসি।" ছিপ্ ঘাটে লাগিলে সে কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপ্ কোথাকার?" কর্ণধার কহিল, "বিহারের সুবাদারের; খাস্ দরবার হইতে রোকা আসিয়াছে।" একজন দীর্ঘাকার তুরাণী ছিপ্ হইতে উঠিয়া কহিল, "দিন দুনিয়ার মালেক হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহআলম বহাদর শাহের জয় হউক।" খাওয়াস্ কহিল, "কে, রৌশন্ খাঁ?"

"হাঁ জনাব, মেহেরবান সাহেবজাদাকে এখনই এত্তালা দিতে হইবে।"

"এত্তালা দিতেছি, শাহাজাদা এখনো শয়ন করেন নাই।"

"বাঁচিলাম! এক মাসে লাহোর হইতে আসিয়াছি।

শাহজাদার হুকুম, সাহেবজাদা যেখানেই থাকেন, সেইখানেই তাঁহাকে রোকা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"

"রোকা বড়ই জরুরি দেখিতেছি ?"

"অনেক কথা আছে, পরে জানাইব।"

খাওয়াস্ ঘাটের উপরে উঠিয়া একজন চোপদারকে ডাকিল। চোপদার দশ-বারজন হরকরা লইয়া ঘাটের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন খাওয়াস্ ফর্‌রুখসিয়রকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "জনাব! জঁহাপনা শাহানশাহের হুকুম লাহোর হইতে শাহানশাহী আহদী রৌশনে দুনিয়ার হুকুমনামা লইয়া আসিয়াছে।

ফর্‌রুখসিয়র তাহা শুনিয়া কহিলেন, "হরনারায়ণ। তোমার সহিত কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার যদি কিছু আরজী থাকে তাহা অন্য সময় শুনিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে পিতার নিকট হইতে জরুরী সংবাদ আসিয়াছে। এখন হইতে তুমি যখনই আসিবে, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

হরনারায়ণ এতক্ষণ মিষ্ট কথায় শাহজাদাকে তুষ্ট করিতেছিলেন, ভাই দুইটীর কথা তুলিবার সময় পান নাই শাহজাদার কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। লাহোর হইতে যে আহদী পত্র লইয়া আসিয়াছিল, সে দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। হরনারায়ণ দূরে চলিয়া গেলে, সে নিকটে আসিল, এবং অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। খাওয়াস্ রূপ

থালায় করিয়া পত্র লইয়া ফর্‌রুখসিয়রের সম্মুখে ধরিল। তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

পত্রপাঠ করিয়া ফর্‌রুখসিয়রের মুখ শুকাইল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে খাওয়াস্‌কে কহিলেন, "আহমদ বেগকে ডাকিয়া আন।" আহমদ বেগ আসিলে ফর্‌রুখসিয়র তাঁহাকে কহিলেন, "সংবাদ অশুভ, বাদশাহের শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে। পিতা আমাকে এখনই দিল্লী যাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

আহমদবেগ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিল্লী যাইতে হইবে, এখনই?" পাত্রবাহক আহদী কহিল, "জনাব! শাহজাদার হুকুম, আপনি বিলম্ব না করিয়া সমস্ত ফৌজ লইয়া দিল্লী যাইবেন।"

আহমদ। সমস্ত ফৌজ লইয়া যাইতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন।

ফর্‌রুখসিয়র। কত টাকা প্রয়োজন?

আহমদ। হিসাব করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বখ্‌শীকে ডাকিব কি?

ফর্‌রুখসিয়র। বখ্‌শীকে ডাকিলে কি হইবে, আন্দাজ করিয়া বলিতে পার না?

আহমদ। শাহজাদা! এত বিদ্যা থাকিলে এতদিন সুবাদার হই[illegible]ম। আসদ খাঁ অনুগ্রহ করিয়া বখ্‌শী করিবেন বলিয়া-[illegible]ন, কিন্তু বিদ্যার দৌড় দেখিয়া জুল্‌ফিকার খাঁ তাড়াইয়া [illegible]ল।

খাওয়াস্। জনাব! গোলামের গোস্তাকী মাফ হয়, সমস্ত সুবাদারী ফৌজ দিল্লী লইয়া যাইতে হইলে সর্ব্বসমেত অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

ফর্‌রুখসিয়র। সমস্ত ফৌজ লইয়া গেলে চলিবে কেন?

আহমদ। তবে কত ফৌজ লইয়া যাইবেন?

ফর্‌রুখসিয়র। অর্দ্ধেক।

আহমদ। তাহা হইলে পঁচিশ লাখ টাকা।

ফর্‌রুখসিয়র। তহবিলে কত টাকা আছে?

খাওয়াস্। দুই তিন হাজারের অধিক নহে। তবে শেঠ মাণিকচাঁদ বোধ হয় সমস্ত টাকাই আনিয়াছে।

ফর্‌রুখসিয়র। দশ লক্ষ।

খাওয়াস্। জনাব!

ফর্‌রুখসিয়র। আহমদ বেগ! এখন উপায়?

আহমদ। চিন্তা কি জনাব? যে টাকা আসিয়াছে তাহা লইয়া এলাহাবাদ পৌছিতে পারিব, সেখানে সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ আছেন, ছবেলারাম নাগর আছে, ইটাবাতে আলি আশগর খাঁ আছে। পথে টাকার প্রয়োজন হয় পাটনায় হোসেন আলি খাঁ আছেন।

ফর্‌রুখসিয়র। আহমদবেগ! তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই দেখিতেছি। আমি এখনই যাত্রা করিব, কমি কুচের হুকুম জারি কর।

রাত্রিশেষে লালবাগের চারিদিকে আম্রকাননে

বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া চারিদিকের গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল, কারণ বাদশাহী আমলের মোগল সেনা যে পথে চলিত, সে পথে চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা অসম্ভব হইত। চারিদিকে হাজার-হাজার মশাল জ্বালিয়া, সেনাগণ তাম্বু নামাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল, আহদীগণ গরুর গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইল, শকটচালক প্রহার হজম করিয়া বলদ খুঁজিতে গেল, তখন শাহজাদা ফরুখসিয়র বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিয়া নর্ত্তকীগণকে বিদায় দিলেন, এবং অসীম ও তাহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এখনই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিব, তোমরা কোথায় যাইবে?" উভয়ে কহিল, "শাহজাদার অনুমতি হইলে আমরা দিল্লী যাইব।"

"তবে আমার সহিত চল, আমিও দিল্লী যাইব। অনেক দূর একসঙ্গে যাইব, তোমাদের মত গুণবান সঙ্গী পাইলে গীতবাদ্যে আনন্দে দিন কাটিয়া যাইবে।"

পরদিন প্রত্যূষে সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ নূতন নগরে প্রাসাদের বাতায়ন পথে দেখিলেন যে সুবাদারী ফৌজ বাদশাহী নাকারা বাজাইয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীর

শীতের প্রারম্ভ; শিবিরের ঘন আবরণে শ্যামল দূর্ব্বাদল শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; প্রথম ঊষার ক্ষীণ শুভ্রালোকে মুর্শিদাবাদের পরপারে ভাগীরথীতীরে এক শুভ্রবসনা শ্যামাঙ্গী রমণী দেব-পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। উদ্যানের নিম্নে ক্ষীণকায়া ভাগীরথী প্রবাহিতা। একটী-দুইটী করিয়া স্নানার্থিনী কুলললনাগণ গঙ্গাতীরে আসিতেছিলেন। রমণীর মন সেদিকে ছিল না; তিনি একাগ্রচিত্তে কুসুমচয়নে নিযুক্ত ছিলেন। এক দীর্ঘকায়া রমণী বহুমূল্যের শালে আত্মগোপন করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" প্রথমা প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রশ্নকর্ত্রী পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের মেয়ে দুর্গা! তুমি এই শেষ রাত্রিতে কি করিতেছ বাছা?" প্রথমা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "শেষ রাত্রি কি জেঠাই-মা? সূর্য্য উঠিতে কি আর বিলম্ব আছে? ঐ দেখ, ইহারই মধ্যে আম-গাছের উপরের ডালে রৌদ্রের আভা পড়িয়াছে।"

"ওমা, তাই বুঝি! আমি ভাবিতেছি, সবে চারি প্রহর শেষ হইয়াছে। আহা! কাল রা'তে ঘুমাইতে পারিস না বুঝি?

"কেন ঘুমাইতে পারিব না জেঠাই-মা ?"

"এই নানান রকম দুর্ভাবনায়-দুশ্চিন্তায়-আর কি !"

"কিসের দুর্ভাবনা,—দুর্ভাবনা শত্রুর হউক।"

"তোর এই বয়স—এখন সাধ-আহ্লাদ করিবার সময় তাহার বদলে ভগবান তোকে কি করিয়া রাখিয়াছে বল দেখি।"

"সকলের অদৃষ্ট কি এক রকম জেঠাই-মা ? আর-জন্মে যাহা করিয়াছি, এই জন্মে তাহার ফল পাইতেছি,—তাহার জন্য দুঃখ কি ? ভগবান দাদার সংসার বজায় রাখুন, তাহা হইলেই আমার সব দিক বজায় থাকিবে।"

"তা ত বটেই, তা ত বটেই ! তবুও আমাদের মন কি বুঝে মা ?" এই বলিয়া রমণী বহুমূল্য শালের কোণ নয়ন-কোণে দিয়া শুষ্কনেত্র মার্জ্জনা করিলেন। পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, হ্যাঁ দুর্গা ?"

"কি বল না, জেঠাই-মা ?"

"রায়-গৃহিণী ছোট রায়কে না কি বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

"তাড়াইয়া দেয় নাই। তবে দাদা বড় বদরাগী মানুষ—তিনি কোন কথা সহ্য করিতে পারেন না, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"তোদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে ত ?"

"কেন করিয়া যাইবে না ? সন্ধ্যাবেলা দাদার সঙ্গে দেখা

করিতে আসিয়া সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। দাদার সঙ্গে ভূপও গিয়াছে।"

"আহা তোর প্রাণে বড় লাগিয়াছে না?"

"লাগিবে না জেঠাই মা? তোমার পোষা বিড়ালটী হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুমি তিন মাস গ্রামের পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলে, সে কথা মনে আছে? আর ভূপ আমার কে? বিধবা হইয়া যে দিন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসি, সেইদিন এক বৎসরের শিশু আমার কোলে তুলিয়া দিয়া, বড় জেঠাই-মা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি যে তাহাকে সতের বৎসর বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি জেঠাই-মা?" দুর্গা-ঠাকুরাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া জেঠাই-মা বলিয়া উঠিলেন, "তা বটেই ত, তা বটেই ত। আহা ছেলেমানুষ। অসীম নিজে গেল,—ভূপেন্‌কে লইয়া গেল কেন?"

"কি জানি জেঠাই-মা,—পরের কথা কেমন করিয়া বলিব।"

"অসীমও তোর বয়সী।"

"ছেলেবেলার খেলার সাথী।"

"তাহার জন্য মন কেমন করিতেছে না দুর্গা?

"বড়-দাদা পুরুষ মানুষ,—এখন বয়স হই...ছে,—তাঁহার জন্য মন-কেমন করিতে যাইবে কেন? এত দিন বড়-দাদা ত বিদেশে যাইতেন, কেবল ভূপুর মুখ চাহিয়া সকল যন্ত্রণা, অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। জেঠাই-মা, ভূপু যে আমার অন্ধ

রমণীর গলা ধরি... আসিল। তাহা দেখিয়া জেঠ

দ্বিতীয়বার বহুমূল্য শালের কোণ নয়নে উঠাইলেন ; এবং কথাটা উল্টাইয়া লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাছা, কাল রাত্রিতে কি তোর সহিত নবীনের দেখা হইয়াছিল ?"

দুর্গাঠাকুরণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন নবীন, জেঠাই-মা ?"

"নবীন নাপিত।"

"হইয়াছিল।"

"কোথায় ?"

"ষষ্ঠীতলার মাঠে।"

"কত রাত্রিতে ?"

"এই প্রথম প্রহরের শেষে।"

"এত রাত্রিতে একা ষষ্ঠীতলার মাঠে কেন গিয়াছিলি বাছা ?"

দুর্গা প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি যখন মোহরের থলিয়া লইয়া একাকিনী রাত্রিতে নির্জ্জন প্রান্তরে অসীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন সমাজের কথা, লোক-নিন্দার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ভূপেনকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন। সে যে অর্থাভাবে, এমন কি অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে, এই দুশ্চিন্তা অপর চিন্তাকে সহৃদয়া ব্রাহ্মণ-কন্যার মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাকে বিব্রত দেখিয়া প্রৌঢ়ার নয়নদ্বয় উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গা তাহা দেখিয়া জেঠাই-মার আকস্মিক স্নেহের কারণ বুঝিতে পারিলেন ; এবং

ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা পরে বলিব জেঠাই-মা,—সে বড় গোপন কথা,—সময় হইলে আপনা হইতেই জানিতে পারিবে।" প্রৌঢ়া আর কথা না কহিয়া ঘাটে নামিলেন। দুর্গা পুষ্প-চয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পূজায় বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পুষ্পের অভাব দেখিয়া পুত্রবধূকে কন্যার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় দুর্গা আসিয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কন্যার মুখ দেখিয়া পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা, মুখখানা মেঘের মত গম্ভীর কেন?" দুর্গা ক্ষিপ্রহস্তে পূজার সজ্জা করিতে করিতে কহিলেন, "কিছু না, বাবা।" হরিনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমি বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি আমি তোমার পিতা। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার সহ্যশক্তি অসাধারণ। আমি স্বয়ং তোমাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি! কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব আমি যে পুঁথির মত পড়িতে পারি মা! কি হইয়াছে বল।"

"পূজার পরে বলিব।"

"না, তুমি এখনই বল। বিশেষ কারণ না হইলে, তোমার জগজ্জননীর মত সুন্দর শান্ত মুখখানি সহসা গম্ভীর হইয়া উঠে না। ফুল আনিতে বিলম্ব হইল কেন?"

"গঙ্গার ঘাটে ঘোষেদের বাড়ীর বড় জেঠাই-মার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।"

"ভাল। বিলম্ব করিলে কেন ?"

"তিনি কতকগুলা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।"

"সেটা ত একটা মহাপাতক। তাহার সঙ্গে এত কি কথা মা ? বড়-বৌ উত্তররাঢ়ী কুলের কলঙ্ক।"

"বাবা, আমি জীবনে আপনার কাছে কোন কথা লুকাই নাই, আজিও লুকাইব না। আমি বোধ হয় মনের আবেগে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।"

"সেই জন্যই ত বলিতেছি, কি হইয়াছে আমাকে বল।"

"বাবা, কাল রাত্রিতে বড়-দাদা ও ভূপু জন্মের মত রায়-বাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

"তাহা শুনিয়াছি।"

"গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা দাদার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বড়-দাদা দাদাকে বলিলেন যে, তিনি বিশেষ কাজের জন্য দিল্লী যাইতেছেন, এবং শীঘ্রই ফিরিবেন। দাদাও তাহাই বুঝিলেন ; কিন্তু বাবা, মানুষের মুখ দেখিলে মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়,—সে কথা পুরুষ মানুষে ভুলিয়া যায় ; আর সে ভাব আমরা যত সহজে বুঝিতে পারি, তত সহজে পুরুষে পারে না। বড়-দাদা ও ভূপেনের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহারা জন্মের মত রায়-বাড়ী ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং সহজে ফিরিবে না।"

"সে কথা সত্য।"

"যে-দিন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া আপনার সঙ্গে চলিয়া আসি,

তাহার পর-দিন বড় জেঠাই-মা ভূপুকে আমার কোলে দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ভগবান আমাকে সন্তান দেন নাই; কিন্তু ভূপকে পাইয়া আমি সে অভাব অনুভব করি নাই। সতর বৎসর তাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি। বাবা! কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন তাহার দৃষ্টিহীন চোখ দুইটীতে বিদায়ের আভাস দেখিতে পাইয়াছিলাম, তখন আমার আর জ্ঞান ছিল না। দুই ভাইয়ের পথের সম্বল যে কি আছে, তাহা আমি জানি। আমার মনে হইল যে, হয় ত কালই ভূপ অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে। যে মাতৃহীন শিশুকে এতদিন পুত্রাধিক যত্নে ও স্নেহে পালন করিয়াছি, সে যে ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এই চিন্তা আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় স্বামীর ঘর হইতে যাহা কিছু আনিয়াছিলাম,—সমাজ-শাসন ও লোক-লজ্জা ভুলিয়া গিয়া—ত্রিপুরার মহারাজা তাঁহাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলেন, সেইগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তাহাদিগকে ঘুরিয়া আসিয়া ষষ্ঠিতলার মাঠ পার হইতে হইবে, অথচ আমাদের খিড়কীর দুয়ারের পরেই ষষ্ঠীতলা; সেই জন্য খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের ধরিলাম। মোহরগুলি দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছি, তখন কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমারা কি চাও?' বড়-দাদা বলিলেন, 'কেন?' সে আমার ও বড়-দাদার মুখের দিকে চহিয়া বলিল, 'কে, ছোট হুজুর? অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আমি নবীন।"

"নবীন নাপিত! মা, তাহার সহিত ঘোষ-গৃহিণীর কি সম্পর্ক জান?"

"জানি!"

"মা দুর্গা! যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ;—নিজের সম্পত্তি পালিত পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনায় দান করিয়াছ, উত্তম করিয়াছ। তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত।"

"বাবা! তুমি যে তখন রায়-বাড়ী।"

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালঙ্কারের বিচার

সেইদিন দুইদণ্ড বেলায় অক্ষয় গাঙ্গুলীর চণ্ডীমণ্ডপে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গৃহস্বামী মহাকুলীন, এবং তিনি বহু কুলীন-কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ-সমাজে স্বীয় প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে বিদ্যালঙ্কারের পরেই তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ; কিন্তু তাঁহাতে ও হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারে একটী বিষম প্রভেদ ছিল। কিশোর বয়স হইতে অসংখ্য কুলীনের কুলরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ায় গাঙ্গুলী মহাশয় সরস্বতীর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবার অবসর পান নাই। অদ্য তাঁহার আহ্বানে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম-সমূহের ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছেন। অক্ষয় স্বয়ং সে

সভার সভাপতি। তিনি বলিতেছেন, "ওহে রামচন্দ্র! কেবল বিদ্যা থাকিলেই হয় না, কুলমর্য্যাদার বিশেষ প্রয়োজন?" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "তা ত বটেই,— কুলমর্য্যাদা থাকিলেই যথেষ্ট,—বিদ্যা থাকে কি না থাকে, তাহাতে কি আসে-যায়। দেখ, হরিনারায়ণের যদি বিদ্যা না থাকিয়া কুলমর্য্যাদা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ঘরে এমন ঘটনা কখনই ঘটিত না।"

চণ্ডীমণ্ডপের একপ্রান্তে একখানি কুশাসনের উপরে এক বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিকেশব! নিজের ঘরের কথাটা ভুলিও না।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, চট্টোপাধ্যায়-কুল-পুঙ্গব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমার ঘরের কথা? এত বড় স্পর্দ্ধা! তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা?"

উভয় বৃদ্ধকে মল্লযুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া, গৃহস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সকল সামাজিক কাজেই তোমরা দুইজন বিবাদ বাধাইয়া কর্ম্ম পণ্ড করিয়া থাক। আজি কিন্তু তাহা হইবে না। থাম, স্থির হও।" উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, "দেখ, এত বড় একটা পাপ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গোপন রাখিলে দেশের সর্ব্বনাশ, সমাজের সর্ব্বনাশ এবং সকলেরই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা আবশ্যক।" হরিকেশব কহিলেন, "কথাটা উচিত কথা অক্ষয়; কিন্তু পারিয়া উঠিবে কি? হিন্দু রাজার

রাজ্য ত নয়, দেশ এখন মুসলমানের। নবাবের প্রিয়পাত্র হরনারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কারের সহায়। হরিনারায়ণের কি কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে?"

"ধর্ম্ম আছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এখনও ধর্ম্ম আছেন; এখনও দিন রাত্রি হইতেছে, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হইতেছে। সুতরাং পাপ কখনও গোপন থাকে না। এ কথা রায়-গৃহিণীর কর্ণে উঠিয়াছে। তিনি পুণ্যশীলা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী। তিনি কখনও পাপকে আশ্রয় দিতে পারেন? তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, এই দুইজন মহাপাতকীর শাস্তি দিতে হইবে।"

"হরনারায়ণ রায়-গৃহিণীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হইলেও, একেবারে যে তাঁহার করতলগত, তাহা নহে; সুতরাং কানুনগোই নিজে না বলিলে বিদ্যালঙ্কারের কথায় আমি নাই।"

"দেখ হরিকেশব খুড়া, তোমার যখন জাতি যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন এই অক্ষয় গাঙ্গুলী বুক দিয়া পড়িয়া তোমার মুখ রক্ষা করিয়াছিল,—আজি তাহার প্রতিদান কর। হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার আমার চিরশত্রু,—আজীবন আমায় অপমান করিয়াছে। বিদ্যার অহঙ্কারে সে বলিয়া বেড়ায় যে, কুলীনের পুত্র হইলেই কুলীন হয় না; নবধা কুললক্ষণ ব্যতীত কুলীনপুত্র ব্রাহ্মণই নয়। সে আমাকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছে,—সুতরাং প্রকারান্তরে জারজ বলিয়াছে। কানুনগোই হরনারায়ণের

আপনারা ইচ্ছা করিলে দিনকে রাত্রি করিতে পারেন, রাত্রিকে দিন করিতে পারেন—

রাম। বাজে বক্তৃতা রাখ। লোকটা ছোট রায় কি না, তাহা ঠাহর করিয়া দেখিয়াছিলে?

নবীন। দেখিব কি দেবতা, কথা কহিয়াছিলাম, প্রণাম করিয়াছিলাম।

রাম। ভাল কথা। স্ত্রীলোকটী যে দুর্গাঠাকুরাণী তাহা কি করিয়া চিনিলে?

নবীন। দাদঠাকুর! গ্রামের স্ত্রীলোক, দুইকুড়ি বৎসর এই গ্রামে কাটিয়া গেল, চলন দেখিলে বলিতে পারি কোন বাড়ীর মেয়ে।

রাম। দেখ নবীন! কথাটা সামান্য নহে,—গ্রামের একজন প্রধান ব্রাহ্মণের জাতিপাতের কথা। অন্ধকার রাত্রি; তাহার উপর ষষ্ঠীতলার মাঠ, তুমি কি সে স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়াছিলে?

নবীন। আজ্ঞে না। দেবতার অবিদিত কিছুই নাই। আমি আর কি বলিব, ও-সকল স্ত্রীলোক কি কথা কহিয়া থাকে।

রাম। সে যে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের কন্যা দুর্গাঠাকুরাণী, তাহা নিশ্চয় চিনিয়াছিলে?

নবীন। আজ্ঞে হাঁ দাদাঠকুর, কিরীটেশ্বরীর মার দিব্য।

এই সময়ে চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্ত হইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাম! নবীনের কথায় বিশ্বাস করিয়া একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করা উচিত নহে।"

নবীন। কেন বল ত ঠাকুর? আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়াছি না কি? নবীন জাতিতে নরসুন্দর বটে কিন্তু তাহার কথার মূল্য আছে,—নরসুন্দর সমাজে তাহার খাতির আছে। গাঙ্গুলী ঠাকুর ডাকিয়াছিলেন সেই জন্য আসিয়াছি; নতুবা নবীন সাধিয়া কাহারও ঘরে যায় না।

অক্ষয়। নবীন, চটিও না। দেখ হরিকেশব খুড়া, নবীনকে আমরা সকলেই চিনি, সে সহজে মিথ্যা কথা কহে না। হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বিধবা কন্যা দুর্গা একপ্রহর রাত্রিতে একাকিনী অসীম রায়ের সহিত ষষ্ঠীতলার মাঠে কিছু হরি-সংকীর্ত্তন করিতে যায়নাই। এখন সমাজরক্ষার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করিবেন করুন।

হরি। ব্যবস্থা কি তাহা তুমিই কর অক্ষয়।

অক্ষয়। নিমন্ত্রণ বন্ধ, রজক নাপিত বন্ধ, অন্য সমাজে হরিনারায়ণের নিমন্ত্রণ হইলে আমাদের গ্রামের কেহ যাইবে না।

হরি। অতি উত্তম কথা।

রাম। একটা কিন্তু গোল রহিয়া গেল খুড়া, স্ত্রীলোকটা দুর্গা কি অপর কেহ তাহা প্রমাণ হইল না।

এই সময়ে চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্ত হইতে সেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ রাম! এই কি রাঢ়ীয় কুলীন সমাজ? হরি-কেশবের সধবা কন্যা স্বামীগৃহ হইতে মুসলমানের সহিত কুলত্যাগ করিল, তাহার প্রতিকার হইল না; অথচ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও হরিনারায়ণের জাতিনাশের ব্যবস্থা হইল?" বৃদ্ধ

হরিকেশব কম্পিত-কলেবরে উঠিতে উঠিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার কন্যা কুলত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে তোর কি ?" উভয়ে বচসা আরম্ভ হইল। ক্রমে মল্লযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, অন্য সকলে তাহাদিগকে ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। বিষম গোলযোগ আরম্ভ হইল। সভা ভঙ্গ হইল।

সকলে ক্রমে-ক্রমে গৃহে ফিরিতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয় দাদা, স্থির হইল কি ?" অক্ষয় হাসিয়া কহিলেন, "আবার কি, আমি যাহা বলিলাম তাহাই।"

"ভাল করিলে না অক্ষয় দাদা। বড় ঘরের কথা, প্রমাণটা নিতান্ত অল্প। কি জান বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।"

"ধর্ম্ম আছেন রামচন্দ্র, ধর্ম্ম আছেন।"

"সে কথাটা তুমিও ভুলিও না। বিদ্যালঙ্কার দুর্ম্মুখ বটে, কিন্তু সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দুর্গাকে আমি চিনি, সে কুলটা নহে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বড়র পিরীতি

অপরাহ্ণে চিন্তাক্লিষ্ট বদনে বৃদ্ধ হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার ধীর পাদক্ষেপে সুবা বাঙ্গলার প্রধান কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের প্রাসাদসম অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। হরনারায়ণ

তখন আহারান্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া. সুদীর্ঘ কারুকার্য্যখচিত আলবোলার সটকায় মুখ লাগাইয়া হরনারায়ণ তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলেন; শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া একজন ভৃত্য তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বিদ্যালঙ্কারের পদশব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভট্‌চাজ যে, অসময়ে কি মনে করিয়া?" হরিনারায়ণ বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি ভাই, এখন তুমি উদ্ধার না করিলে আর মান থাকে না।"

"তোমার আবার বিপদ কি হে? পরের চাকুরী কর না, কোন ঝঞ্ঝাট নাই, উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি ত দেখি যে শাহ্ আলম আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই।"

"রহস্যের সময় নয় হর, বিষম বিপদে পড়িয়াছি; এখন তুমি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।"

হরিনারায়ণ শয্যার এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি গুরুতর কথা হে।"

"অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে।"

"তোমাকে সমাজচ্যুত? বল কি? তুমি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার একটা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত; তোমার ভয়ে বাঙ্গলা-দেশের সকল কুলীন একঘাটে জল খায়; আর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

অক্ষয় গাঙ্গুলি আর হরিকেশব চট্টোপাধ্যায় তোমাকে সমাজচ্যুত করিল? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ না কি?"

"স্বপ্ন নহে ভাই, বিষম সত্য। হরিকেশব লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, আজি হইতে আমার রজক নাপিত বন্ধ। দুর্গাকে যদি দূর করিয়া দিই এবং যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজ আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবে।"

"দুর্গার অপরাধ?"

"সে ব্যভিচারিণী।"

"এ কথা কে বলে?"

"তোমার স্ত্রী।"

"আমার স্ত্রী?"

"হাঁ তোমার স্ত্রী!"

"প্রমাণ?"

"নবীন নরসুন্দর।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখন দাবায় বসিবে বলিতে পার?

"শুন হর! কল্য রাত্রিতে অসীম ও ভূপেন্দ্র যখন গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তখন দুর্গা ভূপেনের জন্য অত্যন্ত কাতরা হইয়া অন্ধকারে একাকিনী ষষ্ঠীতলায় গিয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ে নবীন নাপিত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল! দুর্গা যদি আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইত, তাহা হইলে কোন কথা হয় ত উঠিত না; কিন্তু সে শৈশব

হইতে ভূপেনকে লালন পালন করিয়াছে এবং তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করে ; সে দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে শুনিয়া দুর্গা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল। আমি এখানে ছিলাম বটে, কিন্তু সুদর্শন ত গৃহে ছিল ; দুর্গা সচ্ছন্দে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিত। নবীন তখনই আসিয়া গৃহিণীকে জানায় যে, সে একপ্রহর রাত্রিতে অন্ধকারে মাঠে অসীম ও দুর্গাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অদ্য প্রভাতে তোমার পত্নীর আদেশমত নবীন এ কথা গ্রামময় প্রচার করিয়াছে এবং তাহারই আদেশমত গ্রামের সমস্ত কুলীন অক্ষয় গাঙ্গুলির গৃহে সমবেত হইয়া আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে। দেখ ভাই, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার আশ্রিত; যদি কোন কারণে অসীম তোমার বা গৃহিণীর অপ্রিয় হইয়া থাকে, সে জন্য আমি শাস্তি পাই কেন?

"কি বল ভট্‌চাজ, গৃহিণী কায়স্থের মেয়ে, আর তোমরা ব্রাহ্মণ, নরদেবতা ; কায়স্থ-কন্যার কথায় ব্রাহ্মণ সমাজ সমাজচ্যুত হয়, একথা বলিলে লোকে যে হাসিবে? তুমি শান্ত হও, দাবা পাড়িতে বলিব?"

"কলির ব্রাহ্মণ সব করে ভাই। দাবা ত খেলিবই, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিতেছি কৈ? হরিকেশবের সধবা কন্যা যখন রূপবান্ গুণবান্ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যবনের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন তোমার সাহায্যে আমি তাহার জাতিরক্ষা করিয়াছিলাম। কৃতজ্ঞ হরিকেশব আজি তাহার প্রতিদান দিয়াছে। অক্ষয় ঘোর মূর্খ, ব্রাহ্মণ-সমাজে সে সর্ব্বদা

কৌলীন্যের দোহাই দিয়া মাল্যচন্দনের দাবী করে; আমিও প্রতিবার তাহার প্রতিবাদ করি। এতদিন এই বিদ্যাহীন, আচারবিহীন কুলীনের সন্তানগুলি কুক্কুরের ন্যায় আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিয়াছে। আজি তোমার পত্নীর আশ্বাস পাইয়া তাহারা আমাকে এই অপমান করিতে সাহসী হইয়াছে। হর! তোমার ভরসায় এই গ্রামে বাস করি, আমার উচ্চ মস্তক কখনও নত হয় নাই। বন্ধু! আজি প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর; তোমার কটাক্ষপাতে কুলীন-সমাজ শাসিত হইবে। আমার কন্যা অসতী নহে।"

"তাই ত ভট্‌চাজ, বড় বিপদে ফেলিলে!"

"তোমার আবার বিপদ কি?"

"লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিব?"

"সেখানে ত ভূপেন ছিল।"

"কথাটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত হইল, আরে পাগল সে যে অন্ধ।"

"তবে তুমিও বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাসের কথা নয় ভট্‌চাজ, এ প্রমাণের কথা সাক্ষী-সাবুদের কথা।"

"তুমি অক্ষয় ও হরিকেশবকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেই সকল কথা মিটিয়া যাইবে।"

"দেখ ভট্‌চাজ, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ-সমাজের কথায় হস্তক্ষেপ করা কি আমার উচিত হইবে?"

"সে কি কথা হর? হরিকেশবের কন্যার বেলায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলে কি বলিয়া?"

"তখন তোমরা আমার কথা রাখিয়াছিলে; আর এখন যদি না রাখ? সেটা কিন্তু হরনারায়ণ রায়ের পক্ষে বড়ই অপমানের কথা।"

"হর, তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তুমি দুর্গাকে বাল্যাবধি জান। সে অসতী নহে। ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া স্নেহের বশে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সুযোগ পাইয়া আমার শত্রুরা আমাকে নির্য্যাতন করিতেছে। এ সময়ে তুমি রক্ষা না করিলে আমাকে লাঞ্ছিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে।"

"বড়ই দুঃখের কথা ভাই।"

"তবে তোমার ইচ্ছা কি?"

"আমার ইচ্ছা কি, তাহা কি তোমার অবিদিত?"

"বন্ধু! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমাকে রক্ষা কর, বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাসনে পাঠাইও না।"

"আমার কি সাধ যে, তুমি গ্রাম ত্যাগ কর; কিন্তু কি করিব ভাই, আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ সমাজের কোন কথায় আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।"

"তবে আমার কি উপায়?"

"দুই-চারি দিন বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া দেখ, অবশ্যই ইহাদের মনে দয়া হইবে।"

"সে কার্য্য হরিনারায়ণের দ্বারা হইবে না।"

"আমি ত অন্য উপায় দেখি না।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন পরে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন। হরনারায়ণ ঈষৎ হাসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সূতির মোহানা

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পাল ভরে ভাগীরথী-বক্ষে উজান বহিতেছিল। অদূরে পদ্মা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। তখন ভাগীরথীর এত দুরবস্থা ছিল না;—গঙ্গার অধিকাংশ জল ভাগীরথী বহিয়া সাগরে মিশিত, সুতরাং তখনও পদ্মা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সূতি গ্রামের নিম্নে ভাগীরথীর একটা প্রকাণ্ড দহ ছিল, তাহার কিয়দংশ এখন বিলে পরিণত হইয়া আছে। দিবাবসান দেখিয়া ক্ষুদ্র নৌকার মাঝি পাল নামাইয়া নৌকা বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে আর একখানি ক্ষুদ্র পান্সী আসিয়া তাহার পার্শ্বে লাগিল। পান্সীর সম্মুখে বসিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি ক্ষুদ্র হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছিল; এবং তাহার সম্মুখে বসিয়া এক মসীবর্ণ প্রৌঢ় লোলুপ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের বদন বিনির্গত ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়াছিল, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রৌঢ় কহিল, "দেখ

দাদাঠাকুর আমার কর্ত্তা বাবা নবদ্বীপ চন্দ্র অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।" ব্রাহ্মণ কুণ্ডলীকৃত ধূম পরিত্যাগ করিয়া কহিল "হুঁ।" ব্রাহ্মণকে আবার হুঁকায় মনঃ সংযোগ করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গী আবার কহিল "কর্ত্তা বাবা নবদ্বীপচন্দ্র বলিতেন বামুনের হাতে হুঁকা পড়িলে—" ব্রাহ্মণ চটিল এবং কহিল "দেখ দীননাথ, তোমার কর্ত্তা বাবার জালায় স্থির হইয়া এক ছিলিম তামাকও খাইবার উপায় নাই।" দীননাথ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "দেখ ঠাকুর এই যে শেষ তিন ছিলিম তামাক সাজিয়াছি তাহা একাই পোড়াইয়াছ, এ কলিকাটাও পুড়িয়া আসিয়াছ। কর্ত্তা বাবা নবদ্বীপচন্দ্র বলিতেন যে বামুনের হাতে—" "আরে রাখ্ তোর কর্ত্তা বাবা!" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া হুঁকা হইতে কলিকাটি নামাইয়া দিল। দীননাথ কলিকাটি লইয়া নিজের হুঁকায় বসাইয়াছে এমন সময় নৌকা দুইখানি কূলে লাগিল; একজন দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিল "কর্ত্তা, কলিকাটায় কিছু আছে কি?" দীননাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হুঁকাটী নামাইয়া রাখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বামুন বুঝি?" আগন্তুক একটু হাসিয়া বলিল "হাঁ।" দীননাথ তখন পাল্কী হইতে নামিয়া যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র প্রণাম করিল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা?" "আজ্ঞে আমরা গন্ধবণিক; এই যে ঠাকুরটিকে দেখিতেছেন ইনি দেড় প্রহর ধরিয়া এই কলিকাটি পোড়াইয়াছেন সুতরাং ইহাতে বড় কিছু আর নাই। অনুমতি করেন ত

চালিয়া সাজিয়া আনি।" দীননাথ এই বলিয়া হুঁকাটি আবার মুখে তুলিল এবং কাশিতে কাশিতে তাহা আবার নামাইয়া রাখিল। আগন্তুক ছিন্ন মলিন বসন খণ্ডে আবদ্ধ একটু পুঁটুলি বালির উপর রাখিয়া তাহার উপর উপবেশন করিল। দীননাথ পান্সী হইতে তামাকু আনিয়া আগন্তুকের নিকট সাজিতে বসিল। তখন আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সাহাজী কত দূর যাইবে?" দীননাথ চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক নাই, তুমি কোথায় যাইতেছ ঠাকুর?" "শ্বশুর বাড়ী।" "সে কোনখানে?" "উপস্থিত নিকটে কোথাও নয়।" "তবে যাইবে কোথায়?" "বলিলাম ত, শ্বশুর বাড়ী।" "ঠাকুর কুলীন ব্রাহ্মণ বুঝি?" "কুলের মুখুটী, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান।" "ভাল, ভাল, দাদাঠাকুর বস।"

তামাকু সাজিয়া কলিকাটি আগন্তুকের হস্তে দিয়া দীননাথ বলিল, "দাদা ঠাকুর ইচ্ছা কর; কিন্তু দেখিও, খবরদার, প্রসাদ করিয়া যেন চক্কত্তি মহাশয়ের হাতে দিও না। উনি দেড় পহরে দশছিলিম তামাক পোড়াইয়াছেন, অথচ পেসাদটা আমা অবধি পৌঁছায় নাই।" আগন্তুক হাসিয়া কলিকাটি লইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজী, ঠিক কোথায় যাইবে বল দেখি" দীননাথ কহিল, "বলিলাম ত ঠাকুর ঠিক নাই।" "তবে তুমিও কি শ্বশুর বাড়ী যাইবে না কি?" "আমাদের জাত কি তোমাদের মত ঠাকুর? তোমরা বিবাহ করিয়া পয়সা পাও আর আমাদের পয়সা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। একটা খবর বলিতে পার দাদাঠাকুর?" "কি খবর বল?" "তুমি এখন কোথা হইতে

আসিতেছ ?" "উপস্থিত কাটোয়া হইতে।" বাদশাহের ফৌজ লালবাগ হইতে কুচ্ করিয়াছে তাহার কিছু লক্ষণ দেখিলে ?" "বিলক্ষণ দেখিলাম, বহরমগঞ্জ হইতে ভগবান গোলা পর্য্যন্ত দুই ধারের গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে, ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল উধাও হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। ঘরে চাল, ধানের গোলা খাক হইয়া আছে। এক মঠের মহান্ত কাল সন্ধ্যাবেলা দেখা করিতে গিয়াছিল, কোড়া খাইয়া আধমরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।" আচ্ছা দাদাঠাকুর ফৌজ এখন কতদূর ?" "ফৌজের খবরে তোমার কি দরকার সাহাজী ?" "বেনের ছেলের আর ফৌজের খবরে দরকার কি বল ? ফৌজের লোক উঠ্না খাইয়া পলাইয়াছে তাই তাগাদায় বাহির হইয়াছি। আজ ছাউনী কতদূর বল দেখি ?" "আজ স্মৃতির মোহানার এক ক্রোশ দূরে লস্করের ছাউনি পড়িবে। গোয়ালারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল তাহারা বলিয়া গেল।"

আগন্তুক দীননাথের হস্তে কলিকাটি দিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দীননাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদাঠাকুর উঠিলে যে ? আজ রাত্রিতে বাসা লইবে কোথায় ?" "আগন্তুক হাসিয়া উত্তর করিল, "বাসা ? ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ সাহাজী। শ্মশানের ধারে একটা বড় বটগাছ আমি দেখিয়া অসিয়াছি, মনে করিয়াছি আজ সেখানেই বাসা লইব।" "রাম রাম, বল কি দাদাঠাকুর ? এই ঘোর সন্ধ্যাকাল শ্মশানে থাকিবে কি ? চল একখানা গ্রামে গিয়া বাসা খুঁজিয়া লই।" "তাহা হইলে আর দিনকতক বাদে

আসিও; সাহাজী, পদ্মাপারে না গেলে আর কোন ঘরে চাল দেখিতে পাইবেনা।”

দীননাথ যতক্ষণ আগন্তুক ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার সহযাত্রী চক্রবর্ত্তী একমনে অপর নৌকার আরোহী দিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সেই নৌকার সম্মুখে বসিয়া এক কৃশকায় গৌরবর্ণ যুবা দীননাথের কথা শুনিতেছিল. সে এই সময়ে দীননাথের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয় ফৌজের কথা বলিতেছিলেন, নিকটে কি ফৌজ আসিতেছে নাকি?” আগন্তুক কহিল, “বাদশাহী ফৌজ এখান হইতে প্রায় এক্‌ক্রোশ দূরে ছাউনী করিবে। আপনাদের নৌকায় কি স্ত্রীলোক আছে?” “হাঁ, আমরা সপরিবারে কাশী যাইতেছি।” “তাহা হইলে নৌকা লইয়া শীঘ্র পারে যান।” “সেই কথাই ভাল!” যুবা ফিরিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনারা কোন শ্রেণী?” যুবা বিস্মিত হইয়া কহিল, “রাঢ়ীয়শ্রেণী। কেন?” “কোন্ মেল?” “ফুলিয়া। একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?” “আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, যদি কন্যা পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি।” আগন্তুকের কথা শুনিয়া যুবা হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, “না, মহাশয়, আমাদের পরিবারে বিবাহ যোগ্যা কন্যা নাই।” যুবা নৌকায় ফিরিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই বড় নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকা পরপারে লইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্মশান বাসী

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সুতীগ্রামের অনতিদূরে, ভাগীরথীতীরে এক বিস্তৃত শ্মশান ছিল। গ্রামের উত্তরে নাতিপ্রশস্তা পদ্মা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গাপ্রবাহ এবং পূর্ব্বদিকে বহুদূর-বিস্তৃত বেণুবন। গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে, বেণুবনের দক্ষিণ সীমায় একটা অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল; তাহার শাখাপ্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সেইস্থান হইতে সুতীগ্রামের শ্মশান আরম্ভ। বহুদূর হইতে লোকে সুতীর শ্মশানে শব লইয়া আসিত। পদ্মার পশ্চিম তীরের লোক ত আসিতই, এমন কি পদ্মা ও পাগলানন্দার উত্তর তীরের লোকও নৌকায় ধনীব্যক্তির মৃতদেহ লইয়া এই শ্মশানে আসিত। শ্মশান বিখ্যাত বলিয়া গ্রামের লোক দিবাভাগেও এ পথে চলিত না। স্ত্রীসমাজে ও বালকমণ্ডলীর মধ্যে শ্মশান অপেক্ষা তাহার সীমান্তস্থিত বটবৃক্ষের খ্যাতি অধিক ছিল। বহুদূর হইতে মৃতদেহ লইয়া আসিয়া লোকে এই বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। এবং সময়ে-সময়ে শুনা যাইত যে, বাহকগণ বটবৃক্ষতলে আসিয়া শব রাখিয়া গ্রামে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল,—কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মৃতদেহের সন্ধান পায় নাই। সুতীগ্রামে এই বটবৃক্ষ বহুবিধ ভূত, প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের লীলাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। নিতান্ত আবশ্যক হইলে লোকে শ্মশানের সী

"রামচন্দ্র! তোমরা তাহা হইলে এতক্ষণ মস্করা করিতেছিলে?" "মস্করা করিব কেন, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, 'আমাদের ঘরে পাত্রী আছে কি না', 'বলিলাম, আছে'; কারণ, আমাদের দিল্লীর বাড়ীতে এখনও শতখানেক অবিবাহিতা কন্যা আছে। আমাদের ঘরে আবার অনেকের বিবাহ হয়ই না।" "মুসলমানের মধ্যেও কি কুলীন আছে না কি?" "সে কথা বলিতে পারি না; তবে পাত্রী অনেক আছে। যদি বিবাহ করিতে চাহ, ব্যবস্থা করিতে পারি।" "অর্থের বড়ই অনাটন; সুতরাং একটি কুলরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।" "ভাল, সত্বর তোমার একটি ভাল বিবাহ দেওয়াইব। তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথার্থ উত্তর দাও।" "জিজ্ঞাসা করিয়া যাও। কিন্তু বিবাহটা কবে দিবে আগে বলিয়া রাখিলে, উত্তর দেওয়া একটু সহজ হইবে।" "কালই দিব।" "কাল বিবাহের লগ্ন নাই।" "তুমি কি জ্যোতিষ জান?" কিছু কিছু জানি।" "বল দেখি আমি কে?" তুমি যবন রাজার পৌত্র।" "আমি কোথায় যাইতেছি?" "ওসকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" "তবে তুমি জ্যোতিষ জান না।" "সেই কথাই ভাল। বিবাহ দিতে পারিবে না বুঝি?" "কেন পারিব না,--তুমি যেদিন বিবাহ করিতে চাহিবে সেইদিনই দিব। আমি কোথায় যাইতেছি সে কথা বলিতেছ না কেন?" "যদি নিতান্ত শুনিতে চাহ, তাহা হইলে প্রভাতে আসিও।" "এখন বলিতেছ না কেন?" "নিশীথ রাত্রি গণনার পক্ষে প্রশস্ত সময় নহে।" "ভাল

কথা, প্রভাতে আসিব ; কিন্তু তুমি গ্রাম ছাড়িয়া শ্মশানে বাস কর কেন ?” “গ্রামে অনেক মানুষের বাস,—মানুষ মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক,—সেইজন্য গ্রামে না গিয়া শ্মশানে বাস করিতেছি।” “ভাল কথা। কিন্তু যে অগ্নিতে মৃতদেহ দগ্ধ হইল, তাহাতে খাদ্য পাক করিতে ঘৃণা বোধ হয় না ?” “ঘৃণা বোধ হইবে কিসের জন্য ? অগ্নি কখনও অশুদ্ধ হয় না,—তাহার উপর যে দেহের জন্য অন্নপাক করিব, সেই দেহই যখন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তখন সে অগ্নিতে রন্ধন করিতে আপত্তি কি ?” “তুমি যে দেওয়ানা ফকীরের মত কথা কহিতে আরম্ভ করিলে ?” “আমি ফকীর হইতে যাইব কেন, বাঙ্গালা দেশে দশ-বারখানা গ্রামে আমার দশ-বারটি পূর্ণ সংসার। আমি ফকীর হইতে যাইব কেন, বালাই যাট্।” শ্মশানবাসী এই বলিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল ; এবং তিন লম্ফে শুভ্র-বালুকাক্ষেত্র পার হইয়া বটবৃক্ষতলের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই বটবৃক্ষতল হইতে মনুষ্য-কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, “ও বাবা ব্রহ্মদৈত্য ! আমি দীননাথ বাবা ! আমি কিছু জানি না বাবা ! আমাকে ছাড়িয়া দেও বাবা ! কাল সকালে সওয়া পয়সার হরির লুট্ দিব বাবা ! ওগো গেছি গো,—ওগো কর্ত্তা বাবা নবদ্বীপচন্দ্র গো, পয়সার লোভে পরাণটা গেল গো,—ওগো, বেটা নেড়ের কথা শুনে অসীম রায়কে ধরিতে আসিয়া আমার পরাণটা গেল গো, ওগো বাবা ব্রহ্মদৈত্য গো, এমন কাজ আর কখন করিব না গো——”

আগন্তুকদ্বয় দ্রুতপদে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, শ্মশানবাসী প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে ভীষণবেগে এক পিণ্ডাকার মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহারা বৃক্ষতলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, স্থূলকায় মনুষ্য বহুকষ্টে শ্মশানবাসীর কবল-মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র শ্মশানবাসীর হস্তে রহিয়া গেল। আগন্তুকদ্বয় শ্মশানবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" সে কহিল, "চোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইতেছিল, বহুকষ্টে রক্ষা করিয়াছি।" "তোমার যথা-সর্ব্বস্বটা কি?"

শ্মশানবাসী জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ একখানি বস্ত্র, একখানি ছিন্ন কন্থা ও একখানি কীটদষ্ট পুঁথি দেখাইয়া কহিল, "ইহাই আমার যথা, এবং ইহাই আমার সর্ব্বস্ব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মদৈত্য

প্রভাতে ভাগীরথীর প্রশস্ত, শুষ্ক বক্ষে এক দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন। মধ্যে-মধ্যে অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ আসিয়া তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতেছিল। প্রাতঃ-সন্ধ্যা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ সিক্ত বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তনাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে তীরের দিকে চলিলেন।

গঙ্গাপ্রবাহের অনতিদূরে, শুভ্র বালুকা-স্তূপের উপরে জনৈক স্থূলকায় মনুষ্য পতিত ছিল; মধ্যে-মধ্যে তাঁহার কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদই ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনার ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত এবং সে অচেতন। ব্রাহ্মণ জলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া উত্তরীয়খণ্ড ভিজাইয়া লইলেন; এবং সেই জল লইয়া গিয়া চেতনাহীন ব্যক্তির মুখে সেচন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পরে তাহার চেতনা ফিরিল। তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, গঙ্গাবক্ষে দুই-একখানি নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু ভাগীরথীর কোন তীরেই অপর মানবের চিহ্ন নাই।

জ্ঞান হইবার পরে সে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল; এবং তাহার পর অতি সাবধানে ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া ব্রাহ্মণকে দেখিয়া লইল। ইহারও কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে-ধীরে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তুমি কি ব্রহ্মদৈত্য?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিল; এবং তাঁহার হাসি শুনিয়া সে পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ভয় নাই, আমি ব্রহ্মদৈত্য নহি!" আশ্বস্ত হইয়া সে ধীরে-ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল; এবং আরও ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক বলিতেছ?" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠিক বলিতেছি?" "তুমি ব্রহ্মদৈত্য নহ? "না—না, তোমার ভয় নাই, আমি ব্রহ্মদৈত্য নহি।" "কেমন করিয়া বুঝিব, তুমি ব্রহ্মদৈত্য নহ?" "কেন, কথায় বিশ্বাস হইল না?"

"সুতীগাঁয়ের লোকের কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার মত আহাম্মুক সারা হিন্দুস্থানে নাই।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি বালু ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ব্রাহ্মণকে কহিল, "ঠাকুর, আমার এই ডাহিন গালে একটা জোরে চড় মার দেখি!" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, "চড় মারিতে যাবই কেন?" "চড় খাইলে বুঝিতে পারি, তুমি ব্রহ্মদৈত্য কি না। বাঁ-দিকে মারিও না, কারণ, রাত্রের চড়ে দুইটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে।" "তবুও চড় খাইবার সাধ মেটে নাই?" "চড় কি সাধ করিয়া খাইতে চাই ঠাকুর! যদি একটার উপর দিয়া যায়, তাহা হইলে দুই চারিটা দাঁত বাঁচিয়া যাইতে পারে।" "তোমার নিবাস কোথায়?" "কাটোঞা।" "যাইবে কোথায়?" "যে দিকে দু' চোখ যায়।" "তুমি কি সন্ন্যাসী না কি?" "উপস্থিত টাকার শোকে একপ্রকার বটে।" "টাকার শোক কি রকম?" "সে অনেক কথা দাদাঠাকুর।" "ব্রহ্মদৈত্যের হাতে পড়িলে কি করিয়া?" "সেও ঐ টাকার শোকে!" "সে কি রকম কথা?" "দাদাঠাকুর ব্রহ্মদৈত্যের ভয়ে সারারাত্রি দাঁতি লাগিয়া পড়িয়া ছিলাম,—আগে এক ছিলেম তামুক খাওয়াইয়া প্রাণটা বাঁচাও, পরে সকল কথা বলিব।"

সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের সহিত চলিল। দূরে একটা বড় ভাঙ্গনের নিম্নে একখানা বড় নৌকা বাঁধা ছিল। ব্রাহ্মণ সেই নৌকায় উঠিয়া তামাকু, কলিকা, কয়লা, শোলা ও চকমকি লইয়া ফিরিয়া আসিল; এবং কলিকায় তামাকু সাজিয়া,

চকমকিতে লোহা ঠুকিয়া শোলা ধরাইল। এই অবসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জলে নামিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিল; এবং ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কলিকাটি লইয়া কয়লা ধরাইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ সিক্ত বেলাভূমিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" তাহার সঙ্গী তখন কলিকায় প্রথম টান দিতেছিল,—সে নাসিকা ও মুখ হইতে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে বলিল, "আমার নাম? শ্রীদীননাথ সাহা, আমার কত্তাবাবার নাম নবদ্বীপচন্দ্র সাহা। তা' তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বুঝলেন দাদাঠাকুর?" "ভাল কথা, তবে ব্রহ্মদৈত্যের হাতে পড়িলে কি করিয়া?" "লালবাগে বাদসাহের নাতি আসিলে, লোভে পড়িয়া একখানা দোকান খুলিয়াছিলাম। ফৌজের লোকের রসদ্ সরবরাহ করিয়া দিনকতক বেশ দু'পয়সা রোজগার করিলাম। হঠাৎ একদিন ছাউনি গুটাইয়া ফৌজ কুচ্ করিল; কিন্তু আমার পাওনা টাকাটা দিতে ভুলিয়া গেল। কি করি প্রাণের দায়ে ফৌজের পিছন-পিছন সুতী অবধি আসিয়াছি। এখানে এক ব্যাটা নেড়ে বলিল, যে অসীম রায় না কি বাদশাহের নাতির বড় পেয়ারের লোক, তাহাকে ধরিতে পারিলে সমস্ত টাকার কিনারা হইবে। কি করি, মাঝরাত্রিতে অসীম রায়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। ছাউনিতে শুনিলাম, সে না কি বাদশাহের নাতির সঙ্গে শ্মশানে গিয়াছে। কি করি, দাদাঠাকুর, টাকার শোক পুত্র-শোকেরও অধিক,—শ্মশানেই চলিলাম। সঙ্গে এক ঠ্যাটা বামুন ছিল, সেও বখ্শীর কাছে পাওনা টাকার

কিনারা করিতে আসিয়াছে ; কিন্তু সে শ্মশানের নাম শুনিয়াই চম্পট দিল। স্তুতীগাঁয়ের শ্মশান বড় ভারি শ্মশান। সেখানে একটা বটগাছ আছে, সেই বটগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা। মাঝরাত্রিতে কালাচাঁদের নাম করিতে-করিতে যেমন বট-গাছতলায় আঁধারে পা দিয়াছি, অমনি ব্রহ্মদৈত্য এক লাফে আমার ঘাড়ের উপরে। বাপ!'—" "কি বলিলে, অসীম রায়?" "হাঁ, দাদাঠাকুর, তাহার না কি এখন পোয়াবার,—বাদশাহের নাতি তাহার কথায় উঠে বসে।" "এই অসীম রায়টা কে শুনিয়াছ?" "বাঙ্গালী।" "নিবাস কোথায় জান?" "সে কথা বলিতে পারিব না দাদাঠাকুর!" "চল দেখি, দেখিয়া আসি!" "আবার সেই বটতলায়,—এ কাঠামে পোষাইবে না দাদাঠাকুর।" "ভয় কি, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" "তুমিই যাও আর যে-ই যান, দীননাথ আর বটতলায় যাইতেছেন না।" "ব্রহ্মদৈত্য কি রকম বল দেখি?" "এই, হাঁড়ির কালির মত রং, তালগাছের মত লম্বা, হাতের কিলগুলি ঢেঁকির পাড়ের মত মিষ্ট।" "চল দেখি, দূর হইতে ব্রহ্মদৈত্যটা আমাকে দেখাইয়া দিবে!" "যাইতে হয় তুমিই যাও দাদাঠাকুর, আমার সখ্ মিটিয়া গিয়াছে।" "চলই না, হয় ত অসীম রায়ের সহিত দেখা হইয়া যাইবে।" "সেটা, ওর নাম কি, তা—তফাৎ হইতে। বটতলায় দীননাথ আর যাইতেছেন না।" "তবে চল। তোমার বাসা কোথায়?" "বৃন্দাবনদাস বাবাজীর বৈষ্ণবীর আখ্‌ড়ায়।" "বৈষ্ণবী কেন,

বৈষ্ণব কোথায় গেল ?” “বৈষ্ণবীকে ওয়ারিশান রাখিয়া ফৌৎ করিয়াছে এবং সে যৌবন গত হয় নাই মনে করিয়া মালা-চন্দন করিয়াছে।” “অতি উত্তম কথা ; গা তুল।”

উভয়ে জাহ্নবীপ্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া আম্রপনসকুঞ্জবেষ্টিত সুতীগ্রামের দিকে যত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যদ্বাণী

সুতীগ্রামের উত্তর সীমায় বহুকাল পূর্ব্বে এক পাঠান বাস করিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহারও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, পাঠান, পদ্মাতীরে রমণীয় পুষ্পকানন রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে এক মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। গৌড়দেশে পাঠানরাজ্যের শেষ চিহ্নের সহিত পদ্মা বহুদিন পূর্ব্বে পাঠানের অট্টালিকা আত্মসাৎ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত নন্দন-কাননের কিয়দংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। সেই অরক্ষিত উদ্যানে, এক প্রাচীন তড়িদ্দীর্ণ সহকার, বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যার ন্যায়, নবীনা সুন্দরী মালতীর বাহুবেষ্টনের লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। সেই মালতী-বিতানের চতুর্দ্দিকে পরিহাস-রসিকা সখিবৃন্দের ন্যায় শ্বেত, রক্ত ও পদ্মকরবীর অসংখ্য গুল্ম বেষ্টন করিয়া থাকিত। স্থানে-স্থানে তখনও মর্ম্মর-নির্ম্মিত সরোবর ও প্রস্রবণের চিহ্ন দেখা যাইত।

সেইদিন প্রভাতে, জাহ্নবী-তীরে দীননাথ যখন ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় চেতন হইয়াছে, তখন সেই শুষ্ক সহকার-মূলে চপলা মালতী-বিতানের স্বল্প ছায়ায় জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবা এক শীর্ণদেহ কৃষ্ণকায়, ব্রাহ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, "পারসী পড়িয়াছিলাম; কিন্তু চর্চ্চার অভাবে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।" মুসলমান কহিল, "আপনার কথা বুঝিলাম না।" তখন সহসা সেই শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণ সালঙ্কার পারসীক ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিল। মুসলমান যুবা তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "জহাঁপনা, মানুষ প্রয়োজন ব্যতীত কোনও কাজ করে না। যতদিন উৎসাহ ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ততদিন পারসীর চর্চ্চা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমার আর অর্থ বা যশের আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং পারসীর চর্চ্চাও করি না।" "কিন্তু কাল রাত্রিতে তুমি ত একটীও পারসী কথা ব্যবহার কর নাই।" "কি জানেন শাহজাদা, আমার মাথার ভিতরে অনেকগুলা রুদ্ধ কবাট আছে। কখনও যদি কোনটার জীর্ণ-রুদ্ধ কবাট ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া যায়, তাহা হইলে সুদূর অতীতের অনেক বিস্মৃত কথা বন্যার স্রোতের মত আসিয়া আমাকে অভিভূত করে।" "তুমি কি দরবারে কোন চাকুরী করিতে?" "সে অনেক দিনের কথা,—খালসার দেওয়ানীতে সুমারনবীশ ছিলাম; সেও আলমগীর বাদশাহের আমলে।" "ছাড়িলে কেন?" "লোকে চাকুরী করে অর্থোপার্জ্জন ও ক্ষমতা লাভের জন্য। আমি হঠাৎ একদিন

বুঝিয়া দেখিলাম, আমার কোনটারই প্রয়োজন নাই।" "সে কি!" "সে কথা তুমি কি বুঝিবে শাহ্‌জাদা! তুমি এখন ময়ূর-সিংহাসনের পথে চলিয়াছ;—তোমার এই প্রথম যৌবন;—উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ,—তুমি সে কথা বুঝিবে কি করিয়া? যেদিন রমণীকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইবে, যেদিন বুঝিবে যে এ সংসারে তুমি তোমার, আর কেহ আপনার নয়,—প্রেম, ভক্তি বা স্নেহ কোন বন্ধনই লালসাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না,—সেই দিন তোমার আমার মত অবস্থা হইবে। রাজপুত্র, সিংহাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। ময়ূর-সিংহাসনের পথ অতি বন্ধুর! আলম্‌গীর ও শাহ আলম্‌ বাদশাহ তাহা বুঝিয়াছিল। কিন্তু অবরোহণের পথ আরও কঠিন। সে পথ বড় পিচ্ছিল, রাজপুত্র! হুমায়ুনের পরে তোমার বংশের আর কেহ সে পথে চলে নাই।" "কাফের, তুমি কি বলিতেছ? তুমি জান শাহ্-আলম্‌ বাদশাহ সিংহাসনে আসীন, তুমি জান আমার পিতা জীবিত এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান? ময়ূর-তক্তের কথা কি বলিতেছ! তুমি নিশ্চয় দেওয়ানা!" "ঐ তো গোল শাহ্‌জাদা; যে সাফ্‌ দেখে, সে হয় পাগল,—আর যাহারা দৃষ্টিশক্তি থাকিতে চক্ষু রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহারা এ দুনিয়ার দুনিয়াদার। রাজপুত্র! বৃদ্ধের প্রাণ পদ্মপত্রের জল! সিংহাসনের পথে জীবনের মূল্য অতি সামান্য। ঐরাবৎ সামান্য কারণে ইরাবতী গর্ভে বিলীন হয়। কোথা হইতে কি হয়, তাহা কয়জনে বুঝিতে পারে? এই দেখ তুমি

আমাকে পাগল মনে করিতেছ ; অথচ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তুমি কোন্ পথে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছ! আমি যদি সে কথা তোমায় প্রকাশ করিয়া বলি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিবে না। তোমাকে যদি কোন কাজ করিতে নিষেধ করি, তুমি সে কথা বুঝিতে পারিবে না।" "কেন পারিব না কাফের, নিশ্চয় পারিব! জহাঙ্গীর নগরে এক ফকীর একবার আমাকে এই রকম কথা বলিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল যে, একদিন আমাকে হিন্দুস্থানের মালিক হইতে হইবে। তুমিও ত সেই কথা বলিলে। দেখ, আমি সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতেছি। তুমি বল, আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিব।" "সাধ্য কি শাহ্জাদা? যে আমাকে দিয়া এই সকল কথা বলায়, সে লক্ষ-লক্ষ হিন্দুস্থানের বাদশাহের বাদশাহ। তাহার কণ্ঠস্বর বা তাহার হস্ত কখনও কম্পিত হয় না। তাহার আদেশ কখনও ব্যর্থ হয় না। সে বলিতেছে, তুমি পারিবে না। শত-শত, লক্ষ-লক্ষ চিন্তাশূন্য যৌবনোন্মত্ত যুবা যে পথে গিয়াছে, তুমিও সেই পথে যাইবে ; কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।" "কাফের, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ? তুমি জান, আমি কে?" "খুব জানি! তুমি, তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলকেই জানি। চোগ্তাই! জানি যে, তোমার ক্রোধ-ক্রূর দৃষ্টির আঘাতে হফ্ত্-হাজারি মন্সব্দারের স্কন্ধেও মস্তকের বন্ধনটা শ্লথ হইয়া যায়। সে কথা বলিয়া তকলিফ করিতে হইবে না শাহজাদা! আমি আলমগীরী-

আমল্।” “কাফের, তুমি যে আমীর ছিলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য! তোমার মত মানুষ আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই! তোমার কি জীবনের ভয় নাই?” “রাজপুত্র, তুমি নির্ব্বোধ নহ; কিন্তু কথাটা নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই কহিলে। যাহার জীবনে মায়া থাকে, তাহারই মরিতে ভয় হয়। ভাবিয়া দেখিলে না, যে মোগল বাদ্শাহের মন্সবদারী ছাড়িয়া শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করে, মোগ্লাই খানা ছাড়িয়া চিতাগ্নিতে অন্নপাক করে, সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অসংখ্য গোলাম ও বাঁদীর পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া এই নর-কঙ্কাল-সঙ্কুল শ্মশানে অন্ধকারে বিচরণ করে, তাহার জীবনের মমতা কতটুকু? শাহ্জাদা, তুমি মেহেরবান্ ও কদরদান্! আমার উপর মেহেরবানী কর, একটা অনুরোধ রাখ। এই পুরাতন মাথাটা অনেক দিন বহিয়া আসিতেছি, একবার বদ্লাইবার সখ হইয়াছে। হুকুম কর, একজন আহদী ডাক, আমার এই পুরাতন বোঝাটা নামাইয়া দিয়া যাক্।” “আশ্চর্য্য কাফের, আশ্চর্য্য! তোমার মনের বল অদ্ভুত। ইচ্ছা করিয়া কোন মানুষকে তীক্ষ্ণধার তরবারির নিম্নে মাথা পাতিয়া দিতে শুনি নাই।” “শোন নাই! এই ত সবে শুনিতে আরম্ভ করিয়াছ! এখন কত শুনিবে! ফররুখসিয়র, যেদিন দিবাকর-কিরণ-দীপ্ত জগৎ অন্ধকার দেখিবে, সেদিন তুমিও উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিবে,—যদি কেহ বন্ধু থাক, তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়া আমার স্কন্ধের এই পুরাতন বোঝাটা নামাইয়া দিয়া যাও।” “কাফের,

আবার কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না! আমি ফর-রুখ্‌সিয়র, আজীম্‌-উশ-শানের পুত্র, শাহ্‌আলম্‌ বাদ্‌শাহের পৌত্র,—এমন দশা আমার হইবে? কবে হইবে, কেন হইবে?" "সে তোমার উপর নির্ভর করে শাহজাদা? রমণী-রূপের মাদকতা তীব্রতম মদিরা অপেক্ষাও তীব্র; সে সুরা যেদিন তোমাকে উন্মত্ত করিবে, সেদিন হইতে অবনতির পিচ্ছিল শৈবাল-পথ অবলম্বন করিবে। সেপথ অতি দূর; কিন্তু সে পথে তোমার গতি অতি দ্রুত।"

শাহ্‌জাদা মালতী-বিতানের প্রাচীন প্রস্রবণের ধ্বংসাবশেষের উপর উপবেশন করিলেন; এবং উভয় হস্তে ব্রাহ্মণের হস্তদ্বয় আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাকেও পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল, "আজি পাঠানের উদ্যান ময়ূর-তক্তের সমান।" শাহ্‌জাদা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেম, "এ কথা বলিতেছ কেন?" ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যেখানে দীন ও দুনিয়ার মালিক উপবেশন করেন, সেই তক্ত—পাঠানের ভগ্ন প্রস্রবণ আজি পবিত্র হইল।" "আবার হেঁয়ালি ধরিলে?" "শাহ্‌জাদা, এ সারাজীবনটাই হেঁয়ালী।" "ও-সকল কথা যাক,—তুমি কি নিষেধ করিবে বলিতেছিলে?" "শুনিয়া কি হইবে, তুমি ত বুঝিতে পারিবে না?" "পারিব, তুমি বল।" "দুইটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি,—অধিক কথা তোমার মনে থাকিবে না। রমণীকে কখনও বিশ্বাস করিও না;—আর জানিও যে, অন্ধ কখনও বিশ্বাসঘাতক হইবে না।"

এই সময়ে দূরে অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল। শাহ্‌জাদা সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, একজন আহ্‌দী অশ্বারোহণে আসিতেছে; এবং তাহার পশ্চাৎ আরও তিনজন মনুষ্য পদব্রজে আসিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মালতী-বিতানে

আহ্‌দী দূর হইতে অভিবাদন করিল। শাহ্‌জাদা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখন আমার অবসর নাই।" আহ্‌দীর পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "জনাব, অবসর নাই বলিলে চলিবে না। একখানা নৌকাও পাওয়া গেল না।" শাহ্‌জাদা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফৌজদার কোথায় গেল?" বক্তা আহ্‌দীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "নিরুদ্দেশ,—সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ।" "এ সমস্তই দেওয়ানের চক্রান্ত।" "সে কথা কি আপনি এতক্ষণে বুঝিলেন?" যে কৃশকায় ব্রাহ্মণের সহিত শাহ্‌জাদা এতক্ষণ বাক্যালাপ করিতেছিলেন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে? নৌকা নাই? হাবেলী পরগণায় একখানা নৌকা খুঁজিয়া পাইলে না? এই বুদ্ধিতে তোমরা আলমগীর বাদশাহের সাম্রাজ্য শাসন করিবে?

পাগলের কথা শোন। স্থতীর পরপারে পদ্মার দহ পড়িয়াছে; দহের জলে পঞ্চাশখানা নৌকা ফৌজদারের লোকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।” শাহ্‌জাদা বলিয়া উঠিলেন, “সাবাস্ ফকীর! তোমার অজ্ঞাত কি কিছুই নাই?” “অনেক আছে! রাজপুত্র, যত শীঘ্র পার, এ দেশ পরিত্যাগ কর।” “কেন?” “যতদিন এ দেশে থাকিবে, ততদিন তোমার দুষ্ট গ্রহ প্রসন্ন হইবে না।” “কোন্ দিকে যাইব?” “বলিয়াছি ত, ময়ূর-সিংহাসনের পথে।” “যাহা বলিতেছ, তাহা যদি স্পষ্ট করিয়া বল, তাহা হইলে বুঝিতে পারি।” “ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অধিকার আমার নাই রাজপুত্র।” আহ্‌দীর সঙ্গী এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “এ ব্যক্তি আপনাকে কি বলিতেছে শাহ্‌জাদা?” শাহ্‌জাদা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল, “কি বলিতেছি, জান অসীম রায়? এতক্ষণ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানখানায় বসিয়া কৃশকায়, ক্ষুদ্রচেতা হরনারায়ণ রায় বলিতেছে যে, সে ভাগীরথী ও পদ্মার অর্দ্ধেক নৌকা লুকাইয়া রাখিয়াছে; এবং ইচ্ছা করিলে শাহ্‌জাদাকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিতে পারে! আরও কি বলিতেছি শুনিবে? বলিতেছি যে, ময়ূর-সিংহাসনে আরোহণের পথ বন্ধুর বটে, কিন্তু তাহা হইতে অবরোহণের পথ আরও কঠিন। সে পথ বড় পিচ্ছিল। সে পথে যাহাদের পদস্খলন হয়, যাহারা জনশূন্য দেওয়ান্-ই-আম্ নিজ পদশব্দে মুখরিত করিয়া শূন্য নকারাখানায় অস্তমিত নিজ গৌরব রবির ক্ষীণ ছায়া স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস

পরিত্যাগ করে, তাহাদের মত হতভাগ্য বাদ্‌শাহ কখনও দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করে নাই।" "অমঙ্গলের কথা কেন কহিতেছ ঠাকুর?" "শুনিতে ইচ্ছা না হয়, চলিয়া যাও। যুবা তুমি বাদ্‌শাহ্‌ অপেক্ষা হতভাগ্য! বাদ্‌শাহের অমঙ্গলের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতেছ; ভবিষ্যৎ তোমার জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা শুনিয়াছ কি?"

এই সময়ে মালতী-বিতানের অপর পার্শ্বে একজন বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, ওই গো বটে!" শাহ্‌জাদা অধিকতর বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কে আসিল?" কুঞ্জের অপর পার্শ্ব হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "বাবা, আমি দীননাথ গো! আমার কর্ত্তাবাবার নাম নবদ্বীপচন্দর।" তাহার পরই আর একজন বলিয়া উঠিল, "অসীম!" দ্বিতীয় ব্যক্তিব কণ্ঠস্বর শুনিয়া অসীম দ্রুতপদে মালতী-বিতানের বাহিরে আসিয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। শাহ্‌জাদা বিস্মিত হইয়া শ্মশানবাসী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় সাহেব এমন করিয়া কোথায় গেল?" উত্তর হইল, "অদৃষ্ট-নির্দ্দিষ্ট পথে।" "সে পথে ত সকলেই চলে, কিন্তু এত উতলা হইয়া কোথায় গেল?" "তাহার শুভগ্রহ তাহাকে যে পথে লইয়া যাইতেছিল, সে পথ হইতে তাহাকে নিরত করিবার জন্য দুষ্ট গ্রহ এমন একটা শক্তি আহ্বান করিয়া আনিয়াছে, যে শক্তির আকর্ষণ রোধ করা অসীম রায়ের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমি চলিলাম।" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া ক্ষিপ্রপদে পদ্মাতীরস্থিত বেণুকুঞ্জমধ্যে অদৃশ্য হইয়া

গেল। শাহ্‌জাদা ফর্‌রুখ্‌সিয়র্‌ অবসন্ন দেহে মালতী-কুঞ্জতলে বসিয়া পড়িলেন।

তখন সেই প্রাচীন মালতী-বিতানের বহির্দ্দেশে দুই বাল্যসখা আপন মনে বাক্যালাপ করিতেছিল; এবং বণিক দীননাথ তাহাদিগের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছিল। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অপমানের ভার মস্তকে বহিয়া, একমাত্র কন্যার অপকলঙ্করাশি-লিপ্ত হইয়া তোমার বৃদ্ধ পিতা দেশত্যাগ করিলেন। ক্ষোভে অপমানে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তুমি তাঁহাকে আসিতে দিলে কেন?" আগন্তুক কহিলেন, "তুমি কি কর্ত্তাকে ভুলিয়া গিয়াছ ভাই! জগতে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারে।" "সে কথা ভুলি নাই; কিন্তু ইহার ফল কি হইবে, বিবেচনা করিয়াছিলে কি? আমাদের কুলীন-সমাজে লোকে দিনে তিনবার জাতিচ্যুত হয় এবং তিনবারই সামাজিক পদ ফিরিয়া পায়; কিন্তু হিন্দুরমণীর কলঙ্ক কখনই মোচন হয় না। আমার কি! বড় গৃহিণীর নিকট বহু ঋণ আছে, সে ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব কি না সন্দেহ! সে ঋণভার না হয় আর একটু বাড়িল। কিন্তু দুর্গার কি হইবে?" "আমি ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না ভাই! সৌভাগ্যক্রমে তোমার সহিত দেখা হইয়াছে। আমাদের এখন বড় অসময় অসীম! প্রকৃত বন্ধুর কাজ কর, বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" "আমার এক একবার মনে হইতেছে যে, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করি;

কিন্তু কি করিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব?” “অসীম, তুই কি পাগল হইয়াছিস্,—এখনও বাবাকে চিনিতে পারিস্ নাই?” “চিনিতে ভুল করি নাই সুদর্শন! তোমাদের গৃহে পুত্রবৎ স্নেহ লাভ করিয়াছি; কিন্তু—” “কিন্তু কি? তুমি কি মনে কর যে, দুর্গার চরিত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে, ঠাকুর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন?” “সে কথা সত্য; কিন্তু মুখ দেখাইব কি করিয়া?” “চঞ্চল হইও না ভাই, বিষম সঙ্কট উপস্থিত! তুমি ধীর, শান্ত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান; এ বিপদে তুমি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই।” “সুদর্শন তোমার জন্য বা ঠাকুরের জন্য স্বচ্ছন্দে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি; কিন্তু কথাটা যে অতি জঘন্য?” “দূর কর পাপ কথা; শুন অসীম, আমি সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ; চিরদিন সঙ্গীত-চর্চ্চাই করিয়া আসিয়াছি—অপর চিন্তা কখনও মনে স্থান পায় নাই। আমার কাণে-কাণে কে বলিয়া গেল যে, কর্ত্তার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলেই আমাদের সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। আমার মন এখন এত প্রসন্ন যে, আমার গান ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে। লাঞ্ছিত, অপমানিত, গৃহতাড়িত ব্যক্তির পক্ষে আশ্চর্য্য কথা নহে! ভৈরবীর সময় কাটিয়া গেল, তুই শীঘ্র চল্।” “চল যাই; কিন্তু তোমার সঙ্গে এ কে?”

সুদর্শন সংক্ষেপে দীননাথের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া অসীম পুনরায় মালতী-বিতানে প্রবেশ করিলেন; এবং বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে মালতী-মূলে

ধূলি-শয্যায় উপবিষ্ট শাহ্‌জাদা গভীর চিন্তা[illegible] তাঁহার পদশব্দেও চিন্তাস্রোত বাধা পাইল না দেখিয়া অসীম ডাকিলেন, "শাহ্‌জাদা!" ফর্‌রুখ্‌সিয়র্‌ মুখ তুলিয়া কহিলেন, "রায় সাহেব, ফকির কি বলিয়া গেল বুঝিলাম না। তাহার কথার অর্থ বলিতে পারে এমন লোক সন্ধান করিতে পার?" "এখনই পারি।" "চল, তাহার নিকটে যাইব।" শাহ্‌জাদা ধরাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

অর্দ্ধদণ্ড পরে রসীদ ও পত্র লইয়া দীননাথ সুতীগ্রাম পরিত্যাগ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নিয়তি

সুতীগ্রামের পরপারে ভাগীরথীর অনতিদূরে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। ভাগীরথী-প্রবাহ যখন গ্রাম হইতে বহুদূরে, তখন এই দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন ভাগীরথী দীর্ঘিকার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং ইহার প্রয়োজনাভাব। দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি প্রশস্ত ঘাট। তাহা সংস্কারাভাবে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দীর্ঘিকা পদ্মবনে পরিপূর্ণ; সুতরাং যত্নের অভাব হইলেও, উহার জল কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল। গ্রামের লোকে গঙ্গোদক

নিকটে পাইয়া দীর্ঘিকার 'জল পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু বালক-বালিকাগণ তাহাতে সন্তরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।

মধ্যাহ্ন অতীত-প্রায়। ভাগীরথী-তীরে বেণু-কুঞ্জের ছায়ায় একখানা ক্ষুদ্র নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে; কিন্তু নৌকার আরোহী বা নাবিক সকলেই নিদ্রিত। সেই বেণুকুঞ্জ হইতে পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে দীর্ঘিকার একটি ঘাট আছে। এককালে ঘাটের উপরে একটি মন্দির ছিল; কিন্তু অশ্বত্থ ও বটের কৃপায় মন্দিরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে,—অশ্বত্থ ও বট রহিয়াছে। অশ্বত্থ ও বট পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া একজন ভগবৎ-প্রেমিক ইহার নাম দিয়াছিলেন যমলার্জ্জুন। মন্দিরের অস্তিত্ব-লোপ হইলে মন্দিরবাসী দেবতা যমলার্জ্জুনতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে এক তন্বঙ্গী শ্যামা শুভ্রবসনা বিধবা দেবতার অর্চ্চনা করিতেছিল।

শিবপূজা সাঙ্গ হইলে, রমণী যথাবিধি গলদেশে অঞ্চল প্রদান করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই রমণী চমকিতা হইল; কারণ অদূরে ভগ্নঘাটের ইষ্টকস্তূপের উপরে বসিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা একমনে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বালিকা কখন আসিয়াছে, একাগ্রমনে পূজা-নিরতা রমণী তাহা জানিতে পারে নাই। বালিকা সুন্দরী,—তেমন সৌন্দর্য্য বোধ হয় দেবলোকেও দুর্ল্লভ। রমণী শ্যামবর্ণা, কিন্তু উজ্জ্বল-কান্তি। তাহার

অবয়বের গঠন-সৌষ্ঠব প্রথম-যৌবনের হিল্লোলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এবং তাহার মাধুরী নয়নোন্মাদকারী;—তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য সেই বালিকার অতুল রূপরাশির নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বে যে রূপ তন্বঙ্গীর পূর্ণ-যৌবনের চিত্তোন্মাদক আকর্ষণ-শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে, সে রূপ দেবলোকেও দুর্ল্লভ, কবি-কল্পনারও অতীত, অতএব অবর্ণনীয়।

রমণী একাগ্রচিত্তে নয়ন ভরিয়া বালিকার রূপরাশি পান করিতেছিল। তাহার কান্তি সুধা-ধবল; কুসুম-পেলব পদতল যেন কঠোর সোপানের কর্কশ স্পর্শে ঈষৎ রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল। জীর্ণ, মলিন বসনখানি বৃথা তাহার রূপ-সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গরাশিকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল; সে বসনের আবরণে তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার বলিয়া বোধ হইতেছিল। রমণী যখন একাগ্রচিত্তে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তখন বালিকার চঞ্চল নয়নদ্বয় দ্রুত গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। রমণীকে স্তব্ধ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা। কোথায় যাইবে?" রমণীর চেতনা ফিরিল; তিনি বলিলেন, "আমরা কাশী যাইব, এক রাত্রির জন্য তোমাদের গ্রামে অতিথি হইয়াছি।" বালিকা বিন্দু-মাত্র লজ্জিতা না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অতিথি হইয়াছ! কাহাদের বাড়ী?" রমণী কহিলেন, "কাহারও বাড়ী নয়, তোমাদের গ্রামের ঘাটে আমাদের নৌকা বাঁধা আছে

সুতরাং আমরা তোমাদের গ্রামের অতিথি।” এই অবসরে রমণী লক্ষ্য করিলেন যে বালিকার কণ্ঠস্বর কর্কশ। বালিকা ঈষৎ মুখবিকৃত করিয়া কহিল, “সে আবার কেমন অতিথি?” কিন্তু রমণী উত্তর দিলেন না। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি গা?” রমণী হাসিয়া কহিলেন, “আমার নাম দুর্গা।” “তোমরা কি কায়স্থ?” “না, আমরা ব্রাহ্মণ।” “ঠিক বটে! ব্রাহ্মণ হইলেই অতিথি হয়। আমাদের বাড়ীতে অনেক অতিথি আসে, সকলেই ব্রাহ্মণ; তাহারা কিন্তু পুরুষ মানুষ।” “তবে আমিই প্রথম মেয়ে অতিথি আসিলাম।” “তুমি কি আমাদের বাড়ী যাইবে নাকি?” “যাইব। তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে?” বালিকা দীর্ঘিকার এক কোণে আম্র-পনসের ঘনসন্নিবেশের মধ্যে এক জীর্ণ অট্টালিকার কঙ্কাল দেখাইয়া দিল। এইবার রমণী প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। “তোমরা কি জাতি?” উত্তর হইল, “কায়স্থ।” “তোমাদের বাড়ীতে আর কে-কে আছেন?” “কেন, সকলেই!” “সকলেই কে-কে?” “বাবা মা, দাদা, ঈশানঠাকুর, জগৎজ্যেঠা আর রামদাদা। ইহাদের মধ্যে জগৎজ্যেঠা আর রামদাদা ছোটলোক; তাহারা সদরের দেউড়ীতে থাকে। আমরা যখন খুব বড়লোক ছিলাম, তখন রামদাদার মত অনেক লোক দেউড়ীতে থাকিত। ঈশানঠাকুরও আমাদের চাকর, তবে সে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতে পায়।” “তুমি এখন কোথা যাইবে?” “গা ধুইতে আসিয়াছিলাম, জলে নামিব।” “এতক্ষণ জলে নাম নাই

কেন? "তুমি নূতন লোক কি না, তোমাকে ঠাহর করিয়া দেখিতেছিলাম। তুমি কি এখন আমাদের বাড়ীতে যাইবে?" "চল, যাইব।" "তবে দাঁড়াও, আমি গা ধুইয়া আসি।" বালিকা এই বলিয়া জলে নামিয়া গেল এবং আকণ্ঠ জল-মগ্না হইয়া অঙ্গ-মার্জ্জনা করিতে আরম্ভ করিল। রমণী নির্ণিমেষ নয়নে দীর্ঘিকার স্বচ্ছজলে বালিকার কমনীয় কান্তির অভিনব সন্নিবেশ দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাঁতার দিতে জান?" বালিকা কহিল, "না।" "যদি ডুবিয়া যাও?" "আমি ডুবিব না, আমি সমস্ত ঘাটের পথ জানি। যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, এইখানে একখানা বড় পাথর আছে, তাহার পরে একেবারে অতল জল।" "সাঁতার শেখ নাই কেন?" "কেহ শেখায় নাই বলিয়া, তুমি কি সাঁতার জান?" "জানি।" "আমাকে শিখাইবে?" "শিখাইব।" "কবে?" "আজ সন্ধ্যাবেলায়।" "সন্ধ্যাবেলায় জলে নামিলে মা মারিবে। বৈকাল বেলায় আসিব কি? ঐ দেখ কাহারা আসিল।"

রমণী ফিরিয়া চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, দীর্ঘিকার পাড়ের উপর দুইজন পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিল, "দুর্গা, এই দিকে আয়। ঠাকুর কোথায়?" রমণী অতি ধীরে ঘাটের উপরে উঠিল এবং কিয়ৎক্ষন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম বক্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর কোথায়?" রমণী অস্ফুট স্বরে কহিল, "গ্রামে গিয়াছেন।" এই বলিয়া রমণী পুনরায় অবনত মস্তকে পদাঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খনন

করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে মস্তক উত্তোলন না করিয়া দ্বিতীয় আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, ভূপ কোথায়? সে ভাল আছে ত?" অসীম কহিলেন, "ভাল আছে দিদি। তোমরা যে এ অঞ্চলে আছ, তাহা আমি জানিতাম না, জানিলে অবশ্যই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম। আমি ফিরিয়া গিয়াই তাহাকে পাঠাইয়া দিব। আমরা এখন বাদ্‌শাহের পৌত্রের আশ্রয়ে আছি দুর্গা। সময় বড় মন্দ কাটিতেছে না। দেখ দিদি! যাহা হইয়াছে সমস্তই শুনিয়াছি। কি করিব, অদৃষ্টের ফল! সমস্ত অনর্থের মূল তোমার স্বামি-দত্ত সেই মোহরগুলি। যদি মনে দুঃখ না পাও, তাহা হইলে বল, ভূপেনের হস্তে ফিরাইয়া দিব।" "না দাদা, যাহা দিয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না তাহা ভূপেনের ইচ্ছামত ব্যয় করিও।"

সহসা দীর্ঘিকার জলের দিকে চাহিয়া দুর্গাঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্তনাদের সহিত উচ্চারিত হইল "ছোট মেয়ে—সাঁতার জানে না—" অসীম তিন লম্ফে ঘাটের শেষ সোপানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মোগ্‌লাই পোষাকের কতকগুলা বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জলে পড়িলেন। ঘাটের অদূরে পদ্মবনের নিকটে তখনও জলে বুদ্বুদ উঠিতেছিল। অসীম সেই স্থানে ডুবিলেন। সুদর্শন ও তাহার ভগিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একবার দুইবার তৃতীয় বার বিফল হইয়া চতুর্থবারে গত-

চেতন বালিকার দেহ স্কন্ধে লইয়া অসীম রায় যখন ঘাটের নিকট আসিলেন, তখন দুর্গা ও সুদর্শন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে নামাইয়া লইলেন। বহু চেষ্টা ও যত্নে বালিকার হৃদ্‌পিণ্ডে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে সুদর্শনের নিকট রাখিয়া অসীম তাহার পিতাকে সংবাদ দিতে চলিলেন।

দীর্ঘিকার পরপারে এক বজ্রাঘাত-শুষ্ক তিন্তিড়ীমূলে সেই কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ বসিয়া ছিল। সে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি রায়জী, দড়িটা নিজে হাতে লইয়া গলায় পরিলে?" অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রকম ঠাকুর!" "যাহা করিয়াছ, তাহার ফল যদি জানিতে, তাহা হইলে উহাকে দীর্ঘিকার গর্ভেই রাখিয়া আসিতে।" "আমাকেও কি ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?" "তোমাকে ভয় দেখায় এমন লোক এখনও জন্মায় নাই। তবে জানিয়া রাখিও অসীম রায়, এই বালিকা তোমার উদ্বন্ধন-রজ্জু। পরে আমাকে দোষ দিও না। যখন কণ্ঠে রজ্জুর আকর্ষণ বোধ করিবে, তখন স্মরণ করিও যে, এক ব্রাহ্মণ বহুপূর্ব্বে তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সে কথা যাক্, গ্রামে বিবাহ-যোগ্যা কুলীন-কন্যা আছে কি না বলিতে পার?" "ঠাকুর, তুমি পাগল অথচ পাগল নহ। তোমার মনের আসল কথা বুঝিয়া উঠা দায়। তুমি কি সত্যসত্যই আবার এ বয়সে বিবাহ করিতে চাহ?" "অর্থের বড়ই অনাটন। কি জান রায়জী! উপস্থিত দুই-একটা বিবাহ না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা

বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে।" "তবে আমার সহিত আইস!"

ব্রাহ্মণ অসীমের সহিত গ্রামসীমায় প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের সম্বন্ধ

সংবাদ পাইয়া বালিকার আত্মীয়-স্বজন দীর্ঘিকাতীরে ছুটিয়া আসিল এবং বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর বালিকার চেতনা ফিরিল। যতক্ষণ অপরে বালিকার চেতনা ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, ততক্ষণ অসীম, ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, দীর্ঘিকা-তীরে বসিয়া ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, সত্য-সত্যই কি বিবাহ করিতে চাও?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "ইচ্ছা করিয়া কি লোকে এতবার মিথ্যা-কথা বলিতে পারে?" "কতগুলি বিবাহ করিয়াছ?" "কি যন্ত্রণা! এক কথার জবাব কতবার তোমাকে দিব? দশ-বার গণ্ডা হইবে।" "তোমার কি দুই-কুড়ি পত্নীই জীবিতা আছেন?" "কয়জন বাঁচিয়া আছেন, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, বিবাহের পরে একজন ব্যতীত অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না স্মরণ হয় না।" "তুমি আশ্চর্য্য করিলে

এই চল্লিশ জনের মধ্যে একজন ব্যতীত জীবনে আর কাহারও সহিত তোমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় নাই?” “আবশ্যক বোধ করি নাই।” “তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন?” “অর্থোপার্জ্জনের জন্য।” “শাহ্‌জাদার মুখে শুনিলাম যে, তুমি এক[illegible] অ[illegible] উপায়ে প্রভূত অর্থ-উপার্জ্জন করিতে। তুমি কি কারণে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া এই উপায়ে—নিষ্ঠুর, ঘৃণিত উপায়ে অর্থ-উপার্জ্জন করিতে চাহ?” “নিষ্ঠুর, ঘৃণিত? অসীম রায়! তুমি বালক, তুমি এই চির-প্রথিত কৌলীন্য-প্রথার মর্য্যাদা কি বুঝিবে? বুঝিয়াছিল বল্লাল, সে বোধ হয় রাজা হইয়াও আজীবন নারী-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, নতুবা বিষহরি-দলনের এই অপূর্ব্ব প্রথা আবিষ্কার করিতে পারিত না।” “যে সকল বালিকা বিবাহ কর, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার কি দয়া হয় না?” “দয়া, বহুকাল পরে একটা নূতন কথা শুনাইলে অসীম রায়! প্রথম-যৌবনে কথাটা বোধ হয় একবার শুনিয়াছিলাম, তাহার পর বহুদিন শুনি নাই। দয়া! ভাষায় এমন একটা কথা ছিল বটে! কিন্তু সে কথাটা নারী-জাতির প্রতি প্রযুজ্য কি না, তাহা ত স্মরণ নাই। দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর বা পঙ্গু দেখিলে এখনও দয়া হয় বটে, কিন্তু দংশনোদ্যত বিষধর সর্প দেখিলে যতটা দয়া হয়, নারী দেখিলে ততটাও যে হয় না, অসীম রায়?” “কি বল ঠাকুর, সংসারে দয়া ও মায়া মূর্ত্তিমতী হইয়া নারীরূপ ধারণ করিয়াছে। কঠোর সংসার-যাত্রায় নারীর স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি মানব-জীবনের একমাত্র

অবলম্বন—” “বাল্যকালে আমিও ঐ কথা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তুমি কি পাঠ আবৃত্তি করিতেছ? বন্ধু! একদিন বিক্রমপুরে আমার ন্যায় পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ছিল না। আমি বাদ্‌শাহের মন্‌সব্‌দার। দেশের প্রধান, বিদ্বৎ-সমাজে গণনীয় ও ব্রাহ্মণ-সমাজে বরণীয় ছিলাম। সংসারের সুখ-সম্পদ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, আমার কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু আজি আমি কি? শ্মশানবাসী-চিতাগ্নি-দগ্ধ অন্নভোজী; তৃতীয় বস্ত্রহীন। কেন বলিতে পার? অসীম দয়া, অসীম রায়! অসীম করুণা, দয়া ও মায়ার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী-মানব-সমাজের একমাত্র অবলম্বন—নারীর অনুগ্রহে।” “তুমি পাগল।” “সে কথা তোমার পূর্ব্বেই অনেকে বলিয়াছে।” “তুমি কি বলিতেছিলে বল?” “তোমাকে অধিক কথা বলিয়া ফল নাই, কারণ তুমি রমণীরূপ-মুগ্ধ। নীরবে মোহনরূপের অন্তরালে যে রাক্ষসী প্রতিমা লুক্কাইতা থাকে, তাহা তুমি দেখ নাই। বন্ধু! দিন ছিল, যখন আমিও তোমার ন্যায় দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ গন্ধতৈল-সিক্ত করিয়া, গন্ধপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া, মোহিনীর কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিতাম; তখন আমিও মনে করিতাম যে, জগতে রমণীরূপের ন্যায় রমণীয় আর কিছুই নাই। রমণীর কমনীয় মাধুরীর নিকট জগতের সমস্ত শোভা পরাজিত। বিশ্বাস করিয়াছিলাম অসীম রায়! রমণীরূপে মুগ্ধ হইয়া যাহাকে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার বিষে আমার সংসারের ঐশ্বর্য্য সম্পদ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আমার ভোগলালসা পরিতৃপ্ত

হইয়াছে। মোহ কাটিয়া গিয়াছে। বন্ধু, তোমাকে নিষেধ করিতেছি, রত্নহার মনে করিয়া কণ্ঠে বিষধর সর্প ধারণ করিও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা; এতদিন জগতে যত লোক দেখিয়াছি, সকলকেই বলিয়াছি; কিন্তু কেহ কর্ণপাত করে নাই।"

ব্রাহ্মণের উক্তি শেষ হইবার পরে অসীম কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং পরে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে ঠাকুর, প্রথম যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলে?" "হাঁ, আমার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী সহধর্ম্মিণী! কবি-কল্পনা আর যাহা কিছু বলিয়াছে সমস্তই। বাদশাহের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি কেন জান? জিঘাংসা! জিঘাংসা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বিবাহ করিয়া আর কখনও সে স্ত্রীর মুখদর্শন করি না। ইহাতে কি হয় জান? তোমার মত এখনও যাহারা রমণীরূপ-মুগ্ধ, অথবা মূর্ত্ত দয়া ও মায়ার মোহে প্রতারিত, তাহাদিগের সর্ব্বনাশের পথ রুদ্ধ করি। যাহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, সে ত আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবে না; তোমার মত বা আমার মত কাহাকেও প্রতারণা করিতে পারিবে না। কেহ তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়া প্র[illegible] যৌবনের অপরিসীম প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত করিতে পারিবে না। ইহাই আমার আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগ করিব বলিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। বিবাহ করি, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করি, তাহার পর যত শীঘ্র পারি, স্থান

পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করি।—জীবনে আর ক
সে পথে চলি না।"

এই সময় বালিকার পিতা আসিয়া অসীমের হস্তধারণ করিলেন। অসীম ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের কথায় এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পান নাই। বালিকার পিতাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চহাস্যে দীর্ঘিকা-তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল, "বন্ধু, তোমার উদ্বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত, ঘাতক নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, বিলম্বেনালম্।" বালিকার পিতা কহিলেন, "বাবা, শৈল আমার একমাত্র সন্তান। তুমি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমাকে অদেয় যে আমার কিছুই নাই। আমি নিতান্ত দরিদ্র, সামর্থ্যহীন। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে পদার্পণ কর, তাহা হইলে চরিতার্থ হই।" ব্রাহ্মণ এই সময় বলিয়া উঠিল, "যাইবে বৈ কি, অবশ্য যাইবে; নিয়তির আকর্ষণ কে রোধ করিতে পারে? একবার, দুইবার, বিশবার যাইবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার গৃহে পদার্পণ করিবে, সে মুহূর্ত্ত উহার হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।" "পাগলা ঠাকুর, অত কথা কি বলিতেছ? দেখ বাবা, পাগলা ঠাকুর মূর্খ নয়, মানুষও ভাল,—দোষের মধ্যে মাথাটী খারাপ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর, দুটা-একটা ভাল কথা বল দেখি! বেশী সংস্কৃত বলিও না, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব না। আজ বাবার কল্যাণে শৈলরাণীর বড় ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে।" "অতি উত্তম কথা, আশীর্ব্বাদ

হইয়া তোমার কন্যা চির-জীবিনী হইয়া আজীবন খাণ্ডব-দাহন করিতে থাকুক।" "ও আবার কি রকম কথা—দাদাঠাকুর! দাহন মানে ত পোড়ান, সে কি ভাল কথা?" "সকল সময় মন্দ নয়।" "বাবা, ও পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে কথায় পারা যায় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা উঠিয়াছেন, এখন তুমি একবারও এস। পাগল ঠাকুর কি আমার ঘরে একবার পায়ের ধূলা দিবে না কি?" "কায়স্থের ঘরে পায়ের ধূলা দিতে আপত্তি নাই, যদি মূল্য পাওয়া যায়।" "দিব ঠাকুর, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, নগদ একটাকা প্রণামী দিব।" "তোমার প্রণামী উপযুক্ত মূল্য নহে।" "আর কোথায় কি পাইব ঠাকুর! আমাদের কি আর সেকাল আছে?" "আর এক কাজ করিতে পার. গ্রামে কি কুলীন-ব্রাহ্মণের কন্যা নাই?" "থাকিবে না কেন, অনেক—দাদাঠাকুর! যত চাও। তুমি কি কুলীন না কি?" "ফুলের মুখুটী, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।" "ঠিক হইয়াছে! যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কাল সন্ধ্যাকালে আমার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বড়ই দুঃখ করিতেছিল। দেখ, বাবার কল্যাণে যদি তাহার কন্যাদায় উদ্ধার হইয়া যায়।"

ব্রাহ্মণ আনন্দে লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিল "চল, চল, বিলম্বেনালম্।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজমিত্র

অতি প্রত্যূষে একজন হরকরা আসিয়া ভাগীরথী-তীরে একটী ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিল। স্কন্ধাবার নীরব; দুই একজন ব্যতীত তখনও সকলেই নিদ্রিত। সেই বস্ত্রাবাসে তিনজন মনুষ্য আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া নিদ্রা যইতেছিল। হরকরা তাহাদিগের মধ্যে একজনকে জাগাইয়া তুলিল এবং ইঙ্গিত করিয়া বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিল। সুপ্তোত্থিত অতি সন্তর্পণে বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিয়া হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" হরকরা অভিবাদন করিয়া কহিল, "শাহ্‌জাদা তলব করিয়াছেন।" "ইহার মধ্যেই যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল?" "আজ অতি প্রত্যূষেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি গোসলখানায় আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" "সেখানে আর কে কে আছেন?" "আর কেহই না।" "তবে কি শাহ্‌জাদা আমাকে একা তলব করিয়াছেন?" "হাঁ জনাব, তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি একা গোষলখানায় যাইতেছেন, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

উভয়ে স্কন্ধাবারের বাহির দিয়া সুতীগ্রাম বেষ্টন করিয়া সম্রাট-পৌত্রের পট্টাবাসে প্রবেশ করিলেন। গোষলখানার তাম্বুর বহির্দ্দেশে ফরুকথসিয়র্‌ একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট

ছিলেন। তিনি আগন্তুককে দেখিয়া বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক তাঁহার অনুসরণ করিলে হরকরা পট্টাবাসের দ্বার বাঁধিয়া দিল। গোষলখানার তাম্বুর ভিতর ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি কাষ্ঠাসন ছিল। শাহ্‌জাদা তাহার একখানিতে উপবেশন করিয়া আগন্তুককে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আগন্তুক বসিলে ফর্‌রুখ্‌সিয়র্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কেন ডাকিয়াছি জান?"

আগন্তুক কহিলেন, "না।" "সংবাদ নিতান্ত শুভ নহে, বাদ্‌শাহের আসন্নকাল উপস্থিত। পিতা আমাকে লাহোরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" "উত্তম কথা, আপনার পিতা যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে হিন্দুস্থানে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে সংবাদ অশুভ বলিতেছেন কেন?" "দেখ রায়জী, হিন্দুস্থানের সিংহাসনে কবে কে বসিবে, এ কথা সমস্ত সিংহাসনের যিনি মালিক, তিনি ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।" "কেন? শুনিয়াছি আপনার পিতা বাদ্‌শাহের প্রিয়পুত্র।" "দারাশেকোর নাম শুনিয়াছ? দারা অপেক্ষা শাহ্‌জহানের আর কে প্রিয়তম ছিল; কিন্তু দেখ, ভাগ্যচক্রের বিপর্য্যয়ে ময়ুর-সিংহাসনের পাদপীঠে দারার ছিন্ন-মুণ্ডই লুণ্ঠিত হইয়াছিল। আওরঙ্গ্‌জেব্‌ বাদ্‌শাহের বৃদ্ধ বয়সে উদীপুরী বেগমের পুত্রই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিল; কিন্তু সেই কামবখ্‌শ্‌কে ময়ুর-সিংহাসনের গণ্ডীর মধ্যেও আসিতে হয় নাই, সুতরাং শাহ্‌আলম্‌ বাদ্‌শাহের প্রিয়পুত্র যে তাঁহার মৃত্যুর

পরে পিতৃ-সিংহাসনলাভ করিবেন, এ কথা কে বলিতে পারে?” “সত্য কথা শাহ্‌জাদা!” “দেখ রায়জী, বিপদে পড়িয়া পথ হারাইয়া তোমাদের আশ্রয় পাইয়াছিলাম; সেইজন্য এই নূতন বিপদের সংবাদ পাইয়া তোমাকেই ডাকিয়াছি।” “আপনার কি বিপদ হইতে পারে শাহ্‌জাদা? আপনার পিতার ন্যায় লোকবল, অর্থবল বা বুদ্ধিবল বাদ্‌শাহের অন্য কোন পুত্রেরই নাই। আমি ত আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কাই দেখিতে পাইতেছি না!” “রায়জী, শাহ্‌জহান্ বাদ্‌শাহের প্রিয়পুত্র দারাশেকোর অর্থবল, লোকবল বা বুদ্ধিবল কোন বলেরই অভাব ছিল না; তবে তাহার ছিন্নমস্তক কনিষ্ঠ ভ্রাতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়াছিল কেন?” “তাহা ত বলিতে পারি না।” “কেন জান, এই বিশাল হিন্দুস্থানে দারাশেকোর একজনও প্রকৃত বন্ধু ছিল না।” “সে কি কথা?” “দেখ রায়জী, রাজবংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের ন্যায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর নাই। ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রস্নেহ, পত্নীপ্রীতি, বন্ধুবাৎসল্য বা ভক্তি, তাহারা কখনও লাভ করে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই স্বার্থের জন্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। যতদিন ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার অঙ্কশায়িনী থাকেন, ততদিন তাহার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয় না; কিন্তু লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা হন, তখন শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মত সকলেই ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়ে।” “সমস্তই অদৃষ্ট শাহ্‌জাদা! আমরা হিন্দু, ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকে বলে যে, কোন

ঘটনাই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নাই। আমি যে এইখানে বসিয়া আপনার সহিত কথা কহিতেছি, ইহাও বিধিলিপি।”

“রায়জী, মুসলমান হইলেও আমরা এ দেশে আসিয়া কতকটা তোমাদের মত হইয়া গিয়াছি। আমরাও এ কথা বিশ্বাস করি। সেইজন্য চোগ্‌তাই বংশের কেহ জ্যোতিষীর পরামর্শ ব্যতীত পথ চলে না; কিন্তু দেখ সমুদ্রে জাহাজ ডুবিয়া যে মানুষ জলে পড়ে, সে জানিতে পারে যে তাহার আর নিস্তার নাই, তথাপি সে যথাসম্ভব আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এবং যতক্ষণ তাহার চেতনা থাকে, ততক্ষণ সে জলের কবরের বাহিরে থাকিতে চেষ্টা করে; আমিও আত্মরক্ষার চেষ্টায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।”

“আদেশ করুন।” “দেখ রায়জী, তোমাদের দুই ভ্রাতার সহিত প্রথম যেদিন সাক্ষাৎ হয়, সেদিন তোমরা জানিতে না যে আমি কে।—তোমরা অর্থ বা সম্মানের লোভে আমার সাহায্য কর নাই। সেইজন্য আমার ভরসা হয় যে আমার দুর্দ্দিনে অর্থ বা সম্মানের লোভে অন্ততঃ তোমরা দুইজন বিশ্বাসের হন্তারক হইবে না। দেখ, জ্ঞানোন্মেষ অবধি চোগ্‌তাই বংশীয় পুরুষগণ মানুষ চিনিতে শিক্ষা করে। আমি তোমাদিগকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম। আমার পরিচয় পাইয়াও তোমরা আমার নিকট থাকিতে স্বীকৃত হও নাই। আজ পর্য্যন্ত এক হিন্দু বনিয়ার অর্থ ব্যতীত তোমরা কেহ আমার নিকট কিছুই চাহ নাই। আমি আহ্‌মদবেগের নিকট শুনিয়াছি যে,

তোমাদিগের ব্যয় তোমরাই নির্ব্বাহ করিয়া থাক। দেখ রায়জী, এই উর্দ্দূতে তোমার ন্যায় নিঃস্বার্থ নির্লোভ বন্ধু আমার আর কেহ নাই। তোমাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি, কারণ, এখনও পর্য্যন্ত তোমরা বাদ্‌শাহের অথবা সুবাদারের ভৃত্য নহ। তুমি আমার বন্ধুত্বের উপহার গ্রহণ করিবে কি?"

"এ কি আদেশ করিতেছেন শাহ্‌জাদা? আপনি শাহ্‌জাদা আজীম উশ্‌-শানের পুত্র, বাদ্‌শাহের পৌত্র। বাদ্‌শাহের দেহান্তের পরে আপনার পিতাই যে ময়ূরসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ আমীর—ওম্‌রাহ আপনার কৃপা-কটাক্ষ লাভের জন্য লালায়িত, আপনার বন্ধুত্ব—"

"রায়জী, তাহা আমি জানি; সেইজন্যই তোমাকে বলিতেছিলাম যে, সে বন্ধুত্ব আমার পদের সহিত, আমার সৌভাগ্যের সহিত, আজীম উশ্‌-শানের পুত্রের সহিত, বাদ্‌শাহের পৌত্রের সহিত; কিন্তু এক মস্তক, দুই হস্ত ও দুই পদবিশিষ্ট ফর্‌রুখ্‌সিয়রের সহিত নহে। যদি এমন হয় যে, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজীম উশ্‌-শান সিংহাসন লাভ না করেন, তখন আমার এই সহস্র সহস্র বন্ধুর মধ্যে কয়জন আমার প্রকৃত বন্ধু থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না। দেখ রায়জী, আমার পিতা বাদ্‌শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন, আমিও আমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহি। চোগ্‌তাই বংশের কনিষ্ঠ পুত্রের অবস্থা কি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেইজন্য ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া অনেক আশা

করিয়া বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিতেছি। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে কি?" "শাহ্‌জাদা, আমি দরিদ্র, অনাথ, গৃহশূন্য। জগতে আমাদের দুইজনের আপনার বলিতে বড় কেহ নাই। আপনাকে অদেয় আমার কি থাকিতে পারে? আপনি শাহ্‌জাদা বলিয়া বলিতেছি না, সম্রাটের পৌত্র বলিয়া বলিতেছি না। যে ব্যক্তি পথের ভিখারীকে ভিখারী জানিয়াও বুকে তুলিয়া লয়, তাহাকে ভিখারীর অদেয় কি থাকিতে পারে? সে ভিখারী যদি আশ্রয়দাতার কোন অনুরোধ প্রত্যাহার করে, তাহা হইলে কালসর্প ব্যতীত তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ জগতে আর নাই।" "রায়জী, জগতে মানুষ মাত্রেই কালসর্প, কৃতজ্ঞতা অতি বিরল। দেখ, আমি স্বার্থপর। তোমার ন্যায় নিঃস্বার্থ বা উদারচেতা নহি। স্বার্থের জন্যই তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি যে আমার দুর্দিনে তোমার মত বন্ধু পাইলে বিশ্বাসঘাতকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব।" "শাহ্‌জাদা, আমি দরিদ্র, সামর্থ্যহীন বটে; কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাদিগের বংশে এখনও পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাসঘাতক হয় নাই এবং আমার দেহে যতক্ষণ শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ আপনার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিতে দিব না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্বাহ

ভাগীরথীতীরে সেই দীর্ঘিকার অতি দূরে এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে আজি মহাসমারোহ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আজি তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে সম্পন্ন-গৃহস্থ বলিলে যাহা বুঝায়, ব্রাহ্মণের সে সমস্তই ছিল। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পিতা রামনাথ রাজ-দরবারে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কুলীন এবং কুলীনের কুল কন্যাগত; সেই জন্যই অর্থ এবং সামর্থ্যের অভাব না থাকিলেও তিনি একমাত্র কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে বংশে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন, সে বংশজাত পাত্র পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই ছিল না এবং পূর্ব্ববঙ্গে অতি বিরল; সেই জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াও বিশ্বনাথ কন্যার পাত্রের সন্ধান পান নাই।

বিধিলিপির রহস্য ভেদ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশ্বনাথ দশ বৎসর যাবৎ যে বংশজাত পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আজি সেই বংশজাত এক কুলীন সন্তান বিবাহার্থী হইয়া বিশ্বনাথের দ্বারে উপস্থিত। বিধাতা যখন সুপ্রসন্ন হন, তখন মানুষ যাহা চাহে, তাহাই তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেদিন পাত্রের দর্শন মিলিল, সেই দিনই শুভ দিন ছিল এবং তাহার পরের দিনও বিবাহের পক্ষে

অতীব শুভ। কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্বনাথ কন্যার বিবাহের আয়োজন করিলেন। চঞ্চলা কমলা কিছুদিনের জন্য চক্রবর্ত্তী-কুলের ভাণ্ডারে আসিয়া অধিষ্ঠীতা হইয়াছিলেন সুতরাং বিশ্বনাথের অর্থাভাব ছিল না। পাত্র যে পরিমাণ অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহার দশ গুণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি তাঁহার পরদিনই কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজি বিশ্বনাথের কন্যার বিবাহ।

সমস্ত দিন উৎসব-বাদ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম মুখরিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে আলোকমালা-মণ্ডিত সভা-মণ্ডপে গ্রামের ভদ্র অধিবাসীগণ সমবেত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। পাত্র সভা-মণ্ডপে সুখ-শয্যায় উপবিষ্ট শুভলগ্ন আগতপ্রায়, এই সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর হইতে কয়েকটি মহিলা বাতায়নপথে পাত্র দেখিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই বর্ষীয়সী এবং বিশ্বনাথের আত্মীয়া। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কহিলেন, "কে বলিল বর বুড়া!" দ্বিতীয়া কহিলেন, "কোথায় বুড়া? হরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পিসীর ঘাটের মড়ার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বরকে ধরিয়া আসনে বসান হইয়াছিল এবং শুভদৃষ্টির সময় তিন জনে তাকে ধরিয়াছিল। বিবাহের পর একটি মাসও কাটে নাই।" তৃতীয়া কহিলেন, "সে যাই বল দিদি, বর যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহাকে বুড়া দেখাইতেছিল, এখন সাজিয়া-গুজিয়া মানুষের মত দেখাইতেছে। আমাদের সতী রূপেও যেমন, গুণেও তেমন।

তোমরা যাহাই বল, সতীর যোগ্য বর হয় নাই।” প্রথমা রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তোদের কেমন কথা লা! কুলীনের মেয়ে কবে আবার ইহা অপেক্ষা যোগ্য পাত্রে পড়িয়া থাকে? কুলীনের পাত্র কি রূপ দেখিয়া পছন্দ হয়? তোরা যে নূতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলি! সতী আমার কুলীনের মেয়ে, কুলীন-কন্যার অদৃষ্টে সচরাচর যেমন পাত্র জুটিয়া থাকে, তাহার তুলনায় সতীর বর অতি সুপাত্র।” দ্বিতীয়া অতি ধীরে ধীরে কহিলেন, “দেখ দিদি, যদু নাপিত বলিতেছিল যে ওপারে সুতীগাঁয়ে তাহার বেহাইয়ের বাড়ী। সে নাকি কাল বেহাই বাড়ী গিয়াছিল এবং শুনিয়া আসিয়াছে যে, বর নাকি সুতীগাঁয়ে তিন দিন ছিল। সে নাকি কাহারও বাড়ী অতিথি হয় নাই, পথে-পথে ভিক্ষা করিত এবং শ্মশানে এক গাছতলায় বাস করিত।” প্রথমা কহিলেন, “সে আবার কি কথা, বর কুলীন, বিবাহ করা কুলীনের পেশা। বিশ্বনাথ দাদার মুখে শুনিলাম যে, বর ছয়কুড়ি টাকা পণ চাহিয়াছিল, তিনি তাহার দশগুণ দিতে স্বীকৃত হইয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ফকীর সন্ন্যাসীতেই ত ভিক্ষা করিয়া থাকে!—শ্মশানে বাস করে। যে বর পণের টাকার কথা ভোলে না, সে আবার কি রকম সন্ন্যাসী। ওসকল কথার-কথা। বিবাহের সময় কত কথাই না উঠে।”

যথাসময়ে গ্রামবৃদ্ধগণের অনুমতি লইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণ ভূরি-ভোজনে

পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। কুলাঙ্গনাগণ বরবধূ লইয়া বাসর-গৃহে উৎসবমগ্না হইলেন। রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে পরিহাসস্পৃহানিবৃত্তা অনেক রমণী নিদ্রালসনেত্রে গৃহে প্রস্থান করিলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারাও একে একে বাসর-গৃহে শয্যা-গ্রহণ করিলেন। সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া বর কন্যার অঙ্গস্পর্শ করিল। স্পর্শ মাত্রেই সতীর তন্দ্রা দূর হইল। বর তাহাকে কহিল, "আমার সহিত উঠিয়া আইস।" বধূ বাক্যব্যয় না করিয়া পতির অনুসরণ করিল। গৃহের অঙ্গনে আসিয়া বর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" কম্পিতকণ্ঠে নববধূ কহিল, "আমার নাম সতী।" তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বর কহিল, "মিথ্যা কথা স্ত্রীলোক সতী, অসম্ভব! তুই নিশ্চয়ই অসতী।" ক্ষীণকণ্ঠে বধূ কহিল, "না।" তাহার উত্তর শুনিয়া বর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নববধূ শিহরিল। বর কহিল, "তোকে কেন বিবাহ করিয়াছি জানিস্!" বধূ ক্ষীণতর কণ্ঠে কহিল, "না, কেমন করিয়া জানিব?" বর আবার হাসিয়া কহিল, "প্রতিহিংসার জন্য।" ভীতা চকিতা নববধূ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের প্রতি-হিংসা?" "প্রতিহিংসা, আমার সর্ব্বনাশের! প্রথম যৌবনে একদিন তোর মত এক অসতীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তখন আমার সব ছিল। রূপ ছিল, গুণ ছিল, বিষয়—বৈভব ছিল, আত্মীয়-স্বজন ছিল,—দেশে আমি দশের মধ্যে একজন ছিলাম। প্রথম যৌবনের সমস্ত আকুলতা দিয়া তাহাকে হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। তখন তাহাকে দেবী মনে করিতাম; দেবী ভাবিয়া যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তাহার কুহকে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন বড় সুখে ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম সারাটা জীবন বুঝি এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে, জীবন বুঝি সুখশয্যা,—কণ্টকময় বন্ধুর পথ নহে! সে যে ডাকিনী, কাল-সাপিনী, তাহা ত বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি। আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার হৃদয়ের পূজা সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সে কি করিয়াছিল জানিস্? সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব আর একজনকে সমর্পণ করিয়াছিল। সে যখন হাসিয়া আমার সহিত কথা কহিত, তখন মনে মনে আমার মৃত্যু কামনা করিত। আমার প্রথম যৌবনের ভরা হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঢালিয়া দিয়া আমি যখন তাহাকে ধ্যান করিতাম, তখন সে অন্য মনে তাহার চিন্তা করিত। প্রথমে অন্ধ ছিলাম। যেদিন দৃষ্টিশক্তি ফিরিল, সেই দিন বুঝিলাম রমণী মাত্রেই দ্বিচারিণী। সেই দিন হইতে আমি ভিখারী;—রূপহীন, গুণহীন, বিত্তহীন, বন্ধুহীন। সেইদিন হইতে আমি শ্মশানবাসী, চিতাগ্নিদগ্ধঅন্নভোজী, প্রতিহিংসাকামী। প্রতিহিংসা আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। তোকে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু জীবনে আর কখনও তোর মুখ দর্শন করিব না। তুই আজীবন তুষানলে দগ্ধ হইবি, এই আমার প্রতিহিংসা।”

নববধূ কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল, সহসা সাহসে ভর করিয়া সে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার অপরাধ কি?” “তোর অপরাধ তুই রমণী। রমণী মাত্রেই অসতী, বিশ্বাসঘাতিকা।”

বধূ ক্ষীণতর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সকলেই কি সমান ?" নব বর গর্জ্জিয়া উঠিল এবং কহিল, "কালসর্পে কি প্রভেদ আছে ? রমণীতেও সেইরূপ প্রভেদ নাই ! তোর পূর্ব্বে বহু বিবাহ করিয়াছি। কেন করিয়াছি জানিস্ ? আর কেহ যাহাতে তোদের বিশ্বাস করিয়া আজীবন বিষধর-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আমার মত শ্মশানবাসী হইয়া না বেড়ায়, সেই জন্য। তোকে বিবাহ করিয়াছি, আর ত তোকে কেহ বিবাহ করিতে পারিবে না ! সকলে জানিবে তুই অসতী।" সহসা দৃঢ়কণ্ঠে ব্যথিতা নববধূ বলিয়া উঠিল, "না, আমি সতী।" ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত নব বর বধূকে পদাঘাত করিয়া শ্বশুর-গৃহ পরিত্যাগ করিল। বধূ মূর্চ্ছিতা হইল।

পরদিন প্রভাতে অঙ্গনে নববরের উত্তরীয় ও মূর্চ্ছিতা নববধূ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও বরের সন্ধান পাওয়া গেল না। নববধূকে মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কোন উত্তর পাইল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নর্ত্তকী

পাটনা সহরের এক প্রান্তে ভদ্র-পল্লীর মধ্যে এক বৃদ্ধা গণিকা বাস করিত। তাহার নাম মতিয়া। সে গণিকা হইলেও,

পল্লীর সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। কারণ, তাহার গৃহে অসদাচরণ দেখিতে পাওয়া যাইত না। যৌবনান্ত হইবার পূর্ব্বেই মতিয়া গণিকা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি মুজরা করিত। প্রায়বিগত-যৌবনা নর্ত্তকীর সমাদর বর্ত্তমান সময়ে নাই—তখনও ছিল না। মুজরা যখন জুটিত না, তখন মতিয়া গণিকা-সমাজে নৃত্যগীত শিক্ষা দিত। পাটনার অধিবাসিগণ মতিয়া বাঈজীকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সকলেই মতিয়া ওস্তাদনীকে জানিত। তাহার যৌবন একেবারে অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে, একজন পাঠান আহদী প্রৌঢ়ার প্রেমে মজিয়া, তাহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; মতিয়া ওস্তাদনী এক কন্যা প্রসব করিয়াছিল। লোকের নিকট মতিয়া পরিচয় দিত যে পাঠান তাহাকে নেকা করিয়াছে; কিন্তু পাঠানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবজ্ঞার সহিত নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া কহিত, "কস্‌বীকে নেকা? তোবা, তোবা!" তথাপি বৃদ্ধ পাঠান মতিয়াকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না।

মতিয়ার কন্যার নাম মনিয়া। মনিয়াকে দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, সে গণিকার কন্যা; সকলেই কহিত, "গোময়ে পঙ্কজিনীর আবির্ভাব সম্ভব নহে।" মতিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল; এবং সে অতি যত্নে কন্যাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিয়াছিল। প্রথম যৌবনে রূপসী কলাবতী মনিয়া পাটনা নগরের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মনিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ

করিয়াছে; এবং মাত্র এক বৎসর মুজরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে দিন ফররুখ্‌সিয়র পাটনায় আসিলেন, তাহার পরদিবস অপরাহ্ণে সেই বৃদ্ধ পাঠান মতিয়ার গৃহের দুয়ারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। মতিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা ছিল; এবং মনিয়া একটি সারেঙ্গী লইয়া গুণ-গুণ করিয়া গান করিতেছিল। এই সময়ে একজন সুসজ্জিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমান একা হইতে নামিয়া পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মনিয়া বাঈজীর গৃহ?" পাঠান বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই গৃহ মতিয়া বাঈজীর; তবে মনিয়া এখানে থাকে বটে!" আগন্তুক কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিল, "আমি মনিয়া বাঈজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" পাঠান অধিকতর বিরক্ত হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "মনিয়া তওয়াইফ্‌ বটে, কিন্তু সে ভদ্রলোকের কন্যা, কসব করে না। তোমার যদি খুব্‌রু কঞ্চনীর প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে চৌকে বহুৎ মিলিবে।" আগন্তুক কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল, "আমার অপরাধ মাফ্‌ করিবেন। শাহ্‌জাদার দরবারে মুজরা করিবার জন্য মনিয়া বাঈজীকে বায়না দিতে আসিয়াছি।" পাঠান একটু দমিল; কিন্তু তথাপি অপ্রসন্ন ভাবে কহিল, "বায়না দিতে আসিয়াছ, টাকা দিয়া চলিয়া যাও।" "বাঈজীর চেহারা না দেখিয়া বায়না দিব কেমন করিয়া?" "চেহারার সহিত মুজরার সম্পর্ক কি?" "অনেক সম্পর্ক! মুজরা ত কেবল গাহিবার নহে!"

আগন্তুক সহজে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে দেখিয়া পাঠান মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "আরে মতিয়া, এ মতিয়া, ইধর আ!" মতিয়া তখন সম্মার্জ্জনী হস্তে উঠানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতেছিল। সে পাঠানের আহ্বান শুনিয়া, সেই অবস্থাতেই গৃহের দুয়ারে উপস্থিত হইল। আগন্তুক তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। মতিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা না হইয়া আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল ; এবং সে শাহ্‌জাদার নিকট হইতে আসিতেছে শুনিয়া, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আগন্তুক তাহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া মনিয়াকে দেখিতে চাহিল। মনিয়া আসিল, এবং নমুনা স্বরূপ একটা গান গাহিল। তখন আগন্তুক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই আস্‌রফি বায়না দিয়া চলিয়া গেল।

পাটনা সহরের প্রান্তে, এক বিস্তৃত আম্রকানন মধ্যে শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়রের উর্দ্দু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত শামীয়ানার মধ্যে নাচের আয়োজন হইয়াছে। তখন মনিয়া বাঈয়ের মরসুম পড়িয়াছে। শাহ্‌জাদার সঙ্গের লোক ত আসিয়াছে,—পাটনা সহরের অর্দ্ধেক লোকও সেই আম্রকাননে সমবেত হইয়াছে। সন্ধ্যা হইল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল। শামীয়ানার নিম্নেও অসংখ্য বহুবর্ণের কাচপাত্রে গন্ধদীপ জলিতে লাগিল। মনিয়া, তাহার মাতা মতিয়া, তবলচী ও সারেঙ্গীওয়ালা সঙ্গে লইয়া গো-শকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়র আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলে,

মনিয়া পেশোয়াজ পরিয়া আসরে নামিল। একপ্রহর ধরিয়া শিবিরের লোক, সহরের লোক মনিয়ার নৃত্য-গীতে চক্ষু ও কর্ণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়র অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও, মুষ্টি-মুষ্টি সুবর্ণ পুরস্কার দিয়া মনিয়ার মাতাকে তুষ্ট করিয়া, আসর পরিত্যাগ করিলেন। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। সহরের লোক উর্দ্দু ছাড়িয়া সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল; এবং শিবিরের লোক শিবির ছাড়িয়া নিজ নিজ তাম্বুতে ফিরিয়া গেল। মনিয়া অন্য তাম্বু হইতে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, এমন সময়ে একজন দীর্ঘাকার মুসলমান তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনিয়ার মাতা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, সে আগন্তুককে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু আগন্তুকের ইঙ্গিতে পশ্চাৎ হইতে একজন সৈনিক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভীতা, চকিতা মনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মনিয়া বাঈ, তুমি পাটনা সহরের গুলাব। তুমি যে আমাদের উর্দ্দুতে আসিয়া অমনি চলিয়া যাইবে, ইহা কি আমার প্রাণে সহে? আমি সামান্য ব্যক্তি,—তবে আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, তোমার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গুলাবের মত অঙ্গের জন্য গুলাবের শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছি। তোমার নীল নয়ন দুটি তোমার গুলাব-বর্ণ দেহে মানাইতেছে না বলিয়া তাহা রক্তাভ করিবার জন্য ইরানী আরক আনিয়া রাখিয়াছি;

সুন্দরী! তোমার জন্য যে তাম্বু সাজাইয়া রাখিয়াছি, তাহাতে একবার পদার্পণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে চল।"

মনিয়া যদি গণিকা হইত, তাহা হইলে এই চিরন্তন প্রেম-সম্ভাষণে সে হাসিয়া ফেলিত; কিন্তু গণিকা-পুত্রী হইলেও, তাহার সুন্দর দেহ তখনও কলুষিত হয় নাই, সুতরাং সেনা হাসিয়া, ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। আগন্তুক তখন তাহার রূপরাশির উত্তেজনায় উন্মত্ত, সে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া মনিয়ার হস্তধারণ করিল। মনিয়া তাহাতে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক কহিল, "মনিয়া, তুমি স্বর্গের পরী, তুমি দুনিয়ায় কেন আসিয়াছ? এই কঠিন দুনিয়ার স্পর্শে তোমার কোমল চরণে যে আঘাত লাগিবে! তুমি এই কঠিন দুনিয়ায় পদক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতেছি।" আগন্তুক এই বলিয়া মনিয়াকে ক্রোড়ে উঠাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া গেল। তাহা দেখিয়া হতাশাবিজড়িত কণ্ঠে আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "জানি, তুমি ভয় পাইতেছ জানি? আমি যে তোমার গোলাম জানি! তুমি যখন তোমার স্বর্গীয় রূপরাশি লইয়া শামীয়ানার নীচে পরীরাজ্যের অদ্ভুত নৃত্যকৌশল দেখাইতেছিলে—যখন গুলাবের পল্লবের মত কোমল তোমার পদাঙ্গুলিগুলি সতরঞ্চের উপর বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়াইতে-ছিল,—তখন আমার মন ভ্রমর হইয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিল। জানি, আমার ছাতি অনেক তলোয়ারের চোট খাইয়া পাথর হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য বোধ হয় তুমি সে ছাতি স্পর্শ করিতে ভয় পাইতেছ। ভয় কি জানি? আমি রাশিরাশি গুলাব আনিয়া তোমার পথে ছড়াইয়া দিতেছি।"

মনিয়া এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার সাহসে ভর করিয়া কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি মেহেরবান, আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি কস্‌বী নহি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।" সুরাবিজড়িত কণ্ঠে আগন্তুক কহিল, "তুমি কস্‌বী, কোন্ শয়তান এমন কথা বলে? তুমি পরী। জানি, তুমি যে আমার কলিজা, জান্ থাকিতে কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব জানি? অমন কথা বলিও না জানি! চল, আমি তোমাকে লইয়া যাই।" এই বলিয়া সে মনিয়ার দিকে অগ্রসর হইল, এবং উভয় হস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। মনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন বজ্রবৎ দৃঢ়মুষ্টিতে আগন্তুকের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া মনিয়াকে পরিত্যাগ করিল। মনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। নবাগত আগন্তুকের গ্রীবা পরিত্যাগ করিলে, সে মুক্ত তরবারী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নবাগত অনায়াসে তাহার তরবারী ছিনাইয়া লইয়া কহিলেন, "আফ্‌রাসিয়ব খাঁ, তোমার অত্যাচারে শাহ্‌জাদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তুমি এখন হইতে সপ্তাহকাল মজলিসে আসিতে পাইবে না।" শাহ্‌জাদার নাম শুনিয়া আফ্‌রাসিয়ব খাঁর মত্ততা

দূর হইল। সে বেত্রাহত কুক্কুরের মত সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক হৃতচেতন মনিয়ার দেহ উঠাইয়া লইয়া শিবিরান্তরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকিনী

অতি প্রত্যূষে পাটনার দুর্গের নিম্নে ভাগীরথীতীরে সিক্ত সৈকতে বসিয়া সুদর্শন আপন মনে ভৈরবী ভাঁজিতেছিলেন; এমন সময় দূর হইতে তাঁহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু উত্তর দিলেন না। যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে অন্ধ; কিন্তু সে স্বরের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিল। স্বর থামিয়া গেলে, সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল; এবং ডাকিল, "দাদা, ও বড়দাদা! এই যে ছিলে, আবার কোথায় গেলে?" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "যমের বাড়ী! তোদের জালায় আমার যমালয়ে গিয়াও নিষ্কৃতি নাই। শেষ রাত্রিতে পলাইয়া আসিয়া একটু আলাপ করিতেছি অমনি আসিয়া জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছিস্? আচ্ছা, তোকে কে বলিল যে, আমি গঙ্গার ধারে আসিয়াছি? লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার!" অন্ধ হাসিয়া কহিল, "আমি যে তোমার স্বর ধরিয়া এতদূর

চলিয়া আসিলাম। তুমি যখন আলাপ আরম্ভ কর, তখন কি লোকের বুঝিতে বাকী থাকে যে, তুমি কোথায় আছ?" "ওরে হনুমান, এ পাটনা সহরে দশ হাজার লোক এ ভৈরবী আলাপ করিতে পারে! তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, এই কেল্লার পাশে, গঙ্গার ধারে বসিয়া, সুদর্শন ভট্টাচার্য্যই ভৈরবী আলাপ করিতেছে?" অন্ধ অধিকতর উচ্চ-হাস্য করিয়া কহিল, "সেটা বড় কঠিন কথা সুদর্শন দাদা? পাটনা সহরে যত হাজার কলাবৎই থাক্, আমার সুদর্শন দাদার গলার মত গলা একজনেরও নাই।"

ব্রাহ্মণ প্রশংসা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া হাসিয়া ফেলিলেন; এবং অন্ধের দিকে অগ্রসর হইয়া, হাসিয়া কহিলেন, "যা বলিয়াছিস্ ভাই! এদেশের লোকের আওয়াজ মিঠা নহে। দেখ্ ভূপেন, অনেকদিন তুই সঙ্গৎ করিস্ নাই,—একটু বসিবি?" "এখন বসিবার সময় নহে দাদা, তুমি শীঘ্র এস।" "কেন রে! তুই একটা আস্ত হনুমান।" "হনুমানই হই আর যাই হই, তুমি এখন শীঘ্র এস। মেজদাদা কোথা হইতে একটা স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছে; এবং তাহাকে আনিয়া অবধি তোমার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে।" "সে কি রে, অসীম কি বিবাহ করিয়া আসিল না কি! মেয়েমানুষ আনিল কোথা হইতে?" "না, তা কেন, এ যে বাঈজী! বোধ হয় কাল যে শাহ্‌জাদার মজলিসে মুজরা করিতে আসিয়াছিল সে-ই; কিন্তু আমি ত চোখে দেখতে পাই না; আর সে-ও আসিয়া অবধি মুখ খোলে নাই।" "সে যাগী

কোথায়?" "আমার তাম্বুতে।" "আর অসীম?" "আমার তাম্বুর বাহিরে।" "ভাল কথা, চল্ যাইতেছি। হাঁ রে ভূপেন, অসীম বাঙ্গালীটাকে তাম্বুতে আনিল কেন?" "তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব দাদা?" "বলি, খুস্-খুস্, ফিস্-ফিস্ কিছু শুনিতে পাইলি?" "সে আবার কি?" "তুই একটা আস্ত বাঁদর। বলি, প্রেমে পড়িলে নায়ক-নায়িকা যেমন অস্পষ্টস্বরে কথা কয়, অথচ অত্যন্ত অধিক কথা কয়, সে-সব কিছু শুনিতে পাইয়াছিস্?" "প্রেমে পড়িলে নায়ক-নায়িকা বুঝি অস্পষ্ট স্বরে কথা কয়? তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব! বলি, বড়দাদা, তুমি কি তবে বৌদিদিকে ভালবাস না?" "ভাল জ্বালা! ইহার মধ্যে বৌদিদিকে টানিয়া আনিলি কেন?" "তুমি ত বৌদিদির সঙ্গে ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহ না? তোমরা যখন আলাপ কর, তখন গ্রামের লোকে বুঝিতে পারে যে সুদর্শন দাদা বৌদিদির সহিত কথা কহিতেছে।" "ওরে হনুমান, মানুষ যখন প্রথম প্রেমে পড়ে, তখন ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহে। তোকে সে কথা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব?" "কই, তোমাকে ত কখনও বৌদিদির সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহিতে শুনি নাই?" "ওরে বাঁদর, আমি এই বিশ বৎসরের মধ্যে প্রেমে পড়িয়াছি মোট একবার!" "কবে?" "যেদিন তোর বৌদিদি নিজ হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন।" "বটে, এত বড় কথা! আমি আজই বৌদিদিকে বলিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ একেবারে জল হইয়া গেল; এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিল, "লক্ষী দাদাটি আমার, এমন কাজ করিও না। এমনিতেই মাগীর গলার আওয়াজে বাড়ীতে কাক-চিল বসিতে পায় না,—তাহার উপর আবার যদি এ কথা শোনে, তাহা হইলে, চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবে। তুমি এমন কাজ করিও না ভাই! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" "ভাল কথা, এমন গোস্তাকী কিন্তু বারদিগর করিও না। তুমি শীঘ্র চল, দাদা তোমার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।" উভয়ে ভাগীরথীতীর পরিত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দ্রুতপদে শাহ্‌জাদার শিবিরের দিকে চলিলেন। শিবির দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শাহ্‌জাদার প্রকাণ্ড বিচিত্র বস্ত্রাবাস এবং তাহার চারিদিকে মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্যগণের তাম্বু। দ্বিতীয় ভাগ আয়তনে বৃহৎ ও উহা হিন্দু সৈনিকগণের আবাসে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগের এক কোণে গঙ্গাতীরে দুইটি প্রকাণ্ড তাম্বু। তাহার একটির বহির্দ্দেশে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া, এক ব্যক্তি আল্‌বোলায় ধূমপান করিতেছিল। ভূপেন দূর হইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "নবকৃষ্ণ, বড়দাদা আসিয়াছেন।" নবকৃষ্ণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, আল্‌বোলার নল ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং সুদর্শনকে কহিল, "এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আসিতে আজ্ঞা হয়। এইমাত্র একজন খাওয়াস্ আসিয়া হুজুরকে তলব করিয়া লইয়া গেল।" সুদর্শন ব্যগ্র হইয়া তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি নব, সে ছুঁড়ীটা কোথায় গেল?" নবকৃষ্ণ হাস্যের প্রবল বেগ অতি কষ্টে দমন করিয়া কহিল,- "কোন্ ছুঁড়ীটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়?" সুদর্শন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বখ্‌রা পাইয়াছিস্ বুঝি?" নবকৃষ্ণ দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া দ্বিতীয়বার হাস্য গোপন করিল; এবং অতি ধীরে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি পরগণে কৃকণপুরের বন্দোবস্তের কথা রূপকচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছেন?" ভূপেন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অম্বরী তামাকের গন্ধ আসিতেছে কোথা হইতে?" সুদর্শন পাছে ভূপেনকে বলিয়া দেয় যে, নবকৃষ্ণ চন্দনকাষ্ঠের চৌকীর উপরে বসিয়া সোণার আল্‌বোলায় ঢাকাই রাণার সট্‌কায় ধূমপান করিতেছিল, সেইজন্য সে অতি কাতর ভাবে বাক্যহীন বিনয়ে সুদর্শনকে তুষ্ট করিতেছিল। সুদর্শন কিন্তু সহজে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তিনি ভ্রূর ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না মিলিলে, সুবর্ণের মুখনল হইতে ধূমোদ্গীরণের কারণ ব্যক্ত হইয়া যাইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নবকৃষ্ণ অনুচ্চারিত ভাষায় কহিল, "তাম্বুর ভিতরে।" ভূপেন উত্তর না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়দাদা, দেখ না অম্বরী তামাকের গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?" নবকৃষ্ণ ফাঁপরে পড়িল। সুদর্শনও উত্তর না পাইয়া দীর্ঘ রুক্ষ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে চক্রীর চক্রে নবকৃষ্ণ বাঁচিয়া গেল।

নিকটের বস্ত্রাবাসে একটা বহুমূল্য রেশমের পর্দা সরিয়া গেল। নূপুর-বলয়-নিক্কণে নীরব বনস্থলী মুখর হইয়া উঠিল। কোমলাঙ্গের আবরণ ইতস্ততঃ ঘর্ষণে যে শব্দ হইয়া থাকে, তাহা জানাইয়া দিল যে, একটা বহুমূল্য পেশোয়াজ দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "বাবু সাহেব!" প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘ তৈলহীন কেশরাশির মধ্যে বহিয়া গেল। নবকৃষ্ণ আভূমি নত হইয়া একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া ফেলিল। ভূপেন কিছু দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

রমণী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে উচ্চতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কাঁহা গয়েঁ?" নবকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "জী, হুজুর,—তোবা, তোবা, রাধে কৃষ্ণ! বিবি-সাহেব, কেয়া হুকুম ফরমাইয়ে?" ভূপেন্দ্র রমণীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছু আবশ্যক আছে বাঈজী?" "না, সাহেব, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, সাহেব কোন্ দিকে গেলেন?" সাহেব সম্বোধনে ভূপেন শিহরিল। নবকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া ভূপেন বলিয়া উঠিল, "দাদার দরবারে তলব হইয়াছে; বোধ হয়, আসিতে বিলম্ব হইবে। আপনার যদি কিছু আবশ্যক থাকে বলুন।" রমণীর মুখে ক্ষীণ তড়িল্লেখার ন্যায় ঈষদ্ধাস্যের রেখা গোলাপবর্ণ ওষ্ঠে মিলাইয়া গেল; ঈষদভিমানে ওষ্ঠদ্বয়

কম্পিত হইল। রমণী কহিল, "নেহি সাহেব, আপ্‌লোগ্‌কো বহুত শুক্‌রী আদা কর্‌তা হুঁ, মেরি কুছ্‌ ভি জরুরৎ নেহি।"

বস্ত্রাবাসের ঘন যবনিকা পড়িয়া গেল। কোমলাঙ্গে লাগিয়া বহুমূল্য বস্ত্রের পেশোয়াজ মৃদু শব্দ করিল। হেনার ক্ষীণ গন্ধ গঙ্গাবারিকণাসিক্ত ঈষৎ পবন বহুদূর বহিয়া লইয়া গেল। সুদর্শন ভট্টাচার্য্য সহসা ভূ-পৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল এবং ললাটে করাঘাত করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ!" ভূপেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল। রমণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। এখন সুদর্শনের কাতরোক্তি শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, কি কর! মেজদাদা তেমন লোক নহেন।" নবকৃষ্ণ এই অবসরে সট্‌কা ও আল্‌বোলা লইয়া দ্বিতীয় তাম্বুতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে রৌদ্র উঠিল। সুদর্শন ভূপেনকে ডাকিয়া তাঁহার পার্শে শিশিরসিক্ত শষ্পশয্যায় উপবেশন করাইলেন; এবং তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "ভূপ, ভাই, কথাটা আমার বড় সোজা ঠেকিল না। ছোট রায় নির্ব্বোধ নহে বটে, তবে কি জান—ওর নাম কি, যৌবনকাল—এই; তা না—তবে কি না, প্রথম উন্নতির মুখ—ঐ লোকে বলে, কাঁচা পয়সা আর কাঁচা বয়স—" ভূপেন্দ্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, তুমি কি পাগল হইলে না কি! অসীম রায় বেশ্যা-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইবে? যে দিন হইবে, সে দিন এই অন্ধ নয়ন দুইটা উপাড়িয়া ফেলিব।" সুদর্শন দুই-তিনবার শুষ্ককণ্ঠে বায়ু গলাধঃকরণ করিয়া অতি ধীরে

ধীরে কহিলেন, "না, তা কি জান—সে কথা বলি নাই—তবে ওর নাম কি জান, রমণী-রূপ, প্রখর খর যৌবন, প্রবল বন্যা, প্রায় একই প্রকার। তুমি ত দেখিতে পাও না ভাই—" সুদর্শনের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,—বস্ত্রাবাসের বহুমূল্য ঘন-নীল যবনিকা দ্বিতীয়বার অপসারিত হইল। দ্বিতীয়বার কুসুম পেলব অঙ্গ-স্পর্শে আবর্ত্তিত পেশোয়াজ মৃদু শব্দ করিয়া উঠিল। পবন-হিল্লোল হেনার ক্ষীণ গন্ধের সহিত সুবাসিত কেশতৈলের গন্ধের আভাস বহন করিয়া আনিল; বলয় কঙ্কণ নূপুর-শিঞ্জন নিস্তব্ধ বনস্থলী মুখরিত করিয়া তুলিল। অদূরে বৃক্ষশাখায় একটা কাক তাহার কর্কশ রবে সুপ্ত জগতের সুষুপ্তি ভঙ্গ করিতেছিল,—সে যেন ভয়ে নীরব হইল। বীণানিন্দিত কণ্ঠ হইতে দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইল, "সাহেব!" ভূপেন্দ্রের দীপ্ত ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। সে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার সাহেব এখনও ফিরেন নাই নর্ত্তকী! উতলা হইতেছ কেন? রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মধ্যে মধ্যে নায়ক নায়িকাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে।" ঘন নীল যবনিকা সহসা পড়িয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আফিমের মহিমা

আজীম্-উশ্-শানের সিংহাসন-লাভের সংবাদ যে দিন পাটনা নগরে বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহার দুই দিবস পরে নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে রাজপথের উপরে দুই বৃদ্ধ মুসলমান অস্ফুট স্বরে কথোপকথন করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ এবং দীর্ঘ যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও পঙ্গু নহে। তাহার দীর্ঘ দেহ ও অঙ্গভঙ্গি পরিচয় দিতেছিল যে, তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-ব্যবসায়ে ব্যয়িত হইয়াছে। প্রথম বৃদ্ধ দ্বিতীয়কে কহিতেছিল, "তোমাকে ত অনেকদিন ধরিয়া বলিতেছি দোস্ত, যে, তোমার আফিম ধরিবার বয়স হইয়াছে! দেখ, আফিম অতি আমীরী নেশা, অথচ খরচ অতি সামান্য। একটা নারিকেলের হুঁকা, দুই হাত বাঁশের নল এবং কিঞ্চিৎ আফিম হইলেই চলিবে,—"দ্বিতীয় বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "রুস্তম দিল্ খাঁ, তুমি যে পাঠান, তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? আফিম তোমাকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে!" প্রথম বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টির সাহায্যে সিধা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; এবং দ্বিতীয়ের নাসিকার নিকটে তর্জ্জনী হেলন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে গুল্‌শের খাঁ, তুমিও বিস্মৃত হইয়াছে যে তুমিও পাঠান। কস্‌বীর প্রেমে পড়িয়া তোমার মগজটা একদম বিগড়াইয়া গিয়াছে; তাহা না হইলে

পাটনা সহরে এই প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া, তুমি আমার কাছে একটা কস্‌বীর কন্যা উদ্ধারের পরামর্শ চাহিতেছ ? আফিম ধর, আফিম ধর। পাকা না পার কাঁচা ধর।" "তুমি রাগ করিও না রুস্তম্ দিল্ খাঁ, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—বাঈজী কাল রাত্রি হইতে কিছুই আহার করে নাই।" "আরে ছিঃ, গুল্‌শের খাঁ, হাজার বার ছি! কস্‌বী, তাহার সহিত পয়সার সম্পর্ক;— সে আহার করে নাই, তাহার জন্য তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হইতেছে কেন?" "গোসা কর কেন ভাই! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল,—অনেকদিন তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছি।" "তুমি একেবারে জহান্নমে গিয়াছ! কস্‌বীর কন্যা কস্‌বী,— আস্‌নাই করা যাহার পেশা, তাহার জন্য চোখের জল ফেলিলে কি হইবে? তাহার হয় ত মাশুক জুটিয়াছে; সে দুই দিন ফূর্ত্তি করিতে সরিয়া পড়িয়াছে।" "না হে রুস্তম্ দিল্ খাঁ, মণিয়া আমার তেমন নয়।" "রাখ তোমার কথা, কস্‌বীর কন্যা সতী, তোমার পূর্ব্বে তোমার ন্যায় অনেক আহম্মক দেখিয়াছি,—তুমি প্রথম নহ।" "এখন কি উপায় করি বল দেখি?" "আফিম ধর বাপু, আফিম ধর। আমার হুঁকা ও তলের বাঁশের নলটা এবং ভরিখানেক ছিটা তোমায় এখনই দিতে পারি। দেখ, আফিমে সকল শোক, দুঃখ ও ব্যাধি নাশ হয়—" "তুমি বুঝিতেছ না, মণিয়া আমার তেমন মেয়ে নয়। আক্‌রাশিয়বখাঁ তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।" "আরে ভাই, রুস্তম্ দিল্ খাঁ একেবারে আশী বছরের বুড়া হইয়া জন্মায় নাই, তাহাও

এককালে যৌবন ছিল! পেশাওর হইতে পাটনা পর্য্যন্ত হাজার তুই আশীকা তাহাকে খুবসুরৎ মাশুক বলিয়া লটকাইয়া পড়িয়াছিল। আউরৎকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, এমন লোক এখনও জন্মায় নাই। সে কস্‌বীর বেটী কস্‌বী,—নিশ্চয় আশ্‌নাই করিয়া তুই পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখিতেছে।"

এই সময়ে এক রুক্ষকেশ, দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রথম বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ সাহেব, বাবা, এই সহরে মণিয়া বাঈজীর বাসা কোথায় জান?" বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জানি। কেন, তোমার কি হইয়াছে?" "সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!" দ্বিতীয় বৃদ্ধ এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সে তোমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে?" ব্রাহ্মণ কহিল, "সে রাক্ষসী আমার তুধের ভাইটিকে যাতু করিয়াছে।" রুস্তম্ দিল্ খাঁ, দন্তহীন বদন ব্যাদান পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "আরে গুল্‌শের, তোকে জন্মাইতে দেখিয়াছি,—তুই আস্‌নাইয়ের কথা কি বুঝিবি বল্? বলিয়াছিলাম কি, না, যে, তোর কস্‌বীর বেটী আস্‌নাইয়ে পড়িয়াছে? দেখ্, রুস্তম্ দিল্ খাঁর কথা ঠিক কি না? আমার ওয়ালেদ, নামটা রাখিতে ভুল করিয়াছিলেন। রুস্তম্ দিল্ না রাখিয়া আস্‌নাই দিল্ রাখিলেই ঠিক হইত; কারণ, হাঁটিতে শিখিয়া অবধি ক্রমাগত প্রেমে পড়িতেছি। যেখানে খুবসুরৎ আউরৎ, সেইখানেই আস্‌নাই, সেইখানেই ফেরেববাজী, সেইখানেই খুনখারাবী।" লজ্জায় ও অপমানে গুল্‌শের খাঁর মস্তক অবনত

হইল। সে অতি ধীরে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব, মণিয়া আমার পালিতা কন্যা। সে যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞানে করিয়াছে। আপনারা তাহাকে মাফ্ করিবেন। সে আমাকে দেখিলে আর কোন কথা কহিতে পারিবে না।" আগন্তুক তাহার কথা শুনিয়া ভীষণ বেগে মস্তক আন্দোলিত করিল। তাহার দীর্ঘ রুক্ষ কেশগুলি প্রশস্ত কপালের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিয়া উঠিল, "হুঁ—হুঁ—হুঁ। খাঁ সাহেব, মণিয়া বাঈ তেমন চীজই নয়। তাহার পেশোয়াজের মস্‌মসানি যদি শুনিতে, তাহা হইলে তোমার মাথা ঘুরিয়া যাইত।"

বৃদ্ধ গুল্‌শের খাঁ অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে সকল ভড়ং আমার কাছে কিছু থাকিবে না বাবু সাহেব! সে কোথায় আছে, সেই স্থানটা আমাকে দেখাইয়া দাও।" বৃদ্ধ রুস্তম্ দিল্ খাঁ এতক্ষণ একহস্তে যষ্টির উপর ভর রাখিয়া, অপর হস্তে গুম্ফ পাকাইতেছিল; সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আরে আহম্মক, সে কি তোর জন্য বসিয়া আছে! সে চিড়িয়া হইয়া, ফুড়ুৎ করিয়া মাগুকের গলা ধরিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে। তুই ঘরে যা, বুড়ী কস্‌বীকে লইয়া পাকা আফিম টানিতে ধর্।" গুল্‌শের খাঁ তাহার কথা শুনিয়াও শুনিল না এবং আগন্তুককে কহিল, "বাবু সাহেব, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চল, আমি এখনই তোমার ভাইকে মণিয়া বাঈয়ের যাদু হইতে ছাড়াইয়া লইতেছি।" তাহার সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিয়া আগন্তুকের মনে হয়

ত ঈষৎ আশার সঞ্চার হইল। সে ভাবিল যে, এই বৃদ্ধ পাঠান হয় ত দীর্ঘ বাহুদ্বয় দিয়া পাশব বলে মোহিনীর মায়াজালবদ্ধ ভ্রাতাকে মুক্ত করিয়া দিবে। সে আনন্দে তাহার সঙ্গে চলিল। প্রথম বৃদ্ধ রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, দুই হস্তে যষ্টির উপর ভর দিয়া, ঘন-ঘন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, "জহান্নমে যাও, অধঃপাতে যাও।" দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ পাঠান ও আগন্তুক পাটনা সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে জাফরখাঁর উদ্যানে উপস্থিত হইল; এবং বহুবিধ বস্ত্রাবাস অতিক্রম করিয়া অসীম ও ভূপেন্দ্রের তাম্বুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন্দ্র তখনও সেই স্থানে বসিয়া ছিল। সে তাহাদের পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" আগন্তুক কহিলেন, "আমি সুদর্শন।" তাঁহার নাম শুনিয়া ভূপেন্দ্রের কপালের কুঞ্চন অপসারিত হইল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া আসিলে দাদা!" সুদর্শন সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ভয় কি ভাই বেটীর বাপকে ধরিয়া আনিয়াছি। বুড়া পথে দাঁড়াইয়া কন্যা সন্ধান করিতেছিল। এইবার বেটীকে তাড়াইতে পারিলে হয়।" "মাগী আর বাহির হয় নাই; তাড়া খাইয়া অবধি চুপ করিয়াই আছে।" "ভাল কথা, ছোট রায় কি ফিরিয়াছে?" "এখনও ন[illegible] হরকরা আসিয়া বলিয়া গেল, দ্বিতীয় প্রহরের পরে ফিরিবেন[illegible] এই সময়ে বৃদ্ধ পাঠান জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব, মণি[illegible] কোথায়?" ভূপেন্দ্র অঙ্গুলি হেলনে তাম্বু দেখাইয়া দি[illegible] পাঠান দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাম্বুর নিকটে [illegible]

ডাকিল, "মণিয়া, মণিয়া?" প্রথমে কেহ উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ পরে নীল-রেশমের পর্দ্দা সরিয়া গেল, বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে, বাবু সাহেব?" পাঠান তখন তাম্বুর দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "মণিয়া, বাবু সাহেব তোর কে?" তাহাকে দেখিয়া রমণী প্রথমে শিহরিল। তাহার মুখে ভীতির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া, সহাস্য বদনে পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিল, "আব্বা, আপনি এখানে কেন?" বৃদ্ধ সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আমি এখানে কেন পরে বলিতেছি; আগে তুই বল্ যে, তুই এখানে কি করিতেছিস্?" বৃদ্ধের প্রশ্ন শুনিয়া রমণীর নেত্রদ্বয় সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আব্বা, আমি কস্‌বীর বেটী কস্‌বী, কসব আমার পেশা। বাল্যকাল হইতে পিতা-মাতা যাহা শিখাইয়াছে, তাহাই করিতে এখানে আসিয়াছি।" তাহার উত্তর শুনিয়া পাঠান স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার ক্রোধ দূর হইল এবং সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া, তুমি কস্‌বী, এ কথা ত প্রথম শুনিলাম মা! লোকে জানুক বা না জানুক, আমি তোমার পিতা। আমি কি কখনও তোমাকে কসব করিতে শিখাইয়াছিলাম? তুমি কস্‌বীর কন্যা বটে, কিন্তু আমি আজীবন তোমাকে ভদ্র গৃহস্থকন্যার মত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। তওয়াইফ্ হইলেই কি কস্‌বী হইতে হয় মা?" বৃদ্ধের নম্র ভাব দেখিয়া মণিয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল,—

"সেখান হইতে লস্করের লোক আবার আমাকে ধরিয়া আনিবে।" "তবে তুমি কি করিবে? কোথায় বাস করিবে?" "আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিব না।" এই কথা শুনিয়া সুদর্শন বলিয়া উঠিলেন, "ভূপ, সর্ব্বনাশ হইল।"

তাহার কথা বোধ হয় অসীমের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কারণ, তিনি ধীরে ধীরে সুদর্শনের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতক্ষণ আসিলে দাদা?" সুদর্শন ঘন-ঘন মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "বিষম বিপদ ভাই! বিপদ বলিয়া বিপদ। এখন মাগীকে তাড়ান যায় কি করিয়া?" "আমি ত কাল রাত্রি হইতেই উপায় অনুসন্ধান করিতেছি। কোন উপায়ই খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় গিয়াছে। আবার শুনিতেছি, শীঘ্রই দিল্লী যাইতে হইবে।" "মাগী তোমার স্কন্ধে আসিয়া আরোহণ করিল কেমন করিয়া?" "সে দুঃখের কথা বল কেন? কাল রাত্রিতে মজলিসে অনেক রাত্রি হই[য়া] গিয়াছিল। আহমদবেগ্ ও আফ্রাশিয়ব খাঁ উহাকে মুক্ত করিবার জন্য বায়না করিয়া আসিয়াছিল। উহাদের একজন[ের] বদ্ মতলব ছিল। কারণ, মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিয়া গেলে আফ্রাশি[য়ব] খাঁ উহার সঙ্গের লোকজন সব তাড়াইয়া দিয়া, উহাকে আ[টক] করিয়াছিল। উহাদের জাতির স্ত্রীলোক আটক করিলে বি[শেষ] আপত্তি করে না। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি কোন অজ্ঞাত ক[ারণে] রাত্রিতে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল! শাহ্‌জাদা তখন অ[...]

তাম্বুতে। তিনি চীৎকার শুনিয়া বাহিরে আসিলে, আহদীরা তাহাকে জানায় যে, আফ্‌রাশিয়ব খাঁ একজন স্ত্রীলোককে আটক করিয়াছে। তাঁহার আদেশ মত আমি তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে উহাকে মুক্ত করিয়া নিজের তাম্বুতে আনিয়াছি; এবং সমস্ত রাত্রি দুই ভাই সামান্য সিপাহীর মত তাম্বুর চারিদিকে পাহারা দিয়াছি। এইমাত্র শাহ্‌জাদাকে জানাইলাম যে, সে আওরৎ এখনও যায় নাই। তিনি বলিলেন যে, উহার ইচ্ছামত যাইতে পারে; কিন্তু উহাকে যেন কেহ বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া না যায়। ও ত কোথাও যাইতে চাহে না।"

সুদর্শন ঘন-ঘন মস্তক আন্দোলন করিতে-করিতে কহিলেন, "ঐ ত গোলযোগ ভায়া, ঐ ত গোলযোগ! বেটী তোমায় ছাড়িয়া যাইতে চাহে না কেন? দেখ ভাই, ভগবান্ তোমার উন্নতি করিয়াছেন, তোমাকে উচ্চ পদ দিয়াছেন; আশীর্ব্বাদ [illegible]রি, তোমার আরও উন্নতি হউক; কিন্তু আমি তোমাকে [illegible]র্ব যে ভাবে দেখিতাম, এখনও সেই ভাবে দেখি। তোমার [illegible]প্রথম যৌবন, অসীম রূপ, বেটী বোধ হয় তাহা দেখিয়া [illegible]য়াছে।" সুদর্শনের কথা শুনিয়া অসীম উচ্চহাস্য করিয়া [illegible]ন; এবং কহিলেন, "দাদা, তুমি পাগল হইয়াছ? ও যে [illegible]া!" সুদর্শন কহিলেন, "ভায়া, আমি পাগল হই নাই।— [illegible] ত স্ত্রীলোক! স্ত্রী-জাতিকে একেবারেই বিশ্বাস নাই।" [illegible] কহিলেন, "দাদা, কথাটা যদি বৌ-ঠাকুরাণী:ক বলিয়া [illegible] "তাহা হইলে দাদার বিপদ বাড়িবে আর কি!

সকাল-সকাল মাছ কিনিয়া বাসায় ফিরিতে বলিয়াছিল,—তোমার পাল্লায় পড়িয়া দ্বিতীয় প্রহর কাটিয়া গেল। এখন রঙ্গ-রহস্য রাখ, মাগীকে কি করিয়া বিদায় করা যায় বল দেখি? শাহ্‌জাদার মহলে পাঠাইয়া দিলে হয় না?" "পাগল হইয়াছ? বেগম-সাহেব এখনই উহাকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিয়া দিবে; না হয় ত খোজাকে বলিয়া দিবে যে, উহার নাক-কাণ কাটিয়া দেয়।" "তবে কি উপায় করা যায় বল দেখি?" "আমি মনে করিতেছিলাম যে উহাকে তোমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিব।" "কিন্তু কর্ত্তা কি মনে করিবেন?" "বিপন্না রমণী শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই উহাকে আশ্রয় দিবেন; কিন্তু বৌ-ঠাকুরাণী কি বলিবেন বলিতে পারি না।" "ওরে তাহার আর সে-কাল নাই।" এই সময়ে মণিয়া বাঈ তাম্বুর পর্দ্দা উঠাইয়া ডাকিল, "বাবু সাহেব!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যবনী স্পর্শ

তাম্বুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে বাঈজী?" সম্বোধন শুনিয়া সস্মিত বদনে যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে ও-কথা বলিয়া ডাকে

কেন?” অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আপনাকে কি বলিয়া ডাকিব?” মণিয়া কহিল, “কেন আমার নাম ধরিয়া, মণিয়া বলিয়া।” তাহার উত্তর শুনিয়া সুদর্শন ভূপেন্দ্রের হস্ত দৃঢ়ভাবে পেষণ করিলেন। সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সুদর্শন বলিয়া উঠিলেন, “ভূপ, গেল রে,—গেল, গেল! আর থাকে না। যখন নাম ধরিয়া ডাকিতে বলিতেছে, তখন আর থাকে না।” ভূপেন্দ্র কহিল, “দাদা, এমন টিপন দিয়াছ যে সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যাই-যাই হইয়াছি।”

মণিয়ার কথা শুনিয়া লজ্জায় অসীমের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মণিয়াও নিজের প্রগল্‌ভতা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইয়াছিল। এইরূপে অল্পক্ষণ কাটিয়া গেল, কেহই কোন কথা কহিল না। রমণী প্রথমে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, “আপনারা দুইজনে রাত্রি হইতে বাহিরে বসিয়া আছেন, বোধ হয় আমি আসিয়াছি বলিয়া? আমি থাকিতে কি আপনারা ভিতরে আসিবেন না?” অসীম লজ্জিত হইয়া কহিলেন, “কেন আসিব না! তবে রাত্রিকালে আপনার অসুবিধা হইবে [illegible]য়াও বটে, আর কতকটা আপনাকে রক্ষা করিবার জন্যও [illegible]টে, আমরা দুই ভাই তাম্বুর বাহিরে ছিলাম। ওহে ভূপেন, বড়দা, বাহিরে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি, ভিতরে আইস।” [আ]হ্বান শুনিয়া সুদর্শন ভূপেন্দ্রকে কহিলেন, “ওরে, তাম্বুর [ভি]তরে যাইতে বলে যে রে!” ভূপেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল এবং [জিজ্ঞা]সা করিল, “ভয় কি বড়দাদা, ও ত আর রাক্ষসী নয়।

চল না, তাম্বুর ভিতরেই যাই।” সুদর্শন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশ ভাবে কহিল, “তবে চল যাই। কি জান ভায়া, যবনী-স্পর্শ, বড়বধূ যদি শুনে?” ভূপেন্দ্র খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; এবং কহিল, “বৌঠাকুরাণী নিশ্চয়ই এ কথা শুনিবেন,—আমিই এ কথা তাঁহাকে শুনাইব।” ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া, উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এমন কাজটি করিও না ভাই, ব্রাহ্মণী তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।” ভূপেন্দ্র আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে ভূপ?” হাস্যবিহ্বল ভূপেন্দ্র কহিল, “বড়দাদা—যবনীস্পর্শ—বৌঠাকুরাণী—উদ্বন্ধন—”হাস্যের প্রবল বেগ তাহার উক্তির অবশিষ্টাংশ রুদ্ধ করিল।

সুদর্শন যে ভাবে বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অসীম তাহা দেখিয়া হাস্য রোধ করিতে পারিলেন না। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরের কক্ষে একখানি গালিচা বিস্তৃত ছিল। মণিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া সকলকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। অসীম ও ভূপেন্দ্র উপবেশন করিলেন। কিন্তু সুদর্শন তখনও কাষ্ঠদণ্ডবৎ এক কোণে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া উভয় ভ্রাতা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। মণিয়া বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি আসিবেন না?” ব্রাহ্মণ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তাহা দেখিয়া অসীম কহিলেন, “কি বড়দাদা, বসিবেন না?” ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, “একে

যবনী, তায় বেশ্যা! তোমাদের আচার-বিচার একেবারে গিয়াছে।" মণিয়া মনে করিল যে, ব্রাহ্মণ হয়ত যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সে উঠিয়া ব্রাহ্মণের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে মাফ করিবেন। আপনি বসুন না।" মণিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ লম্ফ দিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আরে, আরে, তুই করিস্ কি? যবনী, পাষণ্ডী! ছাড়্ ছাড়্! হায়-হায়, আজ যবনীর হাতে ধর্ম্ম নষ্ট হইল। ওরে ছোট রায়, তোরা হাসিস্ কেন, আমাকে ছাড়িয়া দিতে বল্।" অসীম ও ভূপেন্দ্র হাস্যের প্রবল বেগ দমন করিতে না পারিয়া গালিচার উপর লুটাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মণিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলেন, "ওগো বাছা, তুমি আমার মা, তুমি দয়া করিয়া আমায় ছাড়িয়া দাও। আহা বড়-বধূর আমার আর কেহ নাই গো।" মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-বধূ আপনার কে হয়?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া অসীম ও ভূপেন্দ্রের হাস্যের বেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। মণিয়া তখনও সুদর্শনের হস্ত ত্যাগ করে নাই। সুদর্শন অতি কাতরকণ্ঠে মণিয়াকে কহিল, "বাঈজি, তুমি এই নচ্ছার ছোট রায়টিকে লইয়া যাহা খুসি তাহাই কর, আমি কিছুই বলিব না। তুমি দয়া করিয়া আমার হাতটা ছাড়িয়া দাও। দেখ, বড়বধু যদি কথা শোনে, তাহা হইলে গলায় দড়ি দিবার পূর্ব্বে ঝাঁ দয়া আমাকে

বিছাইয়া দিবে।" মণিয়া সুদর্শনের সমস্ত কথা বুঝিল না, সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "বড়বধূ আপনার কে হয়?" হাস্যের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বড়বধূ বড়দাদার গুরু, ইষ্টদেবতা,—এই তোমরা যাহাকে মুরশীদ বল।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র পুনরায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণিয়া বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মুরশীদ রাগ করিবেন কেন, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? বলুন না।" মণিয়ার কথা শুনিয়া সুদর্শনের শোকাবেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহা দেখিয়া অসীম ও ভূপেন্দ্র আবার গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল। মণিয়া সুদর্শনকে শান্ত করিবার জন্য তাহার রেশমের রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। সুদর্শন শিহরিয়া উঠিয়া উভয় হস্তে চক্ষু আবৃত করিল। মণিয়া তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে গেল। সুদর্শন লম্ফ দিয়া উঠিল; এবং কহিলেন, "এ রাম, আরে ছিঃ! ও বাঈজি, তুমি কর কি? হরেকৃষ্ণ, গোবিন্দ! আ মর্ মাগী, ভূত ঝাড়িবার মত গায়ে হাত বুলাইতেছিস্ কেন? ওরে, পিঁয়াজের গন্ধ! ওরে অসীম, ও ভূপেন, আমাকে ছাড়াইয়া দে না ভাই।" অসীম ও ভূপেন তখন প্রবল হাস্যের বেগে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না দেখিয়া, সুদর্শন অবশেষে মণিয়াকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "ও বাঈজি, তুমি আমার ধর্ম্ম-মা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ছোট রায়কে

ছাড়াইতে আসিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। তুমি ছোট রায়কে যথা-ইচ্ছা লইয়া যাও, উহার মাথাটা চিবাইয়া খাও, আমি কখন কিছু বলিব না। মা কিরীটেশ্বরীর দিব্য, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য যদি আর কখন তোমার ছায়ায় পদার্পণ করে, তাহা হইলে সে চণ্ডাল! চণ্ডাল!! চণ্ডাল!!!" মণিয়া এতক্ষণে কিছু বুঝিতে পারিল। সে হাসিয়া কহিল, "তা বেশ ত, আমি ত আপনাকে খাইয়া ফেলিতেছি না, আপনি বসুন না।" সুদর্শন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "খাইতে আর বড় বাকী নাই। তোমার স্পর্শেই আমার ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছে। আহা, বড়বৌ আমাকে সকাল-সকাল মাছ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতে বলিয়াছিল। হায় হায়!" মণিয়া হাসিতে-হাসিতে কহিল, "আপনার ধর্ম্মনষ্ট হইবে কেন?" মণিয়া তখনও হাত ছাড়ে নাই এবং ছাড়িবার উপক্রমও করিতেছে না দেখিয়া, সুদর্শন পুনর্ব্বার ক্রন্দন সুরু করিয়া দিলেন। মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব, কাঁদেন কেন?" কাঁদিতে-কাঁদিতে সুদর্শন কহিলেন, "ও বাঈজি, তুমি বোঝ না। —আমার যে দশা হইয়াছে, তাহা যেন শত্রুরও না হয়। আমার জাতিকুল সব গেল।" মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জাতি গেল কেন? এই দুইজন বাবু-সাহেব বসিয়া আছেন,—ইহাঁরাও ত হিন্দু, কৈ ইহাঁরা ত কাঁদিতেছেন না?" সুদর্শন বলিয়া উঠিলেন, "ও গো, বাঈজি গো, তুমি জান না গো, উহাঁদের যে বড়বধূ নাই!" সুদর্শনের কথা শুনিয়া অসীম ও

ভূপেন্দ্র পুনরায় গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ মর্ম্মান্তিক চটিলেন; এবং কহিলেন, "ওরে লক্ষ্মী-ছাড়ারা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট হইল, জাতি-কুল গেল, বড়বধূ অনাথা হইল—আর তোরা কি না হাসিতেছিস্! আমার এই দশা হইল, আর তুই কি না রঙ্গ দেখিতেছিস্?" অসীম গালিচা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, "বড় দাদা, আমরা রঙ্গ দেখিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে রঙ্গ দেখাইতেছ?" "ওরে হতভাগা, আমি সুদর্শন ভট্টাচার্য্য, আমি কি না রঙ্গ করিতেছি! নবাবের বেটার সাথী হইয়া তোর এতবড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে? আমার বলে জাতি গেল, কুল গেল, ধর্ম্ম গেল,—এক বেটী পাষণ্ডী যবনী পলাণ্ডুর গন্ধভরা রুমাল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দিল,—আর তোরা দুটা ষণ্ডামার্কণ্ড বসিয়া-বসিয়া তাহাই দেখিলি আর হাসিলি? আবার বলিতেছিস্, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি? হে ভগবান মধুসূদন—" এই সময়ে ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া মণিয়া তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। সুদর্শন তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তিনি তাম্বুর বাহিরে যাইতে না যাইতে, অসীম তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণ বাধা পাইয়া পড়িয়া গেলেন; এবং মণিয়া বাঈ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া, সুদর্শনের মস্তক ক্রোড়ে উঠাইয়া লইল। সে যেমন মস্তক স্পর্শ করিয়াছে, ব্রাহ্মণ অমনি উভয় হস্তে শিখা লুকাইয়া রাখিয়া, লম্ফ দিয়া উঠিলেন। প্রবল লম্ফের বেগে ভূপেন্দ্র ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। মণিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল; এবং অসীম

তাম্বুর দুয়ারে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তাম্বুর এক কোণে দাঁড়াইয়া, উভয় হস্ত শিখার উপরেই রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মুখের ধর্ম্ম গিয়াছে, পিঠের ধর্ম্ম গিয়াছে,—বেটী পাষণ্ডী, এখন ব্রহ্মণ্যবেদের উপরে হাত! কি বলিব ছোট রায়, কেবল বড়বধূর মুখ চাহিয়া এ প্রাণ এখনও ধরিয়া আছি; নতুবা এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।" এই সময়ে ভূপেন্দ্র কাতরকণ্ঠে কহিল, "বড় দাদা, তোমার রঙ্গরস একটু রাখ। হাসিয়া-হাসিয়া আমার পেটে খিল ধরিয়া গেল।" তাহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ওরে কাণা বাঁদর, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—এক বড়বধূ ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দিবসে দ্বিতীয়বার নিরীক্ষণ করি না—আমি কি না রঙ্গরস করিতেছি?—আর তোরা দুইটা পাষণ্ড সারাটা রাত্রি যবনী, বেশ্যাকন্যা, গণিকাকে লইয়া বিহার করিলি,—আর আমি কি না রঙ্গরস করিলাম!"

এই সময়ে মণিয়া তাহার মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিল। সে উভয় হস্তে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, "পিয়ার, মেরে মাশুক, মেরী জান! তুম্ নে কেঁউ গোসা হোতা হ্যায়?" সুদর্শন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া সটান গালিচার উপর শুইয়া পড়িলেন; এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, বড়বধূ রে, আর বুঝি দেখা হল না!" ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ভীতা হইয়া অসীম মণিয়াকে কহিলেন, "বাঈজি, উঁহাকে ছাড়িয়া দাও,—উঁহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, আর

অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে, হয় ত নিজেই নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিবেন।" মণিয়া তখন সুদর্শনকে আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া, একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল; এবং অসীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাঁর কি হইয়াছে, এমন করিতেছেন কেন?" অসীম বহুকষ্টে হাস্যের বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "বাঈজি, কথাটা তুমি বুঝিবে না—বড় দাদা কখনও পরস্ত্রী স্পর্শ করেন না।" মণিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি ত কাহারও স্ত্রী নহি।" সুদর্শন এতক্ষণ গালিচায় শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি মণিয়ার কথা বুঝিতে পারিলেন এবং তীরবেগে উঠিয়া বসিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "তুই কাহারও স্ত্রী নহিস্? বেশ্যা অর্থে বারবণিতা জানিস্? তোর দ্বাদশটির অধিক স্বামী আছে।" মণিয়া বিস্মিতা হইয়া অসীমকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব কি বলিলেন?" অসীম হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "সে কথা আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না বাঈজি!" এই সময়ে সুদর্শন করজোড়ে মণিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে, কাতরকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে বাঈজি, তোমাকে যখন ধর্ম্ম-মা বলিয়াছি, তখন তুমি বেশ্যা হইলেও আমার পূজনীয়া; অতএব বড়বধূরও পূজনীয়া। তুমি তোমার ধর্ম্ম-কন্যার মুখখানি স্মরণ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। তাহার যে আমি ব্যতীত আর কেহ নাই। হে বাঈজি, তুমি মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে পুরুষানুক্রমে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল এই হতভাগা অসীম রায়ের মস্তকটা গজভুক্ত কপিত্থবৎ ভোজন করিতে থাক,—আমার কোনও আপত্তি নাই। আমি

অতি দীন, তোমার দাসানুদাস,—তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।" অসীম এই কথা মণিয়াকে বুঝাইয়া দিলে মণিয়া কহিল, "ভাল কথা, ছাড়িয়া দিব; কিন্তু তিনটি সর্ত্ত আছে। প্রথম সর্ত্ত, আমার একটী গান শুনিতে হইবে। দ্বিতীয় সর্ত্ত, আমার হাতের একটা পান খাইতে হইবে; এবং তৃতীয় সর্ত্ত, আমাকে সঙ্গে করিয়া বড়বধূর নিকট লইয়া যাইতে হইবে।" সর্ত্ত শুনিয়া সুদর্শন গালিচার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। মণিয়া কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে তাহার কুরঙ্গ-নয়ন-কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, দুইটা কটাক্ষবাণ হানিয়া, সুদর্শনের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া কহিল, "সে কি হয়? মেরা জান্, আমার কলিজা, আমি কি তোমায় এমনি সাদা কথায় ছাড়িয়া দিতে পারি? তুমি আমার মাশুক, আমি তোমার প্রেমে পাগলিনী,—আমার ছাতির উপরে তোমার জন্য সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি। জানি, আমি কি তোমায় ছাড়িতে পারি? তোমাকে ছাড়িলে মণিয়ার জানে আর কি থাকিবে পিয়ার? ও-হোঃ, অমন কথা বলিও না দিলদার!" এই সময়ে নবকৃষ্ণ তাম্বুর বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, "হুজুর, দরবার হইতে তলব আসিয়াছে,—কি বলিব?" অসীম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "হরকরা ফিরাইও না, আমি আসিতেছি।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কলাবিদ্যা

অসীম যখন তাম্বু হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন সুদর্শন একবার তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন; এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ছোট রায়, আমার কি ব্যবস্থা করিয়া গেলি রে?" অসীম এক লম্ফে তাম্বুর দুয়ার হইতে বাহির হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। ভূপেন্দ্র হাসিতে-হাসিতে কহিল, "বড়-দাদা, তুমি কি মেজদাদার অনাথা বিধবা যে, তিনি তোমার ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন?" মণিয়া এই সময়ে উঠিয়া তাম্বুর দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর হইয়া কহিল, "দেখ বাবু সাহেব, এখন হইতে আমি যাহা বলিব, যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তোমার জাতি মারিব। আমি মুসলমানী,—তোমাকে আমার মুখের খানা খাওয়াইব,—অবশেষে নিকা করিব। তুমি এখন হইতে তোমার বড়বধূ মুরশিদের আশা পরিত্যাগ কর।" সুদর্শন কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কহিলেন, "বাঈজি, তুমি যাহা বলিবে বাবা, আমি তাহাই করিব, কেবল ঐ বড়বধূটির—ওর নাম কি,—কথা বলিও না।" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মণিয়া কৃত্রিম রোষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "বেয়াদব্, বদ্‌বখৎ, বেত্‌মিজ, সারেঙ্গীতে সুর চড়াও!" বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে-করিতে

স্থদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন "তা—তা, চড়াইতেছি বাবা, কিন্তু ঐ প্রথম কথাগুলি কি বলিলে বাবা—সে কি—ওর নাম কি—বড়বধূর কথা?" "তেরী বড়বধূকে ন-কুছ্‌ করে! আরে কম্‌বখ্‌ৎ, হুকুম তামিল কর।" ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া সারেঙ্গীতে স্থর বাঁধিতে বসিলেন। ভূপেন্দ্র পাগলের মত গালিচার উপরে লুটাইতেছিল সে উঠিয়া বসিয়া বাঁয়া ও তবলা ধরিল।

মণিয়া স্থর ধরিবামাত্র, স্থদর্শন দুঃখ, শোক ও বড়বধূ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। মণিয়া গান ধরিল,—গান ছাড়িয়া আলাপ আরম্ভ করিল,—আলাপ শেষ করিয়া আবার গান ধরিল। গান শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ মন খুলিয়া মণিয়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবিনী হও, পতি পুত্র লইয়া স্থখে সংসার করিতে থাক; কিন্তু একবার তোমার তাল কাটিয়া গিয়াছিল।" মণিয়া অত্যন্ত উৎস্থক হইয়া কহিল, "কোন্‌খানটা বাবু সাঁহেব?" এই সময়ে নবকৃষ্ণ তাম্বুর পর্দ্দা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দা'-ঠাকুর, একবার তামাক ইচ্ছে কর্‌বেন না কি?" স্থদর্শন অন্যমনস্ক হইয়া তাহাকে কহিলেন, "দাঁড়াও, গাহিয়া বাৎলাইতেছি" এবং মণিয়াকে কহিলেন, "একটা নূতন কলিকা সাজিস্‌।" মণিয়া বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিতেছেন?" ভূপেন্দ্র বাঁয়া তবলা ঠেলিয়া ফেলিয়া, আবার গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল। স্থদর্শন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি হইল রে?" ভূপেন্দ্র

কহিল, "তুমি যে বাঈজীকে তামাক সাজিতে বলিয়া নবকৃষ্ণকে তাল বাতাইতেছ?" সুদর্শন তাহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই না কি? ও বাঈজি, তুমি রাগ করিও না বাপধন্! আমার আর মাথার ঠিক নাই।" সুদর্শন এই বলিয়া সারেঙ্গী ধরিলেন। তাঁহার তীব্র সতেজ কণ্ঠের মধুর ধ্বনি শুনিয়া মণিয়া মোহিতা হইল। গান শেষ হইলে, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিন বার কুর্ণিশ করিল; এবং কহিল, "বাবু সাহেব, আমার গোস্তাকী মাফ্ করিবেন। আপনি যে গুণী লোক, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই;—আর আপনি যেমন-তেমন গুণী নহেন। আপনার গলার আওয়াজ অতি সুন্দর, এবং গাহিবার কায়দা নূতন্ ধরণের। অনেক দিন এমন গান শুনি নাই!"

প্রশংসায় দেবতাও তুষ্ট হন; সুদর্শন মানুষ—তিনি যে তুষ্ট হইবেন, তার আর বিচিত্র কি! ধর্ম্মনাশ, জাতিনাশ, কুলনাশ সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণ গালিচার উপর বসিয়া গেলেন; এবং নবকৃষ্ণ-নির্ম্মিত অপরূপ কদলীপত্রের হুঁকায় তামাকু-সেবন করিতে-করিতে, মণিয়ার সহিত সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহর অবসান হয় দেখিয়া ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বড় দাদা, আজ কি তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মনে নাই? আমার যে ক্ষুধায় পেট জলিয়া গেল।" সুদর্শন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "তাই ত রে, সে কথা ত একেবারেই মনে নাই! ছোট রায় কখন্ আসিবে? সে খাইবে না?" "তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও,—শাহাজাদার মুখ দেখিলে তাঁহার

আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না।" নবকৃষ্ণ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, গণ্ডদ্বয় স্ফীত করিয়া, একটা নূতন কলিকায় ফুঁ দিতেছিল ;—সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "দা'-ঠাকুর, আপনাকে সারেঙ্গী ধরিতে দেখিয়া, আমি আপনার সেবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।—একটা পাকা কাঁঠাল, দুইকুড়ি আম, সের-পাঁচেক পেড়া ও বরফী।" সুদর্শন অত্যন্ত প্রীত হইয়া নবকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে কহিলেন, "বাঁচিয়া থাক নবকৃষ্ণ, তোমার মঙ্গল হউক ; কিন্তু বাপু, এত কি আমি একা খাইয়া উঠিতে পারিব ?" ভক্তি-গদগদকণ্ঠে নবকৃষ্ণ কহিল, "তা, দা'-ঠাকুর, আর দুইদণ্ড সারেঙ্গী পিড়িং-পিড়িং করিলে একটা খাজা কাঁটাল আর দুইকুড়ি আমের সহিত আপনি স্বচ্ছন্দে নবকৃষ্ণ দাসকে পর্য্যন্ত সেবা করিতে পারেন।" কৃত্রিম রোষের সহিত সুদর্শন কহিলেন, "বেটা, মস্করা ?" নবকৃষ্ণ অমনি করযোড়ে কহিল, "ঠাকুর, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা,—চেহারায় ঠিক যেন কিরীটেশ্বরের মা কালী !" তাহার কথা শুনিয়া ভূপেন্দ্র হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "বড়দাদা, তুমি নবার সহিত কথায় পারিবে না,—ও দক্ষিণ দেশের লোক, —দশটা মিষ্ট কথার সহিত তোমাকে বিলক্ষণ কড়া দুকথা শুনাইয়া দিবে। এই দেখ, ইহারই মধ্যে তোমাকে শুনাইয়া দিল যে, তুমি একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস এবং তোমার রংটি ভূষা কালির মত।" সুদর্শন কিন্তু ক্রুদ্ধ না হইয়া নবকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবা, আমরা ত খাইব ; কিন্তু বাঈজীর কি হইবে ?" নবকৃষ্ণ একটা সুদীর্ঘ প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা দেবতা,

নবকৃষ্ণ দাস উপস্থিত থাকিতে হুজুর সরকারের বদ্‌নাম হইবার উপায় নাই। যে পরিমাণ পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কোর্ম্মা মজুৎ রাখিয়াছি, তাহা খাইয়া বিবিসাহেবার বোধ হয় আর কিছু খাইবার রুচি থাকিবে না।" এই সময়ে ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "বিবি সাহেবা আর কি খাইবে?" নবকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞে হুজুর বিবিসাহেবারা সচরাচর যাহা পছন্দ করিয়া থাকেন,—বড়লোকের কাঁচা মাথা!" সুদর্শন প্রীত হইয়া কহিলেন, "বাহবা নবকৃষ্ণ, তোর দিব্য রসজ্ঞান আছে দেখিতেছি!" নবকৃষ্ণ হাসিয়া কহিল, "সমস্তই দেবতার আশীর্ব্বাদ।"

এই সময়ে অসীম ফিরিয়া আসিলেন; এবং সুদর্শনকে আহার করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন। মণিয়া স্বতন্ত্র তাম্বুতে আহার করিতে গেল। সেই সময়ে অসীম সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, তুমি বাঈজীকে কিছুদিন আশ্রয় দিতে পারিবে?" সুদর্শন সানন্দে কহিলেন, "কেন পারিব না! কর্ত্তা আপত্তি না করিলেই হইল।" "তবে এতক্ষণ ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, বলিয়া চীৎকার করিতেছিলে কেন?" "কি জান ভাই, একে বাঈজী, রূপসী যুবতী, তাহার উপর যবনী সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, চীৎকার না করিয়া করি কি? প্রথম ভয় ধর্ম্মের, দ্বিতীয় ভয় বড়বধূর। এখন সে সমস্ত গোল কাটিয়া গিয়াছে, বাঈজীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি। সে অতি সাধ্বী, সমঝদার লোক। গুণী লোকের জাতি-বিচার থাকে না। কলাবতের

মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। গুণের বলে যবন হরিদাস পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।" "বড় দাদা, তুমি একটী যাদুকর। এই মাত্র দুইহাতে টিকি সামলাইয়া, ধর্ম্মনষ্ট হইল বলিয়া কাঁদিতে-ছিলে; আবার ইহারই মধ্যে ছাতিটি এত দৃঢ় করিয়া ফেলিলে কেমন করিয়া?" "সকল কলাবতের মধ্যেই একটা ভ্রাতৃভাব আছে। সে কথাটা বাহিরের লোকে বুঝিতে পারে না। যতক্ষণ তাহার গুণের পরিচয় পাই নাই, ততক্ষণ তাহাকে চরিত্রহীনা, যবন-কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেখ ভাই, তোমরা সকলেই জান, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য কখনও বড়বধূ ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে নাই; সুতরাং প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম আর কি! কিন্তু এখন আর মনে কোন দ্বিধা নাই। তুমিও যে, ভূপেনও যে, মণিয়াও সে।"

অপরাহ্নে অসীম, ভূপেন ও সুদর্শন মণিয়ার সহিত হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের আবাসে যাত্রা করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরস্বতী বৈষ্ণবী

যৌবন অতীত হইলে সরস্বতী বৈষ্ণবী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। সে জাতি-বৈষ্ণবের কন্যা; সুতরাং ভিক্ষা করিতে কখন তাহার লজ্জা বোধ হয় নাই। নূতন বৃত্তিতে তাহার

সুকণ্ঠ তাহাকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিত। তাহার কারণ, যৌবন ও যৌবনের সহিত বৈষ্ণবের প্রেম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার সুকণ্ঠ তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে প্রভাতে উঠিয়া খঞ্জনী ও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইত; এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন, যে গ্রামের লোকের যেমন অভিরুচি, তেমন গান গাহিয়া তাহাদের তৃপ্ত করিত; সুতরাং বঙ্গভূমির সেই সুখ-স্বচ্ছন্দ-প্রাচুর্য্যের যুগে বিগত-যৌবনা সরস্বতী বৈষ্ণবীর কোনও দিন অন্নের অভাব হয় নাই। কখনও-কখনও শেষ বসন্তের কোকিলের মত, কোনও বিগত-যৌবন প্রেমিক বৈষ্ণব, সরস্বতীর সংসারের স্বাচ্ছল্য দেখিয়া, প্রেমের ফাঁদ পাতিবার চেষ্টা করিলে, সরস্বতী অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে জানাইয়া দিত যে, পুরুষ-জাতি যৌবনে তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছে, স্নিগ্ধ প্রৌঢ়ে সে তাহা বিস্মৃত হয় নাই!

শ্রাবন মাস, সমস্ত দিন বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রাম্যপথ জনশূন্য। সরস্বতী সেদিন আর ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে নাই। সমস্ত দিন তাহার নির্জ্জন গৃহে একাকিনী বসিয়া তাহার কঠোর মনও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আপন মনে খঞ্জনী লইয়া, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছিল—

সহসা কর্দ্দমময় গ্রাম্য-পথে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল। সরস্বতী গীত বন্ধ করিয়া খঞ্জনী নামাইয়া রাখিল। গ্রামের এক প্রান্তে তাহার ক্ষুদ্র কুটীর অবস্থিত; এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কেহ সে পথে চলিত না; সুতরাং পদশব্দ শুনিয়াই সরস্বতী

বুঝিতে পারিল যে, কাহারও অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা না হইলে এই দুর্য্যোগে সে তাহার গৃহে আসিবে কেন? ক্রমে তাহার কুটীরের বেড়ার উপর দিয়া একজন মানুষের মাথা ও একটা মাথাল দেখা গেল। সে ব্যক্তি বেড়ার দরজায় আসিবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, সরস্বতী দিদি বাড়ী আছ গা?" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরস্বতী রুষ্টা হইল। তুষ্ট হইবার কোন কারণ ছিল না; কারণ, আগন্তুক আজীবন তাহার শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল। সরস্বতী কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিল না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে অনেক নূতন জিনিষ শিখিয়াছিল;—ইচ্ছা করিয়া নহে—বাধ্য হইয়া। মনোবৃত্তি-সংযম তাহার অন্যতম। সে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, শুষ্ক অধরোষ্ঠে শুষ্কতর হাসি আনিয়া কহিল, "কে, নবীন দাদা! এই দুর্য্যোগে কি মনে করিয়া?" নবীন দুয়ারের ঝাঁপটা সরাইয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল; এবং সরস্বতীকে দেখিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আ! বাঁচিলাম! সরস্বতী দিদি, তুমি তবে ঘরেই আছ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছ। ইচ্ছা করিয়া কেন এত কষ্ট পাও দিদি,—একটা মালাচন্দন করিলেই পার! তোমার কি বৈষ্ণবের অভাব হয়! তোমার বয়সটা কি! তার উপর তুমি গুণী লোক।" সরস্বতী শুষ্ক হাসি পরিত্যাগ করিয়া সত্যসত্যই ঈষৎ হাসিল; কারণ, সে বুঝিল, তাহার চিরশত্রু নবীন বিশেষ বিপন্ন হইয়া তাহার শরণ লইতে আসিয়াছে। সে কহিল, "বয়স আমার পঁয়তাল্লিশ, গুণে

কি যৌবন বাঁধিয়া রাখিতে পারে দাদা? তোমরা পুরুষ মানুষ, ভোমরার জাতি। যতক্ষণ মধু থাকে, ততক্ষণ তোমরা থাক। আমার যৌবনের মধু ফুরাইয়াছে; সুতরাং এখন আর তোমরা আসিবে কেন?" পরামাণিক-কুলশেখর নবীন বুঝিল যে, তাহার হস্তনিক্ষিপ্ত বাণটা যথাস্থানে পৌঁছে নাই। সে তাহার তূণ হইতে শব্দভেদী বাহির করিল এবং কহিল, "দিদি! সকল ভোমরা যদি প্রকৃত মধু চিনিত, তাহা হইলে কি সাধের দুনিয়া-খানা এমন করিয়া ছারেখারে যাইত? রূপ ক' দিনের? ফুলের পাঁপড়ির মত ভোমরার পদভরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুণই প্রকৃত মধু,—যাহার মিষ্টতা চিরস্থায়ী এবং যাহা বাহির করিতে পরিশ্রম করিতে হয়! কিন্তু প্রকৃত গুণের আদর দেশের কয়জন বুঝে দিদি!" ভ্রমর-চরিত্রাভিজ্ঞা সরস্বতী বুঝিল যে, নবীন-নরসুন্দর দীর্ঘকাল পরে আজি প্রীতিস্থাপন করিতে আসিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ রণকুশল যোদ্ধার ন্যায় কথাটা ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, তামাকু সাজিব?" নবীন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, পীতাম্বর হুঁকাটা রাখিয়া গিয়াছে না কি?" উঠানে বেগে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া, বিকৃত কণ্ঠে সরস্বতী কহিল, "তার মুখে আগুন, পোড়ারমুখো আবার হুঁকাটা রাখিয়া যাইবে? সে যেদিন তাহার চির-যৌবনী নূতন প্রাণেশ্বরীর কাছে গিয়াছে সেইদিনই তাহার হুঁকা, কলিকা, তোড়যোড়, মেরু সবই লইয়া গিয়াছে। তোমরা পাঁচজনে ভালবাস, মধ্যে মধ্যে আস, সেইজন্য একটা কলিকা আর ছিলিম দুই তামাকু

সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।" নবীন পীতাম্বরের উচ্ছিষ্ট হুঁকা পাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া কহিল, "তা সাজ, দিদি, সাজ!" সরস্বতী একটা ভাঙ্গা পিতলের ঘটীতে জল গড়াইয়া দিল। নবীন মাথালটা দাওয়ার ছাঁচে ঝুলাইয়া রাখিয়া পা ধুইয়া উঠিল। সরস্বতী একখানা চাটাই বিছাইয়া দিয়া, শোলা ও চক্‌মকী লইয়া, কাঠের কয়লায় আগুন ধরাইতে বসিল। সময় বুঝিয়া নরসুন্দর-কুলতিলক আসল কথাটা পাড়িল।

"দিদি, এত জায়গায় ত যাও, একটু লম্বা পাড়ী দিতে পার?" "ব্যাপারটা কি?" "যদি রাজী হও ত খুলিয়া বলি।" "কারবার নগদ ত?" "নগদ বৈ কি! বিলক্ষণ নগদ! আর কাজটি রসাল,—ঠিক যেন খাজা কাঁঠাল?" "রূপক রাখ, নগদ কত বল দেখি?" "মাসখানেক মাস দুই লাগিবে,—তুমি ন্যায্য কথা যাহা বলিবে, আমি আর তাহার উপর কথা কহিব না।" "দেখ নবীন দাদা, তুমিও আমায় চেন, আমিও তোমায় চিনি। কারবারে নগদ চুক্তির কথা খোলসা থাকাই ভাল। দুই মাস লাগিবে,—তবে দূরদেশের কথা। কিন্তু দেখিও ভাই, কারও বৌ-ঝি—" "আরে রামচন্দ্র! বল কি সরস্বতী দিদি? হরেকৃষ্ণ, গোবিন্দ মাধব!" "গোপীনাথ, হৃষীকেশ, শ্যামসুন্দর, আর সবশেষে সেই রাইকিশোরী! বিটকেলমো ছাড়, আদৎ কথাটা কি খুলিয়া বল।" সরস্বতীর হস্ত হইতে কলিকাটি লইয়া, দুই একটা টান দিয়া, নবীন কহিল, "কাজ তেমন শক্ত নয়—বিশেষতঃ তোমার মত জাঁহাদার মেয়েমানুষের কাছে!

আর ঐ যে কথাটা বলিলে, সে যৌবনে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর চার নাই। এখন কেবল—" "যা করেন ঘোষেদের রাইকিশোরী।" "কি বল যে সরস্বতী দিদি! নবীনের কি আর সে কাল আছে? যাক্ সে কথা। রায়-গৃহিণীর কাছ হইতে আসিতেছি। বিদ্যালঙ্কারের মেয়ে দুর্গাঠাকুরাণীর খিট্‌কেলটা শুনিয়াছ ত? শুনিলাম, ছোট রায় না কি দুর্গাকে লইয়া পথ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।" "দুর্গা তেমন মেয়ে নয়। আমার দুই কুড়ি বৎসর বয়স হইল,—এখন মেয়েমানুষের মুখ দেখিলেই বলিতে পারি সে কেমন।" "বড় ঘরের কথা,—আমরা 'আদার ব্যাপারী,'—কাজ কি আমাদের 'জাহাজের খবরে' দিদি? রায়-গৃহিণী চান যে, ছোট রায় আর দুর্গা কোথায় কি ভাবে আছে, সেই খবরটা। এখন খরচ-খরচা বাদ কি চাই তা বল?" "তোমার বখরাটা কি শুনি?" "আমার বখরা—সে—তা—দিদি —নবীন তোমার খাইয়াই মানুষ—তুমি হাতে করিয়া যাহা দিবে, আমি মাথায় তুলিয়া লইব;—আর তোমার সঙ্গে যদি প্রবঞ্চনা—নবীনের চৌদ্দপুরুষ যেন—হরেকৃষ্ণ, রাধেমাধব, গোবিন্দ, গোপীনাথ।" "বলি, কৃষ্ণের রাধা * ত?" "তা তুমি যখন বলিলে, আমি আর কি বলিব? আমার চন্দ্রাবলী † হইলেও চলিত; তবে তুমি যখন নিজমুখে বলিয়াছ—জয় রাধে কৃষ্ণ, শ্রীরাধেকৃষ্ণ।" কলিকাটা নামাইয়া রাখিয়া নবীনচন্দ্র

* আধাআধি।

† সিকি।

কহিল, "বায়নার বাবদ কিছু লইয়া আসিয়াছিলাম।" "দিয়া যাও।" নবীন কাছার খুঁট খুলিয়া চল্লিশটি টাকা বাহির করিল এবং সরস্বতীর হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খরচ বাবদ কি লাগিবে?" "অন্ততঃ পাঁচকুড়ি। হয় ত কাশী অবধি যাইতে হইবে।" "টাকাটা কাল সকালেই আনিয়া দিব। কখন যাইবে?" "কাল তৃতীয় প্রহরে।" নিজ বখরা বুঝিয়া লইয়া নবীন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেম-প্রকাশে

সেই উদ্যানতলে সহস্র-সহস্র মুক্তাবিন্দু শ্যামল দূর্ব্বাদল-শীর্ষ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল; স্বচ্ছ শিশিরের স্বল্প আবরণ তরুশির মণ্ডন করিয়াছিল। সদ্যঃ-প্রবুদ্ধ বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া দিগন্ত শব্দায়মান করিতেছিল। স্থবির অশ্বত্থমূলে একখানা মৃদু হরিদ্বর্ণ ইরানী গালিচা দূর্ব্বাশ্যাম ভূপৃষ্ঠে যেন অ[illegible]রা হইয়া পড়িয়া ছিল। তখন অরুণ-বরণ তরুণ তপন-কিরণে স্নিগ্ধ, শান্ত, উষার ঈষদালোকে প্রস্ফুটনোন্মুখ গোলাপের ন্যায় সুন্দরী একটী রমণী নিঃশব্দ পাদক্ষেপে সেই শিশিরবিন্দু-শোভিত জীর্ণ অশ্বত্থতলে ঈষদ্ধরিৎ ইরানী গালিচার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমণী যুবতী। যে যৌবনের প্রারম্ভে কুক্কুরীও পরমা সুন্দরী হয়, রূপসী সেই মনোবিমোহন প্রথম যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। গমনকালে তাহার সমস্ত সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া একটা অবর্ণনীয় তড়িদ্বৎ তরঙ্গ দেখা যাইতেছিল,—তাহা কেবল গতিশীলা, সদ্যঃস্নাতা, অনির্ব্বচনীয় সুন্দরীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদ্বর্ণ ইরানী গালিচার প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যুবতী সহসা তাহার এককোণে লুটাইয়া পড়িল, সেই কোণটা বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, তাহা মস্তকে রাখিল, হৃদয়ের উপরে স্থাপন করিল এবং অবশেষে পুনর্ব্বার চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া যুবতী সেই জীর্ণ অশ্বত্থের একটা উচ্চ মূলে উপবেশন করিল, এবং অস্ফুট স্বরে গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। অস্ফুট স্বর ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।—

"ও মেরে পিয়ারে।
কভি না মিটি মেরি নয়নাকো পিয়াস,
ময় না ছোড়ে তেরি দরশনকে আশ।
বিত গয়ে কিতি দিবস রজনী,
বিত গয়ে মাহ্ সাল।

বিত গয়ে মেরে রূপ যৌবন
বিত গয়ে খুস হাল।
গুজরে মালিক গুজরে মুল্লুক,
গুজরে দৌলৎ মাল।

গুজর গয়ে মেরে সুখ ও দুখ,
গুজর গয়ে মেরে কাল।
সব সুখ গয়ে মেরে ও পিয়ারে—
মেরে দিল তবহুঁ নহি হোয়ে নিরাশ।"

গীত শেষ হইল। রমণী উহা পুনর্ব্বার গাহিল। সেই সময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে এক শুভ্র-বসন-পরিহিত অনিন্দ্য-গৌরকান্তি যুবা তাহার নিকটে আসিলেন। রমণী কিন্তু সঙ্গীতে ও নিজ মনোভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না। যুবা যখন গালিচার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রমণী চমকিতা হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল,—তাহার মুখ লজ্জায় অরুণ হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "আপনি—তুমি?" সম্বোধন শুনিয়া যুবা শিহরিয়া উঠিলেন। রমণী পুনরায় কহিল, "তুমি? পিয়ার, দিল,—তুমি?" যুবা দুই হস্ত পিছু হটিয়া গেলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া বাঈ, কি বলিতেছ?" "বলিতেছি কি জান, জানি? বলিতেছি যে, আমার এই ছাতির অন্দরে তোমার জন্য তখ্‌ত-তাউশ পাতিয়া রাখিয়াছি। আমার কলিজা, আমার দিন দুনিয়া, আমার দিল্‌, আমার বাদশাহ্‌—।" "মণিয়া—মণিয়া-বাঈ—কি বলিতেছ মণিয়াবাঈ? তুমি কি পাগল হইয়াছ? আমি যে তোমাকে একটা কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি!" "কাজের কথা? আমার সঙ্গে তোমার আর কি কাজ থাকিতে পারে দিলের? দেখ, মহুয়ার গন্ধে মৌমাছিগুলা পাগল হইয়া

ফুটিয়াছে,—বকুলতল ফোটা ফুল গন্ধে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ফুল কুড়াইয়া তোমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। দিলের, একবার বসিবে চল।" "ছি মণিয়া, ও কি বলিতেছ! এখনই কে আসিয়া পড়িবে,—হয় ত কে দেখিয়া ফেলিবে,—কি মনে করিবে?" "মনে করিবে? আমি তাহার সম্মুখে তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।" "রাম, রাম,—মণিয়াবাঈ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?" "সে কথা কি এতদিনে বুঝিলে জানি? যেদিন আফ্‌রাশিয়ব খাঁর তাম্বুর দুয়ারে তোমার অতুল রূপরাশির ডালি আমার নয়নপথে ধরিয়াছিলে, মণিয়া যে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার জন্য পাগলিনী হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই? এতদিন কি তোমার চোখের সম্মুখে পর্দ্দা পড়িয়া ছিল? জানি, পাটনা সহরের প্রসিদ্ধা মণিয়া-বাঈ কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে পিতা, মাতা, নাম, যশঃ, প্রথম যৌবনের রোজগার ছাড়িয়া আসিয়া, তোমার দুয়ারে কুক্কুরের মত পড়িয়া আছে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই? আউরৎ এক-মাত্র কারণে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে; এবং মণিয়া সেই-জন্যই সমস্ত ছাড়িয়াছে।" কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া, অসীম দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, সে কথা সত্যই আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি আফ্‌রাশিয়ব খাঁর ভয়ে আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছ। তুমি জান যে আমি হিন্দু, তুমি জান যে ইহা নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণের গৃহ, তুমি জান যে অনাথা আশ্রয়হীনা পরিচয়ে এ গৃহে স্থান পাইয়াছ, তুমি জান যে তুমি

যবনী, আমার অস্পৃশ্যা? মণিয়া, কাঁদিও না, কাঁদিয়া কোন ফল নাই। এ কথা যদি পূর্ব্বে বলিতে, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিতাম।” মণিয়া কাঁদিতেছিল, অসীমের উক্তির শেষাংশ শুনিয়া সে সহসা স্থির হইয়া গেল; এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল, “মেরিজান, তুমি যদি আজি মণিয়াকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ কর, তথাপি তাহার মুখে রূঢ় কথা শুনিবে না। তোমরা—পুরুষেরা এই বুদ্ধি লইয়া রাজ্য শাসন কর; অথচ বুঝিতে পার না যে, একটা মানুষ, যে ধূলি তোমার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, তাহা অঙ্গে মাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে? দিলের, জানি তুমি হিন্দু, জানি তুমি উচ্চবংশ জাত, জানি তুমি বেশ্যা-কন্যার পক্ষে দুর্লভ দেবতা—তথাপি জানি, আমি রমণী। মুহূর্ত্তের জন্য তোমার চরণপ্রান্তে আমার হীনতা, দৈন্য, ক্ষুদ্র রূপ-যৌবন সমর্পণ করিয়াও আমি সুখী। সে যে কত সুখ, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পার না দিলের! তুমি তোমার রূপ, যৌবন, ধন, মান, ধর্ম্ম, বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ফিরিয়া যাও; যবনী বেশ্যা-কন্যাকে স্পর্শ করিয়া তাহা কলঙ্কিত করিও না। যদি কখনও সময় পাও—সুখ-সম্ভার, বৈভব, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যদি কখনও সময় পাও, তাহা হইলে বর্ষবর্ষান্তে একবার স্মরণ করিও, আমার আত্মা তাহাতেই তৃপ্ত হইবে।”

মণিয়া অশ্বত্থমূল পরিত্যাগ করিল,—অসীম চিত্রার্পিতের ন্যায়

তাহার অনুসরণ করিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে মণিয়া কহিল, "আপনি কোথায় আসিতেছেন, ফিরিয়া যান।" অসীমও রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ মণিয়া?" সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মণিয়া কহিল, "বাবুসাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যান,—আমার মুহূর্ত্তের জন্য চিত্তবিভ্রম হইয়াছিল, এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে। আমি মণিয়া, পাটনা সহরের কস্‌বী, মুজরা করিয়া খাই,—এখন আমার কস্‌বী মায়ের ঘরে আবার কসব করিতে ফিরিয়া যাইতেছি। ভয় করিও না বাবু-সাহেব, আমি মরিব না। আমার জাতির কি মরণ আছে?" সহসা অসীম অগ্রসর হইয়া মণিয়ার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া, জীবন তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যখন তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোমাকে এমন করিয়া বিদায় দিব! মণিয়াবাঈ, তোমার পিতা-মাতা পাটনা সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বলিয়া বেড়াইতেছে যে, অসীম রায় তাহাদের বালিকা কন্যাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। সেইজন্য তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও। আর—আর—আর কি জান মণিয়া—এখনও পর্য্যন্ত কেহ আমাকে প্রেম-সম্ভাষণ করে নাই—তোমার—তোমার নিকট এ—এ সম্ভাষণ প্রত্যাশা করি নাই।" মণিয়া তাহার হস্তমুক্ত করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, অসীমের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার অশ্রুধারা তাঁহার পদপ্রান্ত অভিষিক্ত

করিল। রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "স্পর্শ করিলে কেন? আমার বেশ্যা জননী জীবনে যে পথ আমার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছিলাম দিলের। তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে কেন? তোমার পবিত্র স্পর্শে হীনা, যবনী, বেশ্যাকন্যা যে পবিত্রা হইয়া উঠিল! কেন তুমি আমার উদ্দেশ্য বিফল করিলে? যে দেহ তোমার পবিত্র করস্পর্শে পূত হইয়াছে দিলের, তাহা আর কামুকের পাপ করস্পর্শে কলুষিত হইবে না—তাহা উৎসর্গীকৃত শুভ্র-পুষ্পের ন্যায় চির-নির্ম্মল থাকিবে।" অসীম মণিয়ার হস্ত ত্যাগ করিলেন। মণিয়া চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিলের, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। বল, আমি কোথায় যাইব?" অসীম অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, তুমি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও।"

এই সময়ে সেই প্রভাত-সূর্য্যকিরণ-প্লাবিত সুন্দর উদ্যান মুখরিত করিয়া বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইল—

"ভাল যদি বাস নিরবধি
তবে কেন ও কালবরণ,
কুঞ্জান্তরে সারানিশি ফিরে
উষাকালে এলে গুণনিধি?"

গৈরিক-বসন-পরিহিতা এক বঙ্গদেশীয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাগ

বৈষ্ণবী আসিয়া সেই অশ্বত্থমূলে দাঁড়াইল। অসীম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় গা?" বৈষ্ণবী হাসিয়া গড় হইয়া একটা প্রণাম করিল, এবং কহিল, "ছোট হুজুর, আমাকে চিনিতে পারিলেন না, আমি যে সরস্বতী! সেই ডাহাপাড়ার ঠাকুরপাড়ায় আমার ঘর।" অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তাই ত, তুমি সরস্বতীই ত! এ দেশে কবে আসিলে সরস্বতী?" "কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি। ছোট হুজুর ভাল আছেন ত? আপনারা দুই ভাই চলিয়া আসিবার পরে, গ্রাম যেন কাণা হইয়া গিয়াছে। কবে দেশে ফিরিবেন হুজুর?" "দেশে যে কবে ফিরিব সরস্বতী, বলিতে পারি না; কখনও ফিরিব কি না সন্দেহ!" "সে কি কথা! অমন কথা মুখে আনিতে নাই। আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আপনার ধন-দৌলৎ, আপনি কাহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন?" "সে অনেক কথা সরস্বতী! তুমি কোথায় যাইবে?" "বৈষ্ণবের মেয়ে আর কোথায় যায় হুজুর? বয়স হইয়াছে,—দেশে আপনার বলিতে বড় কেহ নাই, সুতরাং বৃন্দাবনে চলিয়াছি! আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে এতদূর আসিয়াছি। মদনমোহন যদি টানেন, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবন অবধি পৌঁছিব।" "এতটা পথ কি

করিয়া চলিবে ?" "কেন, পায়ে হাঁটিয়া ?" "দিন গুজরান হয় কি করিয়া ?" "ভক্ত জন দেখিলে নাম শুনাই,—প্রভু যেদিন যাহা জুটান, তাহাই খাই। যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই রাত্রি কাটাই। অন্য কোনও উপায় নাই।" "ভাল কথা, আমাদের সন্ধান পাইলে কোথায় ?" "শুনিলাম, এইখানে একজন বাঙ্গালী আমীর আছেন। ভাবিলাম, আর কিছু হউক না হউক, একবেলার অন্ন ত জুটিতে পারে!" "বাঙ্গালী আমীর! এটা ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাসা।" "ওমা তাই বুঝি! তবে এ বেলা এইখানেই প্রসাদ পাইব।" "তুমি অন্দরে যাও,—সম্মুখে পূজার ঘরে দুর্গাকে দেখিতে পাইবে।"

সরস্বতীও তাহাই প্রার্থনা করিতেছিল,—অনুমতি পাইয়াই সে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। অসীম যতক্ষণ সরস্বতীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন, ততক্ষণ মণিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, তুমি কখন যাইবে ?" মণিয়া কহিল, "এখনই।" "চল, আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।" "আপনাকে আর ঝুট্ মুট তক্‌লিফ দিব না, আমি একাই যাইতেছি।" "তোমার একা যাওয়া উচিত নহে; কারণ, তোমাকে প্রায় সমস্ত সহরটা ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। পাটনা সহর, সুতরাং সকাল হইলেও নিরাপদ নহে।" "কোন চিন্তা নাই। পাটনা সহরের কোন লোক মণিয়ার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবে না—সে করে কেবল দিল্লী ও আগরার লোক। যাইবার পূর্ব্বে একটা কথা নিবেদন করিয়া

যাই বাবু সাহেব, যদি কখনও সহসা তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই, অথবা যদি দেখিতে পাও, যেখানে আমার উপস্থিত থাকিবার কথা নহে সেখানেও আমি উপস্থিত আছি, তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না।" "কথাটা বুঝিলাম না মণিয়া!" "বাবু সাহেব, এই সপ্তাহকাল তোমাকে নিরবধি দেখিতে পাইতেছি,—হয় ত মধ্যে মধ্যে চোখের দেখা দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিব না,—মনের বল, দেশকাল-পাত্রের বিবেচনা ভাসাইয়া দিয়া, তুমি যেখানে আছ দিলের—, বাবু সাহেব, সেইস্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। তুমি ভয় পাইও না, তোমার জাতি বা বংশমর্য্যাদার কোন হানি হইবে না।" "লজ্জা দিও না, মণিয়া, আমি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিব, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট আসিও। যদি বাদ্‌শাহের দরবারে থাকি, তথাপি আসিও। কিন্তু তুমি একা যাইতে পারিবে না; চল আমি তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।" "ঐটি মাফ্ করিও। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একাই যাইতে হইবে। দোহাই তোমার দিলের,—মাঝে-মাঝে ঐ সম্বোধনটা এখনও আসিতেছে; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের একমাত্র ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিতেছি, কাল হইতে আর আসিবে না।"

মণিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া রাজপথ অবলম্বন করিল; এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইল যে, একখানা তাঞ্জামে বসিয়া এক মুসলমান যুবা সহর হইতে ফিরিতেছে।

সে তাঞ্জামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহকদিগকে কহিল, "রাখো" আরোহী তাহার মুখের দিকে চাহিলে, সে মস্তকের অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিয়া কহিল, "ফরীদ, তাঞ্জাম হইতে নাম্।" তাহার মুখদর্শন করিয়া ফরীদ এক লম্ফে তাঞ্জাম পরিত্যাগ করিল; এবং মণিয়ার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "মণিয়া জান্, সমস্তই খোদার কেরামতী! আমার জানটা যেন এতদিন কলিজার খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছিল। রহমৎউল্লাহ, জানি, বল, তুমি আজি আমার মজলিস্ গুলজার করিবে?" "যাইব,—কিন্তু দুই দণ্ডের অধিক থাকিতে পারিব না ভাই!" "সেটা কি কথার কথা মাশুকা?" "শোভান্ আল্লা! ও-নাম করিও না,—আমি নেকা করিয়াছি।" "তোবা, তোবা, —ঝুট্ বলিও না। এই প্রথম যৌবনের হাজার মজা ছাড়িয়া, তুমি কেন নেকা করিতে যাইবে মণিয়া জান্? যাহার নাক নাই, যাহার কাণ নাই, যাহার কোমর বাঁকা, যাহার যৌবনের আফ্‌তাব ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহারা গিয়া বিশটা করিয়া নেকা করুক। মণিয়াজান্, তুমি পাটনা সহরের আঁধারের রোশনি, সুবাবিহারের বুলবুল। তোমায় কয়দিন না দেখিয়া আমি ফকীরী লইতেছিলাম।" "দেখ্ ফরীদ্! পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পাগলাম করা ভাল নয়। যদি বেশী গোলমাল করিবি, তাহা হইলে তোর মজলিসে যাইব না। তোর তাঞ্জামটা একবার ছাড়িয়া দে, আর আমাকে একবার মহেন্দ্রুতে লইয়া চল্।" "কি ভাই, আশনাই?" "ঝাড়ু মারি আশনাইয়ের

মুক্তে! দুনিয়ায় আসিয়া বহুৎ আশনাই করিলাম, এখন দিনকতক পরকালের কথা ভাবিতে দে।"

মণিয়া তাঞ্জামে আরোহণ করিল এবং মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। ধনী-সন্তান ফরীদ্ খাঁ তাহার নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। মহেন্দ্রু পাটনা সহরের অদূরে অবস্থিত। তখন এই অঞ্চলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিত। মহেন্দ্রুর নিকটে আসিয়া মণিয়া ফরীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফরিদ্ ভাই, তোর সঙ্গে কোন হিন্দু ফকীরের আলাপ আছে?" ফরীদ বিস্মিত হইয়া কহিল, "তোবা, তোবা! হিন্দু ফকীর কি করিবে মণিয়াজান্?" "আমার খসম্‌টা নেকা করিয়া বিগ্‌ড়াইয়াছে,—তাহাকে বশ করিবার ঔষধ মাগিতে যাইব।" "তোমার খসম্ বিগ্‌ড়াইয়াছে? মণিয়াজান্, না জানি পাটনা সহরের বাকী আউরৎগুলার খসম্ কি অবস্থায় থাকে!" "তাহারা এলাজ শিখিয়া রাখিয়াছে! আমার ত এতদিন খসম ছিল না, সুতরাং এলাজের জরুরৎও ছিল না।" "তোবা, তোবা। মণিয়াজান্, তোমার খসম হয় পাগল, নয় দেওয়ানা।" "সে কথা ছাড় ভাই,—আমাকে একজন হিন্দু ফকীরের নিকট লইয়া চল।"

মহেন্দ্রুতে একটা পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে একদিকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা এবং অপর দিকে ফকীরেরা বাস করিত। সন্ন্যাসী ফকীর নিত্য আসিত, যাইত; তথাপি, সেই প্রাচীন পুষ্করিণীর উভয় তীর সর্ব্বদা সন্ন্যাসী-ফকীরে পরিপূর্ণ থাকিত।

পুষ্করিণীর অদূরে তাঞ্জাম ও ফরীদ খাঁকে রাখিয়া মণিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইল। পুষ্করিণী-তীরে এক প্রাচীন তিন্তিড়ী-মূলে বৃহজ্জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী ধূনি জ্বালিয়া বসিয়া ছিলেন,—মণিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" সন্ন্যাসী তাহার বেশভূষা দেখিয়া কহিলেন, "পহেলে সেবা লাগাও!" মণিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি সেবা লাগাইব বাবা?" সন্ন্যাসী স্মিতবদনে কহিলেন, "দো-চার রোজ হাম্‌কো ভজন তো করো।" মণিয়া বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

নিকটে আর এক বৃক্ষতলে জনৈক অসংযত যুবা ব্রহ্মচারী নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তাহার প্রথম-যৌবন স্পর্শে বিকশিত কমনীয় কান্তির প্রতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিয়া ছিল। মণিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" যুবা সাগ্রহে কহিল, "একঠো কেঁও, বিশঠো পুছো, হাজারঠো পুছো। লেকেন বয়ঠো—" মণিয়া বিরক্ত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। একে একে সকল সন্ন্যাসীকে দূর হইতে দেখিয়া, সে অবশেষে পুষ্করিণীর এক কোণে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার যদি অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে অন্য সময়ে আসিও।" মণিয়া উত্তর শুনিয়া বুঝিল যে, এই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; সুতরাং সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী রজতমুদ্রা বাহির করিয়া ব্রহ্মচারীর

পদপ্রান্তে রাখিল। ব্রহ্মচারী তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "অর্থ দিলে প্রশ্নের উত্তর পাইবে না।" মণিয়া লজ্জিতা হইয়া টাকাটি উঠাইয়া লইল; এবং প্রণাম করিয়া দূরে বসিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "মায়ি, বলিয়াছি ত, অধিক কথা বলিবার সময় এখন নাই,—দুইএকটা কথা এখন যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লও।" মণিয়া থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমি বেশ্যাকন্যা,—কিন্তু আমার পিতা মুসলমান।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মণিয়া থামিল; কিন্তু ব্রহ্মচারী কথা কহিলেন না। তাহা দেখিয়া মণিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবা, আমি কি হিন্দু হইতে পারি?" ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যদি উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া হিন্দু হইতে চাও, তাহা হইলে এখনই হইতে পার।" মণিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া?" "শরীর, মন আর কথায় হিন্দুর অনুকরণ করিও,—মুসলমানের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিও। ইহা যদি পার, পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও,—এখন যাও।" মণিয়া উঠিল। তাহার যৌবন-মাধুরী মণ্ডিত দেহের লালিত্য-দর্শনলোলুপ বিংশতিযুগল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নয়ন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুষ্টগ্রহ

মণিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া গেল, তখন বড়বধূ রন্ধন করিতেছিলেন। সহসা গৃহের প্রাঙ্গনে কে বলিয়া উঠিল, "জয় রাধে কৃষ্ণ, বৌ-ঠাক্‌রণ ভিক্ষে দাও গো!" পাটনা শহরে মুরশিদাবাদের গ্রাম্য উচ্চারণ ও খাঁটী বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বড়বধূ চমকিতা হইলেন। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন দীর্ঘ রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীহস্তে, নামাবলী অঙ্গে, গতযৌবনা সরস্বতী বৈষ্ণবী অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। বড়বধূ রন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সরস্বতীকে ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "ওমা, সরস্বতীই ত। তুমি এদেশে কবে আসিলে? এস, এস, বস বস।" সরস্বতী উপরে উঠিয়া রন্ধনশালার দুয়ারে বসিল এবং কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি।" "কোথায় যাইবে সরস্বতী দিদি?" "বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের মেয়ে বুড়া হইলে আর কোথায় যায় বল?" "একেবারে মায়া কাটাইলে?" "আমার কে আছে বল বৌ-ঠাক্‌রণ, যাহার মায়ায় আমি ঘরে আট্‌কাইয়া থাকিব? বুড়া হইয়াছি, গলা বেচিয়া খাইতাম, তাহাও বুজিয়া আসিতেছে। মুরশিদাবাদে ভিক্ষা মেলা দুষ্কর। তাই মনে করিলাম বৃন্দাবনে যাই; গোবিন্দজী মদনমোহনের দুয়ারে পড়িয়া থাকি। দুর্গাদিদি কোথায় গা?" অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুর্গাঠাকুরাণী অতি ধীরে সরস্বতীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সরস্বতী

তাহা জানিতে পারে নাই। তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তবু ভাল, এতক্ষণে দুর্গাকে মনে পড়িয়াছে!" সরস্বতী পিছন ফিরিয়া, জিহ্বা কর্তন করিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "ও মা, সে কি দিদি, সে কি কথা! তোমায় কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তোমায় কি ভুলিতে পারি? তুমি যে আমার নয়নমণি। কেমন আছ দুর্গাদিদি?" "আছি আর কেমন বল দিদি? ভগবান যেমন রাখিয়াছেন তেমনই আছি।"

সরস্বতী দেখিল যে ডাহাপাড়া পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাঠাকুরাণীর কোনই পরিবর্তন হয় নাই। সে অতিশয় বুদ্ধিমতী, সুতরাং সহজেই মনের ভাব গোপন করিতে পারিল। ডাহাপাড়া গ্রামে নবীন নাপিতের নিকটে এবং অন্যান্য লোকের মুখে সে দুর্গাঠাকুরাণীর বিষয়ে ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গ্রাম পরিত্যাগ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই কাল্পনিক বুঝিতে পারিয়া সরস্বতী অত্যন্ত সাবধান হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল যে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বিধবা কন্যা অসীমের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার সহিত দেশত্যাগিনী হইয়াছে, বিধবার বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সধবা সাজিয়াছে এবং বাঙ্গালাদেশের ভদ্রমহিলার অলঙ্কার—লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৎ আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে দেখিল যে বিদ্যালঙ্কারের কন্যার শীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট দেহে বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। বাঙ্গালা দেশের সধবার কোন চিহ্নই তাঁহার অঙ্গে উঠে নাই এবং প্রগল্‌ভতার ছায়ামাত্র তাঁহার আচরণে দেখিতে পাওয়া যায় না,

সুতরাং সরস্বতী অবস্থা বুঝিয়া সুর পরিবর্ত্তন করিল। সে কহিল, "তা ত বটেই দিদি, তা ত বটেই! এতদিন বাদে দেখা হ'ল, একটা কথা ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়—কি আর জিজ্ঞাসা করি বল? মুখপোড়া ভগবান কি আর তোমাকে মানুষ রাখিয়াছে? ঠাকুর কোথায়?" "তিনি পূজায় বসিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এখনও যে রকম আছে, তাহাতে তিনি যে ডাহাপাড়ার কোন লোকের সহিত দেখা করিবেন, আমার ত তাহা মনে হয় না। তুমি দুঃখ করিও না সরস্বতী, ইদানীং বাবা যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছেন।" "হবারই ত কথা দিদি, মানুষের প্রাণে আর কত সয়? এই আমাকে দিয়াই দেখ, অনেক দুঃখে পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি দিদিঠাকুরণ।"

এই সময়ে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে এক দীর্ঘাকার যুবা গৃহের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়বধূ মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। সরস্বতী বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যুবা কহিলেন, "নি সাসা, গা মা পা। বোষ্টমদিদি যে, বল দেখি কি গাহিতেছি?" প্রশ্ন শুনিয়া বড়বধূ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে জনান্তিকে বলিয়া উঠিলেন "রকম দেখিয়া গা জ্বলিয়া যায়! সময় নাই, অসময় নাই, কেবল গান, কেবল গান, কেবল গান। মানুষটা এতটা পথ আসিয়াছে, তাহাকে কোথায় আদর-অভ্যর্থনা করিবে, বসিতে বলিবে, না কি গাহিতেছি বল, কি গাহিতেছি বল, কি গাহিতেছি বল?" সুদর্শন হাসিয়া কহিলেন, "রাগ কর কেন? যাহার যাহা বাতিক;

—তোমরা পাঁচজনে বসিলে যেমন শুক্তানির পাঁচ রকম ফোড়নের পঁচিশ রকম আলোচনা হয়, আমাদেরও তেমনই এক-পেশার লোক দেখিলে সেই কথাই কহিতে ইচ্ছা করে।”

বড় বধূ। এইবার শুক্তানি খাইতে আসিও ঠাকুর!

দুর্গা। রাগ করিস্ কেন ভাই, দাদা ত ভাল কথাই বলিয়াছে?

বড়। আহা, বোনটি যেন ভাইয়ের জোড়া!

দু। মুখে আগুন।

সু। ভাল জ্বালা, বলি সরস্বতী দিদি, আসিলে কবে? নি, সা সা, গামাপা।

বড়। দেখিলি ভাই, সাধ করিয়া বলি, ঢঙ দেখিয়া অঙ্গ জ্বলিয়া যায়?

সুদ। ও মাগীর কথায় কাণ দিওনা সরস্বতী দিদি!

সর। কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি।

সুদ। চলিয়াছ কোন্ পথে?

সর। বৈষ্ণবী বুড়া হইলে যে পথে যায়—শ্যামচাঁদের শ্রীবৃন্দাবনে।

সুদ। নিসাসা, গামাপা। সুরটা জমিয়াছে মন্দ নয়! বোষ্টম দিদি, বল দেখি কি?

বড়। না ভাই ঠাকুর-ঝি তুই বস্, আমি উঠিয়া যাই।

সুদ। রাগ কর কেন গো? তোমার শুক্তানি, মাছের ঝোল যেমন জমে, গানও তেমনি জমে। সরস্বতী দিদি, তোমার মত

গুণীলোক মেয়েমানুষের মধ্যে অতি অল্পই দেখিয়াছি। বল দেখি সুরটা কি?

সর। দাদাঠাকুর, গানটা আর একবার গান।

সুদ। নি সা সা, গা মা পা, পা, পা, পা, পা, সা, মামা, মামা, গা মামা, গা মামা, গা রে সা, রে, রে নি, সা সা, গামাপা।

সর। ভীম-পলশ্রী।

সুদ। তুমি না হইলে এমন কথা কে বলে বৈষ্ণবী দিদি? আজ সকাল হইতে সুরটা মাথার ভিতর ঢুকিয়াছে। মণিয়াবাঈ কোথায় গেল দুর্গা?

বড়। সে গুড়ে বালি। চিড়িয়া ফুড়ুৎ।

দুর্গা। দাদা, মণিয়া এই মাত্র বলিয়া গেল যে সে বাপের বাড়ী যাইতেছে।

সুদ। একাই গেল?

দুর্গা। হাঁ, বলিয়া গেল সে ছোটদাদার অনুমতি লইয়াছে। কর্ত্তার সহিত দেখা করিতে চাহিল না, বলিল, সে পাটনা ছাড়িয়া এখন অন্যত্র যাইবে না, আর একদিন আসিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবে।

সুদ। আপদ গেল, বাঁচা গেল।

বড়। আমি ভাবছিলাম, সংবাদ শুনিয়া তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে।

সুদ। ছুঁড়ীটার গলার আওয়াজটি বড় মিঠা, কিন্তু আর সমস্তই বদ্। গিয়াছে—বাঁচিয়াছি। ছোট রায়টার জন্য

রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হইত না। সেটা আবার কোথায় গেল ?

বড়। দেখ-দেখ, হয় ত মণিয়া আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

সুদ্। সর্ব্বনাশ! ঠাট্টা নহে, সরস্বতী দিদি, তুমি যে ক'দিন পাটনায় থাকিবে, আমাদের বাড়ীতেই থাকিও, আমি ছোট-রায়ের সন্ধানে চলিলাম।

সুদর্শন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া সরস্বতী দুর্গাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাঠাকুর কোথায় যান ?" দুর্গা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বড়বধূ হাসিয়া কহিলেন, "ও আমার পোড়া কপাল! তা বুঝি জান না বোষ্টম দিদি ? ঠাকুরটি পাটনায় আসিয়া অবধি এক বাঈজীর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু। ছোটরায়ের নাম করিয়া নিজে কেবল তাহার পিছু-পিছু ঘুরিতেছেন।" দুর্গাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, "মুখে আগুন তোর পোড়ারমুখী! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের নামে বৃথা অপকলঙ্ক দিতেছিস্, তোর যে মহাপাতক হইবে ?" বধূ হাসিয়া ননন্দাকে কহিলেন, "হউক আমার মহাপাতক, তাহার অর্দ্ধেক ত ব্রাহ্মণেই পাইবে ?"

সরস্বতী ভিতরের কথা বুঝিতে না পারিয়া কোন কথা কহিল না, সে নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "সে মণিয়াবাঈ কি জাত গা" বড়বধূ হাসিয়া কহিলেন, "এইবার ঠকাইয়াছ বোষ্টম দিদি!" বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" "বাঈজীর কি জাতি আছে ?"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ময়ূর সিংহাসনের পথে

বিক্রমাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাটনা নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি লা-ওয়ারিস প্রাচীন আম্রকানন ছিল। সরকারী কাগজপত্রে তাহার নাম ছিল আফ্‌জল্ খাঁর বাগিচা, কিন্তু আফ্‌জল্ খাঁ কে ছিল এবং কবে বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। বাগানটির প্রকৃত মালিক ছিল পল্লীর বালক-বৃন্দ; কারণ তাহারাই উহার ফল ভোগ করিত,—অবশ্য পক্ক হইবার বহুপূর্ব্বে এবং বিনা লবণে। হিজরার ১১২৪ অব্দে আফ্‌জল্ খাঁর বাগিচা সহসা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ শাহজাদা ফরুখ্‌সিয়র, মুরশিদাবাদ হইতে শাহজহানাবাদ পর্য্যন্ত কুচ্ করিতে করিতে পাটনায় আসিয়া, এই উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া একস্থানে খাটান থাকায় তাম্বুগুলি মলিন হইয়া গিয়াছিল, দুই একটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, সমস্ত শিবিরটা যেন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে একদিন প্রভাতে জনৈক খর্ব্বাকার যুবা সেই শিবিরের একপ্রান্তে একটি সহকার-তরুতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। অর্দ্ধদণ্ডপরে একজন সওয়ার আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "তিনি তাম্বুতে নাই।" যুবা পাদচারণ পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রায়জীকে অনুসন্ধান করা তোমার কার্য্য নহে, একজন হিন্দু সওয়ার পাঠাও।" সওয়ার অভিবাদন

করিয়া চলিয়া গেল এবং যুবা পুনরায় পাদচারণ আরম্ভ করিলেন।

সরস্বতী বৈষ্ণবী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পরে, অসীম দ্রুতপদে উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে মণিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; কিন্তু মণিয়ার কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন পথে লোকজন চলিতেছিল না সুতরাং তিনি কাহারও নিকট কোনও সন্ধান পাইলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে তিনি ক্রমশঃ মণিয়ার মাতার গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ পাঠান তখন ফরসীটা হস্তে লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খাঁ সাহেব, মণিয়া বাঈ কি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে?" বৃদ্ধ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "বদ্‌বখ্‌ৎ, আমি কি তোমার উপহাসের পাত্র? আমার যদি উপযুক্ত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিত।" অসীম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, আমার অপরাধ মাফ্ করিবেন। আমি আপনার সহিত পরিহাস করি নাই। মণিয়া কি সত্যসত্যই গৃহে ফিরে নাই?" "কথায় বিশ্বাস না কর, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পার।" "তবে সে কোথায় গেল?" "সে কথার জবাব তুমি ভিন্ন আর কেহ দিতে পারিবে না।" "ঈশ্বরের দোহাই খাঁ সাহেব, মণিয়া আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া

আসিয়াছে।” “তবে বোধ হয় তাহার, তোমার মত আর একজন খুবসুরৎ খরিদ্দার জুটিয়াছে।” “তোবা তোবা, ঈশ্বরের দিব্য খাঁ সাহেব, আমি মণিয়ার খরিদ্দার নই।” অসীম এই বলিয়া পাঠানের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে গৃহান্তর হইতে বৃদ্ধ রুস্তম্‌দিল্‌ খাঁ কম্পিতপদে হুঁকা-হস্তে গুল্‌শের খাঁর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বলি, কি হে গুলশের খাঁ! দামাদ কি দিয়া গেল?” প্রশ্ন শুনিয়া গুল্‌শের খাঁ জ্বলিয়া উঠিল; কহিল “এই কাফের যদি আমার দামাদ হয় তাহা হইলে আমি যেন কখনও আর দোজখের বাহিরে না আসি।” কসম্‌ শুনিয়া দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, “তোবা তোবা, করিলে কি? কস্‌বীর গর্ভজাত কন্যার জন্য এত বড় একটা কসম্‌ খাইয়া ফেলিলে? যে রকম দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে ওরকম একটা মানুষ হাতে থাকিলে অনেক উপকার হয়। বলি খবরটা শুনিয়াছ কি?” গুল্‌শের খাঁ বিষণ্ণ বদনে কহিল, “খবর আর কি শুনিব? মণিয়া বোধ হয় ঐ হারামখোরকে ছাড়িয়া অপর কোথাও চলিয়া গিয়াছে।” রুস্তম্‌দিল্‌ খাঁ তাহার দন্তহীন বদন ব্যাদান করিয়া কহিল, “আরে না না, সে খবর না, এই বুড়ী কস্‌বীটা তোমাকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে যে, আর কোন কথাই তোমার মাথায় প্রবেশ করিবে না। বলি নূতন খবরটা শুনিয়াছ?” “আবার কি খবর?” “শোভান্‌ আল্লা! বাদশাহ আজীম্‌ উশ্‌শান যে ফৌৎ! নূতন বাদ্‌শাহ জহাঁদার শাহ আর তিন ভাইকে

ফতে করিয়া দিল্লী আসিতেছেন।” “জহান্নমে যাক্।” “দেখ গুল্‌শের খাঁ, তোমার ঘটে একবিন্দুও বুদ্ধি নাই। তোমার যে মরশুম্ পড়িয়াছে হে! বুঝিতেছ না, ফররুখ্‌সিয়রকে হয় মরিতে হইবে না হয় লড়িতে হইবে। ফর্‌রুখ্‌সিয়র যদি লড়াই ফতে করে?” “তাহাতে আমার কি?” “আরে আহম্মক্, তোর কন্যা যে উজীরের বেগম হইবে।” “তোবা তোবা!”

সেই সময়ে পথ দিয়া একজন সওয়ার নক্ষত্র বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর দিকে চলিয়াছিল। সে এই বৃদ্ধদ্বয়কে দেখিয়া সহসা ঘোড়া থামাইল; সুন্দর বলবান আরববংশীয় অশ্ব আকর্ষণের বেগে পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সওয়ার জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব, এই পথ দিয়া একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার যুবককে যাইতে দেখিয়াছ?” গুল্‌শের খাঁ মুখ ফিরাইয়া রহিল; তাহার প্রশ্নের জবাব দিল না; কিন্তু রুস্তম্‌দিল্ খাঁ তাহার দশন-বিহীন, লোলচর্ম্ম বদন ব্যাদান করিয়া কহিল, “হাঁ দেখিয়াছি, তুমি নূতন বাঙ্গালী আমীর রায়জী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কি?” সওয়ার তাহার উত্তর শুনিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল; সে সানন্দে বলিয়া উঠিল, “হাঁ, তিনি কোন্ পথে গেলেন বলিতে পার?” রুস্তম্‌দিল্ খাঁ অসীম যে পথে গিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিল, সওয়ার একটা নূতন টাকা ফেলিয়া দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ টাকা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে বাজাইতে সওয়ার অসীমকে ধরিয়া ফেলিল! সে ঘোড়া হইতে নামিয়া অসীমকে

কহিল, "জনাব, জোর তলব, আপনি আমার ঘোড়া লইয়া যান, আমাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।" অসীম তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার মনে তখন মণিয়ার চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সে কোথায় গেল, পিতৃগৃহে ফিরিল না কেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বিরক্তি দমন করিয়া তিনি সওয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোর তলব কেন বলিতে পার, কিঞ্চিৎ বিলম্বে গেলে হইত না?" সওয়ার সাগ্রহে কহিল, "হুজুর, দিল্লী হইতে সওয়ার আসিয়াছে। সে বোধ হয় কোন দুঃসংবাদ আনিয়াছে, কারণ আমি জন্মে কখনও শাহ্‌জাদাকে উতলা হইতে দেখি নাই।"

অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও মনোবেগ দমন করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন; এবং নিমেষের মধ্যে শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই খর্ব্বাকৃতি যুবা তখনও সহকারতলে পাদচারণা করিতেছিলেন—তিনি অসীমকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তুমি আসিয়াছ? বাঁচিলাম! বন্ধু আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমার দুঃসময়ে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ!" অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুঃসময় কেন শাহ্‌জাদা?" "আর কি, সমস্তই শেষ! সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বাদ্‌শাহীর স্বপ্ন—সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। দিল্লী হইতে সওয়ার আসিয়াছে; পিতা নিহত, জহাঁদারশাহ ময়ূরসিংহাসনের অধিকারী।" অসীম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "শাহজাদা, ইহা অধীর হইবার সময় নহে। প্রকাশ্য

রাজপথে দাঁড়াইয়া এ সকল কথার আলোচনা করা উচিত নহে,—তাম্বুর ভিতরে চলুন।”

উভয়ে বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অসীম ফররুখ্‌সিয়রের মুখে লাহোরের যুদ্ধের ফল শুনিলেন। সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া অবশেষে ফররুখসিয়র কহিলেন, “বন্ধু, আজি বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকিয়াছি; কারণ, আমি আর রাজপুত্র নহি,—হিন্দুস্থানের পথের ভিখারীও আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। এখনও আমার চারিদিকে রাজপুত্রের যোগ্য সাজসজ্জা আছে বটে, কিন্তু আমার প্রকৃত অবস্থা কি জান? আমি হয় ত আফরাশিয়ব খাঁর বন্দী। এই মুহূর্ত্তে কে হয় ত একমুষ্টি স্বুবর্ণ-মুদ্রার জন্য আমার ছিন্নশির জহাঁদার শাহকে নজর পাঠাইয়া দিবে। বন্ধু, আজি প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর,—আমার কন্যাটির ভার লও—আর আমার কেহ নাই।” অসীম ধীরে-ধীরে কহিলেন, “শাহজাদা, আপনি কি করিবেন?” “ভাবিতেছি, ফকীরী লইয়া আসামে কি আরাকাণে যাইব।” “শুজার পরিণাম স্মরণ আছে?” “সেইজন্যই ত তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার কন্যার ভার লও।” “শাহজাদা, বিনা আয়াসে বিনা চেষ্টায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইবেন? ইহা কি পুরুষোচিত কার্য্য হইবে?” “কি করিব বল, আজীম উশ-শান্‌ বাদ্‌শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন; ধনবল, সৈন্যবল, বুদ্ধিবল সমস্তই তাঁহার ছিল। কিন্তু আমি বুদ্ধিহীন, সৈন্যহীন, ধনহীন; জহাঁদার সিংহাসনে উপবিষ্ট। আমি কি লইয়া দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইব? সুবাদারী ফৌজ প্রায় বিদ্রোহী। শিবিরে কয়জন আহদী আছে? আহমদ্‌বেগ বলিতেছিল যে, মুরশিদাবাদের টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে।" ফররুখসিয়রের উক্তি শেষ হইলে অসীম প্রায় একদণ্ডকাল অধোবদনে চিন্তা করিলেন। পরে ধীরে-ধীরে কহিলেন, "শাহজাদা, ধনহীন, বুদ্ধিহীন, বলহীন জহাঁদার শাহ যদি সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে আপনি কেন পারিবেন না?" ফররুখ্‌সিয়র কহিলেন, "রায়জী, তুমি জান যে, স্বয়ং আসদ্‌খাঁ ও তাঁহার পুত্র জুল্‌ফীকার খাঁ জহাঁদার শাহের পৃষ্ঠপোষক?" "তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আসদ্‌ খাঁ বা জুলফীকার খাঁ অপেক্ষাও যোগ্যতর লোক পাওয়া যাইতে পারে। শাহজাদা, ফকীরীতে আর মৃত্যুতে অধিক প্রভেদ নাই। মৃত্যুর পরে যাহা হয় তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান বুদ্ধির অগম্য। মৃত্যুই যদি শেষ, তাহা হইলে মৃত্যু ত যে কোন সময়েই আলিঙ্গন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?" "কি চেষ্টা করিব রায়জী?" "আপনার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবর্ত্তমানে আপনি সিংহাসনের অধিকারী। চেষ্টা করিয়া দেখুন; যদি ফল না হয় তখন ফকীরীত আছেই।" "রায়জী, এই পাঁচশত আহদীর ভরসায় তুমি আমাকে জুলফীকার খাঁর সম্মুখীন হইতে বল?" "বাদশাহ! পাঁচশত পাঁচলক্ষ হইতে অধিকক্ষণ লাগে না।"

ফররুখ্‌শিয়র সেই জীর্ণ, ছিন্ন, বস্ত্রাবাসের মধ্যে বসি

বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। প্রায় দুইদণ্ড অতিবাহিত হইল। তখন ফররুখ্‌শিয়র সহসা বলিয়া উঠিলেন, "রায়জী, তোমার কথাই সত্য,—আমি মৃত্যুর ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। হয় সিংহাসন, না হয় মৃত্যু—ফররুখ্‌সিয়রের তৃতীয় পন্থা নাই। আমি অন্দরে চলিলাম। মাতার নিকট আরও দুই হাজার আশরফী আছে, তাহা দিয়া সুবাদারী ফৌজ বশ করিতে হইবে। তুমি শিবির ছাড়িয়া অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিও না।"

তখন ফররুখ্‌শিয়র ময়ূর-সিংহাসনের এবং অসীম মণিয়ার সন্ধানে নির্গত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অসীম

মণিয়া ফিরিয়া আসিল। অসীম চলিয়া যাইবার এক-প্রহর পরে ফরীদ খাঁ তাহার তাঞ্জামে করিয়া মণিয়াকে তাহার পিতৃ-গৃহে দিয়া গেল। মণিয়ার মাতা বিস্মিতা হইয়া দেখিল যে, তাহার কন্যা পায়জামা ছাড়িয়া সাড়ী পরিয়াছে, সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার উপার্জ্জনা-ক্ষমা কন্যা গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। মণিয়া আমিষ আহার পরিত্যাগ

করিয়াছিল; গৃহে ফিরিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিল, তাহাতেও তাহার মাতা কিছু কহিল না। সন্ধ্যাবেলায় ফরীদ্ খাঁ যখন মণিয়াকে লইতে আসিল, তখন সে যথাযোগ্য বেশ-ভূষা করিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া মণিয়ার মাতা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল,—পাড়ার দরগায় গিয়া পীরের পূজা দিয়া আসিল এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

শিবির পরিত্যাগ করিয়া অসীম পুনরায় মণিয়ার সন্ধানে বহির্গত হইলেন। ভূপেনের আদেশে, অসীম যতক্ষণ ফররুখসিয়রের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, নবকৃষ্ণ ততক্ষণ শিবিরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। অসীম বাহির হইলে সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "হুজুর, খাবার তৈয়ারী।" কথাটা সে এত অধিক বিনয়ের সহিত কহিল যে, তাহা মণিয়ার চিন্তা-গ্রস্ত অসীমের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তাহা দেখিয়া নবকৃষ্ণ স্বর একটু মধ্যমে চড়াইয়া কহিল, "হুজুর?" চিন্তাস্রোত বাধা পাইল; ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাহ?" নবকৃষ্ণ সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, "হুজুর, খাবার তৈয়ারী।" অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ছোট হুজুরকে খাইতে বল, আমি এখন খাইব না।" অসীম সেস্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর?" "আবার কি?" "ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী খাইবেন কি?" "ঠাকুর মহাশয় জাহান্নমে যাউক।" অসীম এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নবকৃষ্ণ বড়ই চতুর ভৃত্য। অসীম সে স্থান ত্যাগ করিলেও সে প্রায় অৰ্দ্ধদণ্ড সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিল, হুজুরের লক্ষণ সুবিধার নহে। বাঈজীটি আসিবার পর হইতে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং শীঘ্র এই রোগের প্রতীকার না করিলে ফল গুরুতর হইবে। তিনজন লোককে এখনই সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম ছোট হুজুর, দ্বিতীয় সুদর্শন ঠাকুর এবং তৃতীয় দুর্গাঠাকুরাণী। এই কথা ভাবিয়া নবকৃষ্ণ তাম্বুতে ফিরিয়া গেল, এবং ভূপেন্দ্রকে জানাইল যে, হুজুর বলিয়া গেলেন, তিনি আহার করিবেন না, ছোট-হুজুর যেন একা আহার করেন এবং ঠাকুর মহাশয় জহান্নমে যাইতে পারেন। তাহার উক্তির শেষভাগ শুনিয়া ভূপেন্দ্র ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলি?" নবকৃষ্ণ করযোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, "হুজুর, আমি নিমকের চাকর, হুজুর মা-বাপ, বড়-হুজুর নিজমুখে এ কথা না বলিলে, আমার সাধ্য কি যে এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করি।" ভূপেন্দ্র তাহার জবাব শুনিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কহিলেন, "দাদাকে কি বিশেষ চিন্তিত দেখিলি?" "হুজুর প্রায় পাগলের মত। চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ, পাগড়ীটা খুলিয়া গিয়াছে, জোব্‌বার অৰ্দ্ধেকটা নাই।" "নবা, আমিও আহার করিব না। তুই তাঞ্জাম ডাক, আমি বাহিরে যাইব।"

তাঞ্জাম আসিলে ভূপেন্দ্র বাহিরে আসিলেন। শিবিরে আসিয়া তিনি যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মন অধিক-

তর উদ্বিগ্ন হইল। সকলেই ভয়ে অস্থির; একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছে না, অথচ সকলেই আপন মনে বলিয়া যাইতেছে। সকলেরই মুখে এক কথা, "কপাল ভাঙ্গিয়াছে।" কথায়-কথায় ভূপেন বুঝিতে পারিলেন যে, নবীন বাদ্‌শাহ আজীম উশ্‌-শান পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জহাঁদার শাহ ময়ূর-সিংহাসনে আসীন। ফরুখ্‌সিয়রের অনুচরবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রস্তুত; সকলেই বলিতেছে যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। কেবল দুই একজন সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে বাদ্‌শাহ্‌ সম্বোধন করিতেছে। ভূপেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে তাঞ্জামে আরোহণ করিয়া সুদর্শনের সন্ধানে নির্গত হইলেন।

ভূপেন্দ্র চলিয়া গেলে, নবকৃষ্ণ স্বয়ং সাজিতে বসিল। নিজের মলিন বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া, অসীমের একখানি বহুমূল্য ঢাকাই ধুতি চুনট করিয়া পরিধান করিল। পা ধুইয়া, তাহাতে অসীমের একজোড়া দিল্লীর জরিদার লপেটা আরোপ করিল একখানা কাঠের কাঁকই দিয়া তাহার দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশ তৈল [illegible] করিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া লইল। তাহার পরেই তাহার বিষম বিপদ হইল। তাহার নিকট অসীমের অনেকগুলা ঢাকাই ও বেনারসী কামদার জামা ও আচ্‌কান্‌ ছিল;—কিন্তু তাহার একটাও তাহার অঙ্গে মানাইল না। তখন সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভূপেন্দ্রের একটা পুরাতন মেরজাই সেলাই করিয়া পরিল

অসীমের একখানা বেনারসী জোড় গায়ে জড়াইল; এবং ভূপেনের একটা নূতন জোড় লইয়া পাগড়ী বাঁধিল। তাহার পর একখানা রঙ্গীন রুমালে আতর মাখাইয়া লইয়া তাম্বু হইতে বাহির হইল।

বাহির হওয়াই নবকৃষ্ণ আর এক বিপদে পড়িল তাম্বুর বাহিরে একজন আহদী দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহাকে দেখিয়া, অসীম মনে করিয়া, অভিবাদন করিল, এবং কহিল "জনাব, শাহজাদা সন্ধ্যাকালে আপনাকে তলব করিয়াছেন।" নবকৃষ্ণ ফাঁফরে পড়িল। অসীমের আদেশ-মত এই সংবাদ লইয়া তাম্বুতে অপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু অপেক্ষা করিলে বেশ-ভূষা ছাড়িতে হয়; তাহা না হইলে ধরা পড়িয়া প্রহার ভোগ করিবার সম্ভাবনা। আবার এমন বেশ-ভূষা লইয়া পাটনা সহরে বাহির হইবার আশা অতি অল্প। নবকৃষ্ণ অনেক দিন ধরিয়া বাজারে এই ময়ূর পুচ্ছে সজ্জিত হইয়া বেড়াইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। অনেক চিন্তা করিয়া সে পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহাকে তাম্বুর দুয়ারে বসাইয়া কহিল, "দাদাঠাকুর, তুমি এইখানে বসিয়া থাক। হুজুর আসিলে বলিবে যে, শাহ্‌জাদা তাঁহাকে সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কি বলিবে বল দেখি?" ব্রাহ্মণের নিবাস সিংহভূম। সে অসীমকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং ভূপেন্দ্রকে ততোধিক ভালবাসিত। ব্রাহ্মণ রন্ধন এবং গঞ্জিকা-সেবন এই দুইটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। ভূপেন্দ্র তাহাকে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ অর্থ

দিত। সেইজন্য পাটনায় আসিয়া সে গঞ্জিকার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল; কারণ, বিহারে গঞ্জিকার মূল্য অতি সামান্য। গঞ্জিকার মাত্রা বর্দ্ধিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ শুষ্ক, মেজাজটা অতীব রুক্ষ এবং স্থূল-বুদ্ধিটা স্থূলতর হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তু কুথাকে যাচ্ছিস্?" নবকৃষ্ণ কহিল, "আমার শ্বশুর অত্যন্ত পীড়িত; তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।" গঞ্জিকা-ধূমাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যেও কথাটা প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ বুঝিল যে, এই মাহেন্দ্রক্ষণ,—এই সুযোগে নবকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছু আদায় হইতে পারে। সে সুদীর্ঘ শিখা আন্দোলন করিয়া কহিল, "আমি লারবো ভাই!" নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লারবি কেন,—কাজটা এমন আর কি কঠিন?" ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার শিখা আন্দোলন করিয়া কহিল, "রাজা মানুষ বটে, ডর লাগে।" নবকৃষ্ণ বড়ই বিপদে পড়িল,—অমূল্য সময় নষ্ট হইয়া যায়। তখন সে তাম্বুর এক কোণ হইতে একপাত গঞ্জিকা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার পারিবি ত?" ব্রাহ্মণ সানন্দে জিহ্বা বিস্তার করিয়া কহিল, "হাঁ।" নবকৃষ্ণ বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে-যাইতে তাহার সহিত এক মুসলমানের সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে এক দিন ভূপেন্দ্রের নিকট সুপারিস করিয়া বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "এই যে দোস্ত, বড় শুভক্ষণেই দেখা হইয়াছে! আমার এক দোস্তের ঘরে আজ মজলিস্ আছে,—ত

খুবসুরৎ তওয়াইফ্ আসিবে; তোমাকে আজ আর ছাড়িতেছি না।" দুষ্ট-সরস্বতী নবকৃষ্ণের স্কন্ধে ভর করিয়াছিলেন, তাঁহার প্ররোচনায় সে বলিল, "চল দোস্ত, অনেকদিন ধরিয়া অনুরোধ করিতেছ, আজি আর তোমাকে ফিরাইব না। সমস্ত দিন শাহ্জাদার দরবারে বসিয়া মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, আজ আমার ছুটী।" মুসলমান পূর্ব্বে শাহ্জাদার শিবিরে নবকৃষ্ণের প্রতিপত্তি দেখিয়াছিল; সুতরাং সে তাহার কথায় সন্দেহ করিল না; বরঞ্চ সরল মনে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দরবারে কি কাজ কর বন্ধু?" নবকৃষ্ণ বুক ফুলাইয়া কহিল, "আমি খাস্ খাজাঞ্চী।" নবকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ আলাপ করিতে-করিতে মুসলমান তাহাকে নগরোপকণ্ঠে এক উদ্যান-বাটিকায় লইয়া গেল। সেখানে অনেকগুলি মুসলমান যুবা একত্র আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল। নবকৃষ্ণ তাহাদের নিকট পরিচয় দিল, তাহার নাম অসীম রায়। সে শাহ্জাদা ফররুখ্সিয়রের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁহার খাস্ খাজাঞ্চী; অনবরত রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া একদিন বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে। নবকৃষ্ণ মন খুলিয়া তাহাদিগের সহিত মিশিল; একজনের অনুরোধে দুই পাত্র মদ্যপান করিল; দ্বিতীয়ের অনুরোধে চারি ছিলিম গঞ্জিকা সেবন করিল, তৃতীয়ের বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া এক-লোটা ভাঙ্গ টানিয়া ফেলিল; এবং চতুর্থের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক বর্ষীয়সী বারনারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অচেতন হইয়া গেল।

ইহার অর্দ্ধদণ্ড পরে এক দীর্ঘাকার মুসলমান যুবা সেই

উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অপর বয়স্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তি কে?" সকলে কহিল, "রাজা অসীম রায়।" আগন্তুক জিহ্বা দংশন করিয়া কহিল, "তোবা, তোবা, এ হারামখোর কোথা হইতে আসিল?" মদ্যপের মোহিত হইতে অধিকক্ষণ লাগে না; সুতরাং আগন্তুকের বয়স্যগণ নবকৃষ্ণের সরলতায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ, কর কি? অমন কথা মুখে আনিও না, রাজা-সাহেব বড় মজাদার আদ্‌মী।" আগন্তুক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু মণিয়া আসিতেছে যে?" সংবাদ শুনিয়া মাদক-বিহ্বল যুবকবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিল, "মণিয়া আসিতেছে! উত্তম কথা, তাহাতে রাজা-সাহেবের কি?" আগন্তুক বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি কি জান না, মণিয়া যে ইহার জন্য দেওয়ানা।" "তুমি পাগল হইয়াছ ফরীদ্ খাঁ? আমাদের মণিয়াচাঁদ কি এমন বানরের কণ্ঠলগ্না হয়? তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে লইয়া আইস।" উদ্যানস্বামী ফরীদ্ খাঁও তখন ভাবিতেছিল যে, অসীম রায়ের এমন কি আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহার জন্য মণিয়া তাহার প্রথম যৌবনে দেহ, মন প্রাণ সমস্তই নিবেদন করিয়া দিয়াছে। এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে ফরীদ্ খাঁও মণিয়ার গৃহাভিমুখে চলিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ফরিদ্ খাঁর উদ্যান

অসীম শিবির পরিত্যাগ করিয়া সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে অনশনে, পাটনা নগরের পথে-পথে উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ সমাগত হইল; মানসিক উত্তেজনা সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত দেহ আর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। অসীম ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। সেই অশ্বত্থ-তলে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া জনৈক গৌরবর্ণ পশ্চিমদেশীয় যুবা নিশ্চিন্ত মনে ফুটাহা চর্ব্বণ করিতেছিল। সে অসীমের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বোধ হয় তৃষ্ণা পাইয়াছে। এই ইঁদারার জল বরফের ন্যায় শীতল,—এক লোটা তুলিয়া দিব কি?" অসীম মাত্র মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যুবা পিত্তল-পাত্রে গভীর কূপের শীতল জল উঠাইয়া আনিল। অসীম তাহা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। দুই পাত্র জল শেষ করিয়া তবে অসীমের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি কহিলেন, "বন্ধু, বড়ই উপকার করিলে! তোমার নাম কি?" যুবা কহিল, "আমার নাম সভাচন্দ্, নিবাস জলন্ধরে। উদরান্নের জন্য এতদূরে আসিয়াছি। আপনার নিবাস?" অসীম তাহার সদালাপে প্রীত হইয়া কহিলেন, "আমার নিবাস? মুরশিদাবাদের নিকট

ডাহাপড়া। আমরা জাতিতে কায়স্থ। আমার নাম অসীমচন্দ্র রায়। শাহ্‌জাদার ফৌজের সহিত মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব তাহা বলিতে পারি না।” সভাচন্দ্‌ ইত্যবসরে রুমালের ফুটাহাগুলি শেষ করিয়া আনিয়াছিল। এই সময়ে অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, আমাকে কিছু খাইতে দিতে পার?” শেষ মুঠাটী বদনে নিক্ষেপ করিয়া যুবা বলিয়া উঠিল, “এতক্ষণ বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেকগুলি দিতাম? এ অঞ্চলে ভদ্রলোকের যোগ্য খাদ্য কিছু পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।” যুবা আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিল এবং পথ পার হইয়া এক তাল-বনে প্রবেশ করিল। অসীম অশ্বথ-তলে বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে সভাচন্দ্‌ একটী তালপত্রের পাত্রে করিয়া দুই মুষ্টি ফুটাহা একং কতকগুলি পক্ক মহুয়া লইয়া আসিল। অসীম অমৃত মনে করিয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিলেন। আহার শেষ হইলে অসীমের মূল্যের কথা স্মরণ হইল। সভাচন্দ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল যে মূল্য দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, সে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া আনিয়াছে এবং সন্ন্যাসী এই মাত্র ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেল।

অসীম ও সভাচন্দ্‌ ধীরে-ধীরে নগরোপকণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া নগরের দিকে ফিরিলেন। পথে আসিতে-আসিতে অসীম সহসা দাঁড়াইয়া গেলেন। একখানা রূপার তাঞ্জামে চড়িয়া যথোচিত সজ্জায় সজ্জিত একটি যুবতী সেই পথে যাইতেছিল,—

তাহার পরিচ্ছদ প্রচার করিতেছিল যে, সে বারনারী। যুবতী তওয়াইফের কায়দায় অসীমকে কুর্ণীশ করিল। অসীম তাহা দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গেলেন। সভাচন্দ্ কহিল, "দাঁড়াইলেন কেন?" অসীম কিন্তু তাহার প্রশ্ন বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার তখন প্রবল হাস্যোদ্রেক হইয়াছিল; এবং সে বেগ দমন করিতে না পারিয়া, জনাকীর্ণ প্রকাশ্য রাজপথে তিনি অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিলেন। প্রভাত হইতে যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার স্বাভাবিক সদানন্দভাব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা প্রবল বায়ুর মুখে একখণ্ড মেঘের ন্যায় সহসা বহু দূরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একজন ধীর, শান্ত পথিককে হাসিতে দেখিয়া, দুই চারিজন পথিকও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সভাচন্দ্ এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, সে পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর কি অসুস্থ বোধ হইয়াছে?" কারণ, তাহার মনে হইল যে, তাহার সঙ্গী অকস্মাৎ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। দুশ্চিন্তার দুর্ভার দূর হইবামাত্র অসীম প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, কিছু না। তুমি চল ভাই, আমার মাঝে মাঝে অমন হাসি আসে।" সভাচন্দ্ এই সময়ে আর এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঞ্জামে করিয়া গেল—ও স্ত্রীলোকটি কে?" পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পাটনায় নূতন আসিয়াছ না কি? ঐ স্ত্রীলোকটি বিখ্যাত তওয়াইফ মণিয়াবাঈ।"

কিয়ৎক্ষণ পরে অসীম ও সভাচন্দ্ এক প্রশস্ত উদ্যানবাটিকার

চত্বরে প্রবেশ করিল। সে উদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গৃহ ছিল,—সভাচন্দ্ তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসীমকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল; এবং অনেকগুলি শুষ্ক ফল একখানি থালায় সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। অসীম তাহার শয্যায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সভাচন্দের ক্ষুদ্র গৃহের নিকটে উদ্যান-মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল; তাহার প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাটে বসিয়া কতকগুলা মদ্যপ কলহ করিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বারবার বলিতেছিল, "জানিস্—আমার নাম রাজা অসীম রায়।" কথাটা দুই তিনবার শুনিয়া অসীম গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং মদ্যপদিগকে দেখিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। সভাচন্দ এবার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, এ উদ্যানটি কাহার?" সভাচন্দ্ কহিল, "সুবাদারের দেওয়ানের।" "আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।" "তিনি প্রায়ই এখানে আসেন না।" "তবে ইহারা কাহারা?" "তাঁহার পুত্র ফরিদ্ খাঁর সঙ্গী।" "ভাল কথা, ফরীদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?" "স্বচ্ছন্দে! ফরীদ্ খাঁ খোশ্-মেজাজী লোক,—তাঁহাকে বলিলেই তিনি হয় ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যদি অনুমতি করেন ত দেখিয়া আসি, তিনি এখন আছেন কি না।" অসীম মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন,—সভাচন্দ্ বাহির হইয়া গেল।

সহসা অসীমের স্মরণ হইল যে, তাহার উপদেশ মত শাহ্‌-জাদা ফররুখ্‌সিয়র দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য অদ্য হইতেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন; এবং তাঁহাকে শিবির পরিত্যাগ করিয়া অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, কামিনী ও কাঞ্চন জগতের সমস্ত অনর্থের মূল। তিনি যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া সমস্ত দিন নগরের পথে-পথে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে যথারীতি প্রসাধিতা হইয়া সন্ধ্যাগমে নবনায়কসম্ভাষণে চলিয়াছে। শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অসীম অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে সভাচন্দ্ ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু সল, বেশী জোড়ে যোগাড় করিয়া দিতে পার?" সভাচন্দ্ এক রকম এইখানেই করিল, "আমার প্রভুপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ বসিয়া গেলাম কি? নহে, ফিরিয়া আসিয়া। দোস্ত্, হঠাৎ এখানে বিলম্ব করিতে-কাজের কথা মনে হইয়াছে। কথাটা এত হইলে আমি একটা ঘোড়া কিনিতে পর্য্যন্ত র হইয়া উঠিল। সভাচন্দ্ হাসিয়া কহিল, "পয়সা হইলে দুনিয়ায় হয় না মুখের দিকে অতি অল্পই আছে।" তাহার কথা শুনিয়া অসীম করিয়া মোহর বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। সভাচন্দ্ তাহা তিনি পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময়ে উদ্যানে মধ্যে কোন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া অসীম অ

একবার বাহিরে আসিলেন; এবং দেখিলেন যে, সকলে ঊর্দ্ধ হস্তে 'মণিয়া-মণিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং নৃত্য করিতেছে।

এই সময়ে সভাচন্দ্ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, ঘোড়া কিনিতে পারি নাই। তবে একটা ভাড়া পাইয়াছি; কিন্তু যাহার ঘোড়া সে রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহে। কারণ, এক আশরফীর কম ঘোড়া ছাড়িতে চাহে না।" অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা ঘোড়ার ভাড়া এক আশরফী কত দিনের জন্য?" "যত দিন ইচ্ছা,—এক দিনই রাখুন, আর এক মাসই রাখুন।" "এক আশরফী দিয়া ঘোড়াটা লইয়া গিয়া যদি ফিরিয়া না আসি?" "দোস্ত, যে এক দিনের জন্য এক আশরফী ঘোড়ার এবাম্ ... সে কি আর তাহার ব্যবস্থা না করিয়াছে?" "কি "বন্ধু, এ উদ্যানটি "নগদ তিন আশরফী জমা না রাখিলে দেওয়ানের।" "আমি।"

চাই।" "তিনি প্রান্তে আরও দুইটা আশরফী লইয়া সভাচন্দ্ কাহারা?" "তাঁহা... চর্ম্মসার অশ্ব আনিয়া উপস্থিত করিল। ফরীদ খাঁর সঙ্গে দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠে খাঁ খোশ্ করিয়া তিনি সভাচন্দ্কে কহিলেন, "দেখ বন্ধু, এ এখানে যদি পথে মরিয়া যায়, তাহা হইলে কি আমার আশরফী দেখিয়া মারা যাইবে?" সভাচন্দ্ কহিল, "সে কথাটা জিজ্ঞাসা সন্ধান নাই। আপনি ত ফিরিয়া আসিতেছেন, আসিলেই হইত্তর পাইবেন।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সরস্বতীর কর্ত্তব্য

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহের সম্মুখে অশ্বত্থতলে কম্বল বিছাইয়া হরিনারায়ণ তামাকু সেবন করিতেছিলেন,—এই সময়ে সরস্বতী বৈষ্ণবী সেই স্থানে আসিয়া অদূরে উপবেশন করিল। হরিনারায়ন হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সরস্বতী, খবর কি?" সরস্বতী প্রণাম করিয়া কহিল, "খবর আর কি বাবাঠাকুর, আপনার চরণ দর্শন পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, এই আশ্রয়েই অনেকটা পথ কাটিয়া যাইবে।" "কেন, তুমি কি আমাদের ছাড়িয়া চলিবে না কি?" "কি আর করি বাবা, বৃন্দাবন অনেক দূরের পথ, শীতও পড়িয়া আসিল, বেশী জাড়ে কি পথ চলিতে পারিব? আপনারা ত এক রকম এইখানেই বসিয়া গেলেন!" "সে কি সরস্বতী, বসিয়া গেলাম কি? আমরাও ত শীঘ্রই কাশী যাইব।" "তবে এখানে বিলম্ব করিতেছেন কেন বাবাঠাকুর?"

প্রশ্ন শুনিয়া হরিনারায়ণের সহাস্য বদন গম্ভীর হইয়া উঠিল। সরস্বতী উত্তর পাইবার আশায় দুই একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু কপালে ভ্রূকুটী দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হরিনারায়ণ ভাবিতেছিলেন যে, তিনি পাটনায় বসিয়া কি করিতেছেন? তাঁহার মন এ প্রশ্নের কোন

সদুত্তর দিতে পারিল না। সে জন্য তাঁহার চিন্তা বাড়িয়া গেল। তিনি অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া দেশের বাস উঠাইয়া বারাণসী যাত্রা করিয়াছিলেন; পথে অসীম রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাদ্‌শাহের পৌত্র পাটনায় আছেন বলিয়া, অসীম ও ভূপেন পাটনায় আছে; কিন্তু তিনি কি জন্য পাটনায় রহিয়াছেন? তাঁহার মন এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। হরিনারায়ণ বিরক্ত হইলেন,—তাঁহার নিজের মনের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন। পঞ্চাশবর্ষব্যাপী জীবনে তাঁহার মন তাঁহার নিকটে কখনও এইরূপ বার-বার অপরাধী হয় নাই। পাটনায় আসিয়া বাসা ভাড়া লইয়া এতদিন বাস করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? অসীমের সহিত বাদ্‌শাহের পৌত্রের পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার পাটনায় থাকিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুদর্শনের যদি কোন চাকরী হয়, তাহার জন্য সে থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি কেন বারাণসী চলিয়া যান নাই? সেই দিন তৃতীয়বার হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের মন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না।

সন্দেহ কাণে-কাণে বলিয়া গেল যে, ইহার ভিতরে একটা গুরুতর দুরভিসন্ধি আছে। মন বলিল, "না"; কিন্তু তাহার কথা গ্রাহ্য হইল না; কারণ, সে বার-বার তিন বার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই। সুবিধা পাইয়া সন্দেহ আবার কহিল, ইহার ভিতর নিশ্চয় একটা চক্রান্ত আছে। কে তাঁহাকে পাটনায় বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছিল? সুদর্শন। সুদর্শন

তাঁহার পুত্র, কিন্তু সে অসীমের বন্ধু। সে নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু সে সরলচিত্ত; সে কি অসীমের পরামর্শে তাঁহাকে পাটনায় বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিল? অসীমের তাহাতে স্বার্থ কি? দুর্গার জন্য? তবে কি অসীম দুর্গার জার? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক-মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভূত হইল। কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল,—কাঠকয়লার ছাই হাওয়ায় উড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে বেড়াইতে দিল;—তাহা দেখিয়া সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "আর একটা সাজিয়া আনিব কি বাবাঠাকুর?" বিদ্যালঙ্কার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না।" সরস্বতী ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিদ্যালঙ্কার সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বৈষ্ণবী, আমি যে কাশী না গিয়া এতদিন কেন বৃথা বিলম্ব করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।" সরস্বতী কহিল, "হুঁ।" হরিনারায়ণ তখন সরস্বতী বৈষ্ণবীর অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। অসীম যদি দুর্গার জার, তাহা হইলে সে নিত্য তাঁহার গৃহে আসে না কেন? দুর্গাও কখন তাহার নাম করে না। হয় ত সুদর্শন বা ভূপেন না জানিয়া দৌত্যকার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুর্গা কখনও সহজে পাটনা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। সুতরাং তাহাকে প্রশ্ন করিলেই রহস্য সহজেই উদঘাটিত হইবে।

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কূপ হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। বধূ আসিয়া জানাইল যে, আহ্নিকের আয়োজন প্রস্তুত। তিনি কহিলেন, "মা, আমি

গঙ্গাতীরে চলিলাম, আহ্নিক সেইখানেই সারিয়া লইব। তুমি একবার দুর্গাকে ডাকিয়া দাও।" কন্যা আসিলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমি গঙ্গাতীরে যাইতেছি,—বাজার হইতে কি কোন জিনিষ আনিতে হইবে?" দুর্গা বলিলেন, "কিছু না বাবা। তবে আমার গঙ্গামাটী ফুরাইয়া গিয়াছে; যদি পার ত একটুখানি হাতে করিয়া আনিও,—কারণ, আমার দুই দিন শিবপূজা বন্ধ আছে।" "ভাল কথা মনে করাইয়া দিলে মা। আমরা ত দেখিতেছি মুরশিদাবাদ ছাড়িয়া পাটনায় বাস করিলাম। বিশ্বনাথ কি তবে বিমুখ হইলেন?" "বাবা, আমিও তোমাকে বলিব-বলিব মনে করিয়া বলিতে পারি নাই। দাদা যদি মেজদাদার কাছে থাকিতে চাহে, তবে চল না কেন, বৌকে পাটনায় রাখিয়া আমরা কাশী চলিয়া যাই?"

উত্তর শুনিয়া হরিনারায়ণ স্তব্ধ হইলেন। অসীম যদি দুর্গার জার, তবে সে কেন স্বচ্ছন্দমনে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে? সেইদিন চতুর্থবার বিদ্যালঙ্কারের মন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত মনে বিদ্যালঙ্কার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গৃহদ্বারে তাঁহার সহিত সুদর্শন ও ভূপেনের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সুদর্শন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা, ছোট রায় কি এখানে আসিয়াছে?" বিদ্যালঙ্কার কহিলেন, "না।" ভূপেন কহিল, "ঠাকুর মহাশয়, দাদাকে আর নবা খানসামাকে সকাল হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। দাদা একবার শাহজাদার দরবারে গিয়াছিল।

আফরাশিয়ব খাঁ কহিল যে, তাঁহার সন্ধ্যাবেলায় দরবারে ফিরিবার কথা আছে; কিন্তু এখনও তাঁহার দেখা নাই।" বিদ্যালঙ্কার তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, সুদর্শনকে কহিলেন, "সুদর্শন, তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি আর গঙ্গাতীরে যাইব না,—তোমার সহিত একটা পরামর্শ আছে।" উদারচিত্ত সুদর্শন কহিল, "বাবা, যতক্ষণ ছোট রায়ের সন্ধান না মিলিতেছে, ততক্ষণ আমার সহিত পরামর্শ করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না।" বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে সুদর্শন, ছোট রায় তোর কে?" সুদর্শন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "তাহা এত সহজে বলিতে পারিলাম না বাবা!" "তুই জানিস, আমি কি কারণে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি?" "আপনার বন্ধু হরনারায়ণের জন্য।" "সে অসীমের কে?" "বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং বিষম শত্রু।" "তুই জানিস, অসীম সমস্ত অনর্থের মূল?" সরলচিত্ত সুদর্শন সস্মিত বদনে কহিল, "না।" পুত্রের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার স্তব্ধ হইলেন। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনীর কলঙ্ককথা শুনিয়াও সুদর্শন কেন অসীমের পক্ষাবলম্বন করে? সে-সময়ে ভূপেন অন্তঃপুরে গিয়াছিল। সুদর্শন তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভূপেন, বাহিরে আয়।" দূর হইতে ভূপেন কহিল, "যাই।" সহসা বিদ্যালঙ্কার বলিয়া উঠিলেন, "দেখ সুদর্শন, আমরা আর কেন পাটনায় বসিয়া থাকি; চল, কাশী যাই।" সুদর্শন কাতর হইয়া কহিল, "বাবা, একটা দিন অপেক্ষা করুন,—ছোট রায়ের সন্ধান পাইলেই

আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসিব।" "তুমি না হয় বৌমাকে ও দুর্গাকে লইয়া এই খানে বাস কর,—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আমি একাই বারাণসী যাত্রা করি।" "উহারা এখানে কি করিবে? বরঞ্চ আপনার সঙ্গে থাকিলে আপনার সেবা করিতে পারিবে। আর আমিও ছোট রায়ের সঙ্গে টিকিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। অনেকক্ষণ তাহার সন্ধান পাই নাই বলিয়া মনটা ব্যাকুল হইয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলেই সকলে মিলিয়া যাত্রা করিব।" পুত্রের উত্তর শুনিয়া বিদ্যালঙ্কার তৃতীয় বার স্তব্ধ হইলেন।

সুদর্শন ভূপেনকে ডাকিয়া কহিল, "ওরে কাণা বাঁদর, বাড়ীর ভিতর বসিয়া কি করিতেছিস্,—গিলিতে বসিয়াছিস্ বুঝি? আর সে যে সমস্ত দিন অনাহারে আছে।" হরিনারায়ণ বধূকে আহ্নিকের আয়োজন করিতে বলিয়াছেন, সে-কথা বিস্মৃত হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সরস্বতী বৈষ্ণবী এতক্ষণ দুয়ারের অন্তরালে লুকাইয়া ছিল;—বিদ্যালঙ্কার গৃহত্যাগ করিলে, সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নবকৃষ্ণের পতন

উদ্যান-বাটিকার মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষ তামাকুর ধূম, মিষ্ট মদিরার গন্ধ, গণিকার সুকণ্ঠোত্থিত গীতধ্বনি ও মদ্যপের

অব্যক্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রজনীর দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়াছে;—মিষ্ট পারসীক মদিরা তখন গণিকাকণ্ঠেও জড়তা আনয়ন করিয়াছে; সেই সময়ে দুইজন যুবা সেই ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া যাহারা উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল; যাহারা উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল,—তাহারা উঠিবার চেষ্টা করিল; এবং গণিকাত্রয় সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। দুইজন নবাগত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যে গণিকা গায়িতেছিল তাহাকে গায়িতে নিষেধ করিয়া অপরাকে কহিল, "মণিয়াজান, ইনি আমার নূতন বন্ধু, নাম গায়েব। তুমি আমাদের পাটনা সহরের বুলবুল। তোমার আওয়াজের মত মিঠা আওয়াজ বোধ হয় কখনও ইঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। একবার মেহেরবানী কর।" মণিয়া উঠিয়া গৃহস্বামীর বন্ধুকে দ্বিতীয়বার অভিবাদন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ফরীদ্, তোমার বন্ধুর নামটা কি, গায়েব? না নামটা উপস্থিত গায়েব আছে?" আগন্তুক ঈষৎ হাসিল; কিন্তু উত্তর দিল না। তাহা দেখিয়া মণিয়া কহিল, "গায়িব কি ভাই, আমার মাশুক আর কথা কহিতেছে না।" ফরীদ্ খাঁ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিয়ার, আবার কে নূতন মাশুক জুটিল?" মণিয়া কুর্ণীশ করিয়া, কক্ষের কোণে এক বিবস্ত্র মত্তপকে দেখাইয়া দিল, এবং কহিল, "ইনি রাজা অসীম রায়, বাঙ্গালা মুলুকের আমীর।" নাম শুনিয়া দ্বিতীয় আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "সত্য না কি? রাজা অসীম

রায়! তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে।" তিনি অগ্রসর হইলেন। মণিয়া মদ্যপের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল; এবং কহিল, "মাশুক, জানি, আমার কলিজা, একটা কথা কও!" মদ্যপ কহিল, "আমি,——হিক—আমি——রাজা অসীম রায়।" মণিয়া তাহার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "আলবৎ, জরুর। তুমি রাজা অসীম রায়। কোন্ দাগাবাজ বলে তুমি অসীম রায় নও। পিয়ার, তোমার মুলুক হইতে এক দোস্ত আসিয়াছে—একবার চোখ মেলিয়া দেখ—আমায় একবার জানি বলিয়া ডাক।" মণিয়ার উত্তেজনায় মদ্যপ বহু কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! সে বলিয়া উঠিল, "বাপ!" মণিয়া কৃত্রিম সোহাগে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল, "জানি, কি হইয়াছে জানি?" মদ্যপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল, "না বাবা, আমি তোমার জানি না, বাপ! আমি যমের বাড়ী যাব।" মণিয়া ক্রন্দনের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার জানি কেন এমন করে গো,—তোমরা সকলে দেখ না গো!"

দ্বিতীয় আগন্তুক অগ্রসর হইয়া মদ্যপকে ডাকিলেন, "নবা!" মদ্যপ জড়িত কণ্ঠে কহিল, "হুজুর!" গৃহস্বামী ফরীদ্ খাঁ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। আগন্তুক পুনর্ব্বার মদ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এখানে কি করিতেছিস নবা?" সে কহিল, "রাজা সাজিয়াছি হুজুর।" "কেন সাজিলি?" "বেকুবী,

মণিয়া ততক্ষণ তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াই ছিল।

সে বলিয়া উঠিল, "জানি, কি বলিতেছ জানি?" নবকৃষ্ণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কহিল, "পয়জার, বাপধন, এখন ছেড়ে দে।"

গৃহস্বামী ফরীদ্ খাঁ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত্, রহস্যটা কি বুঝিতে পারিলাম না।" আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়াই কহিলেন, "উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন।" ফরীদ্ খাঁ মদ্যপের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোস্ত্, ব্যাপার কি?" মদ্যপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "পয়জার।" "কেন, পয়জার কেন?" "রাজা সাজিয়াছি বলিয়া।" "তুমি কে?" "নবা খানসামা।" তাহার শেষ কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "খানসামা—কাহার খানাসামা?" "রাজা অসীম রায়ের।" মণিয়া কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "জানি, তবে তুমিও দাগাবাজ! তুমি তবে রাজা অসীম রায় নও?"

এই সময়ে আগন্তুক তীব্রস্বরে ডাকিল, "নবা!" মদ্যপ অধিকতর জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "হুজুর।" "উঠিয়া আয়।" নবকৃষ্ণ উঠিবার চেষ্টা করিয়া, টাল খাইয়া পড়িয়া গেল। মণিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আগন্তুক ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গৃহস্বামীকে কহিল, "আপনি মেহেরবানী করিয়া ইহাকে বাহির করিয়া দিন, এবং মাথায় দশ মসক জল ঢালাইয়া দিন।" ফরীদ্ খাঁর আদেশে দুই-তিনজন পরিচারক আসিয়া নবকৃষ্ণকে বাহিরে লইয়া গেল। মজলিস পুনরায় জমিল।

গৃহস্বামীর আদেশে আর দুইজন গণিকা গীত গাহিল; কিন্তু

কেহই মণিয়াকে গাওয়াইতে পারিল না। মণিয়া কহিল, "যাহারা গায়েব থাকে, তাহাদের সম্মুখে গাহিতে বড় লজ্জা করে।" ইহা শুনিয়া ফরীদ্ খাঁ আগন্তুককে কহিল, "দোস্ত, অনুভবে বুঝা গেল যে, এখানে কেবল তুমিই গায়েব আছ। আমাদের পাটনা সহরের বুলবুল বড় দিলখুলাসা। তুমি আপনার দিলটা খুলাসা করিয়া প্রকাশ হইয়া বড়,—তাহা হইলেই বুলবুলের মিঠি আওয়াজ শুনিতে পাইবে।" এই সময়ে মণিয়া কৃত্রিম লজ্জায় মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া, অপাঙ্গে মনো-বিমোহন কটাক্ষ সন্ধান করিল। সে কটাক্ষ ক্ষুদ্র কক্ষে কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না,—সকলেই অল্পবিস্তর হাসিল। লজ্জায় আগন্তুকের মুখ রক্তবর্ণ হইল। এক বৃদ্ধ রসিক উঠিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, "জনাব, আপনার মত নসীব কয়জনের হয়? মণিয়া ইচ্ছা করিয়া যাহার দিকে অমন করিয়া চাহে, সে খোদার বড়ই প্রিয়পাত্র। কত আমীর-ওমরাহ্ ঐ গোলাপী চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য বাদ্‌শাহের দৌলৎ লুটাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ যে চাহনি মণিয়াজান বিনামূল্যে তোমার উপর বর্ষণ করিল, তাহার লক্ষ অংশের জন্য কত রাজার রাজ্য গিয়াছে। দোস্ত্, তুমি আমার তুলনায় এখনও বালক, এমন মওকা হেলায় হারাইও না। নিজ নামটি প্রকাশ করিয়া ফেল,—তোমার সহিত আমরাও বেহেস্তে চলিয়া যাই।"

মণিয়া চক্ষুর কোণে হেনার আতর লাগাইয়া দুইদশ বিন্দু

অশ্রুবিসর্জ্জন করিল; এবং সুগন্ধসিক্ত রেশমের রুমাল দিয়া তাহা বারবার মুছিয়া, রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া একজন ভাবুক সুরা-বিহ্বল চিত্তে সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল এবং আগন্তুকের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া মদিরা-জড়িত কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিল। আগন্তুক বিরক্ত হইয়া গৃহস্বামীকে কহিলেন, "আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাই।" ফরীদ্ খাঁ ভদ্রসন্তান,—তিনি সঙ্গিগণের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনার সহিত আমরা বড়ই অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি; আপনি আমাদের মাফ করুন।" আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাফ করিবার কিছুই নাই,—স্ফূর্ত্তির আসরে এইরূপ হইয়াই থাকে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি তবে বিদায় হইলাম।" আগন্তুক কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, মণিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একজন বাদকের নিকট হইতে একটা এস্রাজ ছিনাইয়া লইয়া, সেই কক্ষের একমাত্র প্রবেশপথে বসিয়া গেল, এবং গায়িল :—

"সখি, হামে ছোড়ি যাতি বংশীধারী, *
নিঠুর কপট শঠ মোহন মুরারী ॥
সারা দিবস রজনী, কহ, কহলো সজনী,
রাধা কাহার ধেয়ানী,
সখি রি চিকণকালা বড়ি অহঙ্কারী ॥

* সুর—বেহাগ কাওয়ালী।

মিছা এ মোহন বেশ চিকণ বিনন কেশ,
আজু সব ভেল শেষ,
চলি যায় শ্যামরায় ছোড়িয়ে পিয়ারী ॥"

গান শেষ করিয়া মণিয়া সত্য-সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। আগন্তুক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে মণিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুর্নিস করিল এবং পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তুক কক্ষ পরিত্যাগ করিলে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়াজান, এত খাতির করিলে,—লোকটা কে?" মণিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "যাহার নফরকে এতক্ষণ এত খাতির করিলে এ সেই।" ভাবুক ভাববিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে নাদান, আশনাইয়ের ফের তুই কি বুঝিবি বল?"

সে রাত্রিতে ফরীদ্ খাঁর মজলিস আর তেমন করিয়া জমিল না।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতিষী

সরস্বতী প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল। সে কোন্ পথে গিয়াছিল, বিদ্যালঙ্কার তাহা দেখিতে পান নাই। তিনি যখন গঙ্গাতীরে আহ্নিক সারিয়া সহরে ফিরিতেছেন, তখন

দেখিলেন যে, সরস্বতী এক সন্ন্যাসীর আখড়ায় একটি তুলসীমঞ্চ দেখিয়া স্নানান্তে অসংখ্য প্রণাম করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবী বলিয়া উঠিল, "আ দাদাঠাকুর, কি লক্ষীছাড়া দেশ! সবগুলাই কি অধম্মে ঠাকুর?" "অধম্মে ঠাকুর কি সরস্বতী?" "ঐ যে, আমার নাম করিতে নাই,—বেলপাতা না হইলে যাহার পূজা হয় না।" "কি জ্বালা, শিব ঠাকুর বুঝি?" "রাধে মাধব, যেমন ঠাকুরের রূপ, তেমনিই ঠাকুরের ছিরি! গঙ্গাস্নান করিয়া সারাটা সকাল একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।" "রাধাকৃষ্ণ ছাড়া বুঝি আর ঠাকুর বলিতে নাই?" "আমি বৈষ্ণবের মেয়ে বাবা, কেমন করিয়া তোমাদের ঠাকুরকে ঠাকুর বলি বল? সে কথা যাক, গোপীনাথ কবে দয়া করিবেন বল দেখি?" "সকল বৈষ্ণবই কি এই কথা বলে?" "কেমন কথা বাবা, অধম্মে ঠাকুরের না গোপীনাথের?" "গোপীনাথ মাথায় থাকুন, অধম্মে ঠাকুরের কথাই বলিতেছি।" "না, তা কেন বাবা, এই ভরতপুরের গোঁসাইবাড়ীর ছোট বৌ সেই রাক্ষুসীর বাড়ীর—" "রাক্ষুসীর বাড়ীর কি সরস্বতী?" "তুমি জ্বালাতন করিলে বাবাঠাকুর, সেই যে গো জ্যান্তো থেকো মাগী!" "জ্যান্তো খেকো, ওঃ জীবন্ত! সরস্বতী কি কিরীটেশ্বরীর মার কথা বলিতেছ?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের কি ও নাম করিতে আছে বাবা! তা, সেই রাক্ষুসীর বাড়ীর বৌ আসিয়া গোঁসাইবাড়ী নিত্য কাদা দিয়া অধম্মে ঠাকুর তৈয়ার করে তার পূজা হয়।" "ঐ, যা বলিলে!" "এইজন্যই এমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে

আগুন লাগিয়াছে। সরস্বতী, গোপীনাথ ত এখনও স্মরণ করেন নাই, কবে যে করিবেন তাহাও জানি না।” “তাই ত দাদাঠাকুর, কাশীযাত্রা করিয়া আপনি যে পথে বড় বিষম আটকাইয়া গেলেন! আমি বড় ভরসা করিয়া আসিয়াছিলাম, যে আপনার সঙ্গে দেখা হইল, অনেকটা পথ আপনার আশ্রয়ে যাইব। তা, দাদাঠাকুর, আপনি আর এখানে কেন বসিয়া আছেন?” “এ কথার জবাব দেওয়া বড় সহজ নহে সরস্বতী! তুমি কালও একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি কিন্তু সেই অবধি মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। যাহাই হউক, গোপীনাথ এখনও স্মরণ করেন নাই; সুতরাং আরও কিছুদিন পাটনায় অবস্থিতি আছে।”

কাশীযাত্রার কথা সে যে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এ কথাটা সরস্বতীর একেবারেই মনে ছিল না। সুতরাং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মুখে সে কথাটা শুনিয়া, সরস্বতী আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া, জিহ্বা দংশন করিল, দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যালঙ্কার তাহা দেখিতে পাইলেন।

সরস্বতী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। বিদ্যালঙ্কার অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতে-করিতে, গৃহের পথ অবলম্বন না করিয়া অন্য পথে চলিলেন। সে পথটা দুইশত আট বৎসর পূর্ব্বে তখনকার পাটনা সহরে চৌক বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন প্রথম বাজার বসিয়াছে; সুতরাং চৌক জনাকীর্ণ। সেই জনতার মধ্যে পাষাণাচ্ছাদিত পথে বসিয়া

এক হিন্দু জ্যোতিষী ভূমিতে রেখাঙ্কন করিয়া ভাগ্য গণনা করিতেছিল; এবং তাহার পার্শ্বে এক মুসলমান বুজরুক ঔষধের দোকান সাজাইয়া বসিয়াছিল। বুজরুকের অদৃষ্ট তখনও প্রসন্ন হয় নাই; সুতরাং তাহার দোকানে খরিদ্দারের নিতান্ত অভাব। জ্যোতিষী কর-রেখা দেখিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছিল; এবং তাহা দেখিয়া হিংসায় মুসলমান জ্বলিয়া মরিতেছিল।

বিদ্যালঙ্কার যখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন এক প্রৌঢ়া মুসলমানী জ্যোতিষীর নিকট ভাগ্য গণনা করাইতেছিল। বিদ্যালঙ্কার দূর হইতে তাহার সম্বন্ধে জ্যোতিষীর উক্তি শুনিতে লাগিলেন। জ্যোতিষী কহিল, "তোমার বিবাহ হয় নাই।" মুসলমানী চটিয়া কহিল, "আরে বাবু, সে কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি নাই।" জ্যোতিষী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু যাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবার কথা, তুমি এখন তাহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছ। তোমার একটিমাত্র সন্তান জীবিত থাকিবে। সেটি কন্যা, রূপসী; তাহারও বিবাহ হইবে না। কিন্তু তাহার চিত্তের দৃঢ়তা তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক। যবনী তুমি কস্‌বী। তোমার কন্যা সুগায়িকা হইবে; কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি করিবে না!" গণকের কথা শুনিয়া মুসলমানী বিরক্ত হইয়া হাত ছিনাইয়া লইল; কিন্তু পরক্ষণেই আর একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিল। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি জানিতে চাহ?" প্রৌঢ়া ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষণ করিয়া কহিল, "আমি যে

কথা জানিতে চাহি, কাফের, তুমি ত তাহা শুনিলেই না,—আপন মনে বকিয়া যাইতেছ। আমার কন্যা কি করিবে না করিবে, সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার প্রশ্ন শুনিতেছ কৈ?" জ্যোতিষী কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত-নেত্রে কহিল, "বহুৎ আচ্ছা, তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনিয়া যাই।"

"আমার কন্যা রূপসী, সে সুগায়িকা; কিন্তু সম্প্রতি তাহাকে দানো পাইয়াছে; না হয় সে পাগল হইয়াছে। কিন্তু কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়াই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।" জ্যোতিষী খড়ি দিয়া ভূমিতে অঙ্ক লিখিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "বিবি, তোমার কন্যার পাগল হইবার সম্ভাবনা অল্প; এবং তাহার চিত্তের দৃঢ়তা এত অধিক যে, প্রেতযোনি তাহাকে সহজে স্পর্শ করিবে না। বোধ হয় কোন রোগ হইয়াছে। কিন্তু না! এখন তোমার কন্যার বয়স বিংশতি বৎসর, এখন তাহার কোন রোগেরই সম্ভাবনা নাই।" প্রৌঢ়া প্রসন্না হইয়া কহিল, "এ কথাটা ঠিক। হকিম ডাকিয়াছিলাম, তাহারা নাড়ী টিপিয়া কহিল, মেয়ের আমার কিছুই হয় নাই। রোজা ডাকিলাম; সে কহিল, আমার মেয়েকে হিন্দুর ভূতে পাইয়াছে, —মুসলমানের রোজার মন্ত্রে সে ভূত ছাড়িবার নহে। সেই জন্যই ত তোমার নিকট আসিয়াছি।" জ্যোতিষী হাসিয়া কহিল, "বিবি, আমি হিন্দু বটে, কিন্তু ভূতের ওঝা নহি। তোমার কন্যাকে ভূতে পায় নাই, কোন অপদেবতার এমন সাধ্য নাই যে তোমার কন্যাকে স্পর্শ করে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে

ঘরে ফিরিয়া যাও।" "আরে পাগল, ঘরেই যদি ফিরিয়া যাইব, তবে তোর নিকট মরিতে আসিয়াছি কেন? মেয়ে আমার আপন মনে হাসে, আপন মনেই কাঁদে; বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে থাকে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, কৈ, কিছুই না।" "লোকে বলে, উপদেবতা যাহাদিগকে আশ্রয় করে, তাহারা না কি এই রকমই আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বলিলাম ত, কোন উপদেবতা তোমার কন্যার ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। দেখ বিবি, নিজের অতীত যৌবনের কথা স্মরণ কর,—তোমার কন্যা প্রেমে পড়িয়াছে।" "কাফের, সে কথা শুনিবার জন্য তোমাকে পয়সা দিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। আমার প্রেতিবেশী রুস্তম্‌দিল্ খাঁ এ কথা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছে।" "তোমার প্রতিবেশী অতি বিচক্ষণ লোক, এবং তাহার পরামর্শ শুনিলে তোমাকে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিতে হইত না। দেখ বিবি আমি গণনা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করি বটে, কিন্তু আমি ভিক্ষুক নহি। যে সন্তুষ্ট হইয়া একটি পয়সা দেয়, তাহা আমি লক্ষ টাকা বলিয়া মাথায় তুলিয়া লই। কিন্তু যে অর্থ দিতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার অর্থ আমি গ্রহণ করি না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমার কন্যাকে উপদেবতায় পায় নাই; সুতরাং হিন্দু ওঝাতে তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি তোমার নিকট হইতে একটি পয়সাও লইব না; কারণ, তুমি অর্থ দিতে কাতর।"

প্রৌঢ়া জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; এবং বহু মিনতি করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিল। প্রসন্ন হইয়াও জ্যোতিষী মুসলমানীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। সে কহিল, "আমি তোমার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিব না; তবে যথাসাধ্য তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" এই সময়ে জ্যোতিষী এবং মুসলমানীর চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছিল। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত মুসলমান বুজরুকও দোকানে খরিদ্দারের অভাব দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কন্যার কি হইয়াছে?" গণক কহিল, "তোমার কন্যা প্রেমে পড়িয়াছে।" "কাহার?" "এক-জন হিন্দুর।" "তোবা, তোবা! তাহার মুখে হাজার ঝাড়ু মারি।" "তাহার অপরাধ কি? সে তোমার কন্যার প্রেমে পড়ে নাই; এবং সে তোমার কন্যাকে কখনও কামনা করিবে না।" "তবে?" "তবে কি?" "কি উপায় হইবে?" "বিবি, আমি গণিয়া কি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি; কি হইবে তাহাও কতক-কতক পারি; কিন্তু উপায় একমাত্র ভগবান।" "আমার কন্যার কি হইবে?" "তোমার কন্যা এখন হইতে তোমার বাধ্য থাকিবে না; এবং তোমার অনুরোধ-মত বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তোমার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। সে শীঘ্রই দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে ঘুরিবে।" "সর্ব্বনাশ! তবে আমার কি হইবে কাফের?" "তোমার কখনও অন্নাভাব হইবে না।" "তাবিজ মাদুলীতে—" "সে সংবাদ আমি রাখি না বিবি।"

এই সময়ে বুজরুক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, "তাহার জন্য চিন্তা কি বিবি সাহেব, এক তাবিজে তোমার কন্যাকে বশ করিয়া দিব। তাবিজের মূল্য নগদ এক টাকা।" প্রৌঢ়া গণককে ছাড়িয়া বুজরুকের দিকে অগ্রসর হইল; এবং জনতার মধ্য হইতে সরিয়া গেল। এক সঙ্গে দশ জন লোক তাহার স্থান অধিকার করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু জ্যোতিষী দূর হইতে বিদ্যালঙ্কারকে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিল। বিদ্যালঙ্কার জনতার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া গণক কহিল, "ব্রাহ্মণ, তুমি বঙ্গবাসী, ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তোমার বিশ্বাস অতি অল্প। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।" বিদ্যালঙ্কার স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। গণক কহিল, "যাহা ভাবিয়াছ তাহাই সত্য, এবং যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা। তোমার কন্যার শত্রু বাঙ্গালা দেশ হইতে এই পাটনা সহরে আসিয়াছে; কিন্তু এখনও ছিদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। সাবধান ব্রাহ্মণ, বিদ্যা ও বংশগৌরবের দম্ভে মহাপাতক করিও না।" বিদ্যালঙ্কার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। গণক পুনরায় কহিল, "আজি সকালে যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তুমি কবে কাশী যাইবে, সে তোমার শত্রু এবং শত্রুর চর। সাবধান, স্মরণ রাখিও যে স্ত্রীজাতি তোমার শত্রু এবং তোমার কন্যার শত্রু।" বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি তবে চলিয়া যাইব?" জ্যোতিষী কহিল, "স্বচ্ছন্দে, কিন্তু কাশী যাইও না।" বিদ্যালঙ্কার জ্যোতিষীর কথা চিন্তা করিতে-করিতে গৃহে ফিরিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসিনী

সদ্যঃস্নাতা দুর্গা নিদাঘ-প্রভাতে করবী-মূলে কুসুম চয়ন করিতেছিলেন; অদূরে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ অশ্বত্থতল হইতে দূর্ব্বা-সংগ্রহ করিতেছিলেন; এমন সময় সরস্বতী বৈষ্ণবী সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া দুর্গা বলিয়া উঠিলেন, "বৈষ্ণবদিদি, আজ একাদশী,—একটা নাম শুনাইবে?" সরস্বতীর তখন নাম শুনাইবার অবসর ছিল না; কারণ, সে তখন অন্য মতলবে আসিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ, এমন পোড়ার দেশে মানুষ আসে! একটা ঠাকুরবাড়ী নাই, আখড়া নাই, পোড়া কপাল দেশের! খেংরা মারি, খেংরা মারি।" দুর্গাঠাকুরাণী দ্বিতীয়বার বলিয়া উঠিলেন, "বলি, ও বৈষ্ণব দিদি, দেশ চুলায় যাক্,—একটা নাম শুনাইবে?" "এমন দেশেও মানুষ আসে! সোণার বাংলা দেশ ছাড়িয়া দাদাঠাকুর না কি এই দেশে আসিয়া বাস করিবেন! এত বড় সহর,—মা গঙ্গার ধার,—সারাটা প্রহর একটা ঠাকুরবাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না!—" "বলি ও সরস্বতী দিদি, একটা নাম শুনাইবে?" "নাম, আ-আমার পোড়া কপাল! নাম শুনিবে—তা' আমায় এতক্ষণ বলিতে হয়!" "বলিয়া বলিয়া যে গলা ধরিয়া গেল ভাই,—তুমি কথা কাণে তোল কই? বলি, সকালবেলা ঠাকুরঘর, ঠাকুর-

ঘর করিয়া মরিতেছ কেন? আবার কি বৈষ্ণব জুটাইবার সাধ হইয়াছে না কি?" "গলায় দড়ি আমার! দিদিঠাকরুণ যেন কি!"

পুষ্পচয়ন সাঙ্গ হইল। দুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "বৈষ্ণব দিদি, চল, বাঁড়ীর ভিতর যাই। বলি, ও বৌ, এত বাহির-বাহির মন কেন?" সুদর্শনের স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা ননদিনী বাঘবাঘিনী,—একটু ঘরের বাহিরে আসিবার উপায় নাই! চল ভাই, ভিতরে যাইতেছি। কি খবর?" "বৈষ্ণবদিদি নাম শুনাইবে।" "বলিস্ কি,—আমাদিগের কি এমন সৌভাগ্য হইবে? চল, চল।"

রমণীদ্বয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, এক সন্ন্যাসিনী গৃহের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনী যুবতী, রূপসী। গৈরিক বসনে তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল। কেহ যদি সে সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, সন্ন্যাসিনী অতি অল্প দিন বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ, তাহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নযুগের কোণ হইতে কজ্জলের রেখা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই; এবং হস্তের ও পদের নখে মেহেদীর বর্ণ তখনও স্পষ্ট ছিল। এমন কি, উভয় হস্তের দশ অঙ্গুলিতে গুরুভার অঙ্গুরীয়ক-গুলির দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই। সন্ন্যাসিনী দুয়ারে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল; কিন্তু কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, গৃহের সম্মুখের উদ্যানে প্রবেশ করিল। ক্রমে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া, সে অতি ধীরে গৃহের দুয়ারে গিয়া

দাঁড়াইল। গৃহমধ্যে প্রাঙ্গণে দুর্গা, তাহার ভ্রাতৃবধূ ও সরস্বতী বসিয়া ছিল। সন্ন্যাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদিগকে দেখিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে তাহার পৃষ্ঠে কে হস্তার্পণ করিল। সে চমকিতা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে যতক্ষণ প্রাঙ্গণের রমণী-ত্রয়কে লক্ষ্য করিতেছিল, ততক্ষণ গৃহস্বামী স্বয়ং তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। গণকের কথায় বিশ্বাস না হইলেও, বিদ্যালঙ্কারের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। আবাসগৃহের দ্বারে নূতন লোক দেখিতে পাইয়া তিনি প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাহাকে শত্রুর চর মনে করিয়া, তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া দাঁড়াইলে, তিনি তাহাকে কহিলেন, "কথা কহিও না, তাহা হইলে বিপদে পড়িবে। এই গৃহ আমার। বাহিরে আইস।" সন্ন্যাসিনী প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, সে চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্তু তাহার যখন মনে পড়িয়া গেল যে, সে সামান্য তস্করের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর বাক্যব্যয় না করিয়া, গৃহস্বামীর অনুসরণ করিল। গৃহ হইতে কিয়দ্দূরে গিয়া বিদ্যালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, এবং কি জন্য গোপনে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে?" সন্ন্যাসিনী চতুরা,—উত্তর দিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সে বলিয়া উঠিল, "এই গৃহে আমার এক দুষমণ আসে,—আমি তাহার সন্ধানে আসিয়াছি।" "তোমার দুষমণ কে?" "এক বাঙ্গালী।" "আমিও বাঙ্গালী,—আমিই কি তোমার দুষমণ?"

ঠাহর করিয়া দেখিবার ছলে সন্ন্যাসিনী কতকটা চিন্তা করিয়া লইল; এবং কহিল, "না, তুমি বৃদ্ধ, সে যুবা।" "তাহার নাম কি?" "নাম ঠিক বলিতে পারি না,—বাঙ্গালা মুলুকের নাম স্মরণ রাখা কঠিন।" সহসা বিদ্যালঙ্কারের স্মরণ হইল, তিনি এই রমণীকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কয়দিন পূর্ব্বে অসীম রায়ের সহিত আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলে?" রমণী কহিল, "না, আমি এ অঞ্চলে কখনও আসি নাই। অসীম রায় কে, তাহা আমি জানি না।" "তোমার দুষমণ কি এখনও এই ঘরের ভিতরে আছে?" "এক-জন আছে।" "সে কে?" "রমণী।" "চল, তাহাকে দেখাইয়া দিবে।" বিদ্যালঙ্কারের পশ্চাতে গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, সরস্বতী বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া দিয়া, সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেল,—বিদ্যালঙ্কার তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, বৃদ্ধ অশ্বত্থবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কে?

বিদ্যালঙ্কারের গৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া, সন্ন্যাসিনী দূর হইতে এক পুরুষকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সহসা তাহার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একবার অন্য পথে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দুই এক পদ গিয়া তাহার চরণ আর চলিতে চাহিল না। যাহাকে দেখিয়া তাহার এমন অবস্থা হইয়াছিল, সে দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, "মণিয়া-বাঈ, এ কি? তুমি কি বহুরূপী? কাল তোমাকে তওয়াইফ

মণিয়াবাঈয়ের চেহারায় দেখিয়াছি,—আজি আবার এ কি ভোল?" সন্ন্যাসিনী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। আগন্তুক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া, তুমি কোথায় আসিয়াছিলে?" সন্ন্যাসিনী অতি ধীরে কহিল, "দুর্গাঠাকুরাণীর নিকট।" "তাহার সহিত দেখা হইয়াছে?" "হইয়াছে, এখন আমি যাই।" "না, দাঁড়াও। তোমার সহিত অনেক কথা আছে।" "না, এখন আমি যাই,—অন্য সময়ে কথা কহিবেন।" "না মণিয়া, পাটনা সহরে অসীম রায়ের সময় বড় বেশী নাই। বাদশাহ ফররুখ্‌সিয়র শীঘ্রই দিল্লী যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে বোধ হয় আমাকেও যাইতে হইবে। মণিয়া, প্রভাতে যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন তোমার ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম হয় ত তুমি আত্মহত্যা করিবে, এবং আমাকে সেই মহাপাতকের ভাগী করিয়া যাইবে। কিন্তু মণিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে পাটনা সহরের পথে-পথে ফিরিয়া, গোধূলির ক্ষীণ আলোকে যখন তোমার নব-অভিসারিকা বেশ দেখিলাম, তখন আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এই মহানগরীর লোক ভাবিল, আকস্মিক শোকে অসীম রায় পাগল হইয়া গিয়াছে। ফরীদ্ খাঁর উদ্যানে তোমার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি মণিয়া, সেই কি তুমি? শুনিয়াছি, রমণী প্রহেলিকা। নারী-চরিত্র কখনও অধ্যয়ন করি নাই—" গৈরিকরঞ্জিত অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মণিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া অসীমের বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন,

"মণিয়া, এ আবার কি? ফরীদ্ খাঁর প্রমোদ-উদ্যানে—" আর বলিতে হইল না,—সন্ন্যাসিনী অসীমের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া উঠাইয়া, অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন মণিয়া?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মণিয়া কহিল, "কাঁদি কেন, তাহা পুরুষে বুঝিবে না। যদি রমণী হইতে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে না। ভুল বুঝিয়াছিলাম প্রভু! ভাবিয়াছিলাম, রূপের মোহ তোমাকে আকর্ষণ করিবে। আমার অভিসারিকা বেশ দেখিলে হয় ত হিংসায় তুমি আমার হইতে চাহিবে—সে ভুল আজি বুঝিয়াছি। ক্ষমা কর।" অসীম কহিলেন, "ক্ষমা কিসের মণিয়া? তুমি আমার জন্য দেহত্যাগ করিতে চাহিতেছ জানিয়া, সারাদিন পথে পথে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি। সন্ধ্যাকালে যখন দেখিলাম যে, তুমি পূর্ব্ববন্ধুপরিবৃতা হইয়া সানন্দে উদ্যান-বিহারে চলিয়াছ, তখন সে মোহ কাটিয়া ফেল। মণিয়া, তুমি হিন্দু সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছ কেন?" মুখ হইতে অঞ্চল সরাইয়া মণিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন, তাহা শুনিতে চাহ? আমি হিন্দু হইয়াছি। কারণ, শুনিয়াছি হিন্দুর পুনর্জ্জন্ম হয়। হিন্দুকন্যা একজন্মে যাহার উপাসনা করে, পরজন্মে তাহাকে পায়। এ জন্মে যাহা আমার অসাধ্য, পরজন্মে তাহা পাইবার ভরসায় হিন্দু হইয়াছি। আমার এ সাধে বাধা দিও না দিলদার!"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছিত ধন

"কৈ বৈষ্ণবী দিদি, গাহিলে না?"

"এই গাচ্ছি" সরস্বতী এই বলিয়া অঞ্চল হইতে খঞ্জনী বাহির করিল। এই সময়ে বাহিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল "বৌঠান, দাদা আছে?"

বধূ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া কহিলেন, "কে, ছোটঠাকুরপো! এস। দেখি তোমার দাদাঠাকুরটি কোথায়।"

এই সময়ে সরস্বতী এক সুদীর্ঘ প্রণাম করিয়া কহিল, "হুজুর, দিদিঠাকরুণের হুকুম মত একটা গান ধরিয়াছিলাম, হুকুম হইবে কি?"

অসীম ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ভাল, অনেকদিন তোমার গান শুনি নাই, কি গাহিবে গাও।"

বৈষ্ণবী গাহিল :—

"ভাল যদি বাস তবে
ফিরে আর এস না।
পথ-মাঝে যেতে যেতে
ফিরে ফিরে চেও না॥
বারবার চাহ ফিরি
কাতর নয়নে,

বুঝ নাকি হৃদি মোর
লুটে তব চরণে,
যথা চাহ তথা রহ
দেখা আর দিও না।"

গীত সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গীত শেষ হইলেই বলিয়া উঠিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি, এই বুঝি তোমার নাম শোনান ?"

সরস্বতী কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ ত ঠাকুরদের গান দিদিঠাকুরুণ !"

বধূ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন ; তিনি কহিলেন, "ছাই গান বৈষ্ণবী দিদি, ইহাতে ত ঠাকুর-দেবতার নাম-গন্ধও নাই।"

সরস্বতী খঞ্জনী অঞ্চলে বাঁধিয়া গীত ব্যাখ্যা করিতে বসিল। সে কহিল, "কেন থাকিবে না ? তোমরা গানটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। শ্রীরাধা আয়ান ঘোষের বাড়ী গিয়াছেন—"

দুর্গাঠাকুরাণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার আর ব্যাখ্যান করিতে হইবে না, আমরা সব বুঝিতে পারিয়াছি। দাদা, বড়দাদা ঘরে নাই, তুমি কি বসিবে ?"

সরস্বতী অদূরে এমনভাবে দাঁড়াইল যে, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া শিশুতেও বুঝিতে পারে যে সে অসীম ও দুর্গাঠাকুরাণীর হাবভাব লক্ষ্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া বধূ আর ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি, ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, তরকারী কুটিবে এস।"

সরস্বতী অবগুণ্ঠন তুলিবার ভাণ করিয়া কহিল, "সে কি কথা বৌ-ঠাকরুণ, আর দুই একটা নাম শুনিবে না?"

"পোড়াকপাল তোমার নামের, সকাল বেলায় বাসি মুখে আর এমন নাম শুনিয়া কাজ নাই! দুর্গা, তুই ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা ক', আমরা রান্না-ঘরে যাই।" সরস্বতী দুর্গা ও অসীমের প্রতি একটা ক্রূর কটাক্ষপাত করিবার প্রলোভন বহুকষ্টে সম্বরণ করিয়া বধূর সহিত রন্ধনশালায় চলিয়া গেল।

দুর্গা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট-দাদা, তুমি কি বসিবে?"

অসীম দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সেইখানেই দাঁড়াইয়া কহিলেন, "না দিদি, আর বসিব না, তোমাকে একটা কথা বলাইবার জন্যই সুদর্শনকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে সুদর্শনকে দিয়া বলাইলে তুমি হয় ত মনে ব্যথা পাইবে না; কিন্তু সে যখন নাই, তখন তোমাকেই বলিতে হইল। আমরা যে কখন চলিয়া যাইব, তাহা বলিতে পারি না। নূতন বাদশাহের মতি স্থির নাই। তিনি যখন কুচ করিতে হুকুম করিবেন, তখনই চলিতে হইবে। দেখ দিদি, যাহা বলিব তাহা মন দিয়া শুন, না বুঝিয়া উত্তর দিও না।" দুর্গা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অন্তরালে দাঁড়াইয়া আর দুইজন সাগ্রহে অসীমের কথা শুনিতেছিল; কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের কথা ইঁহারা জানিতে পারেন নাই। অসীম পুনরায় কহিলেন, "দেখ দিদি, যেদিন

ভিখারীর ন্যায় পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসি, সেদিন তুমি স্বেচ্ছায় তোমার স্বামীর আজীবন-সঞ্চিত ধনরাশি ভূপের মঙ্গলের জন্য অন্ধকারে একাকিনী আসিয়া আমাকে দিয়া গিয়াছিলে। তখন আমি নিঃসম্বল। তোমার সেই কয়টি মোহর আমার নিকটে বাদ্‌শাহের ধনভাণ্ডার বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং তাহার বলেই আমি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি বলিয়াই বলিতেছি দিদি, আজি আর আমার সে অর্থের প্রয়োজন নাই। তুমি দুঃখ করিও না দিদি! অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত আমারও অবস্থার পরির্ত্তন হইয়াছে। সহসা মনে হইল, যে অর্থের আমার প্রয়োজন নাই, সে অর্থের প্রয়োজন হয় ত তোমার হইতে পারে; তোমার না হয় সুদর্শনের হইতে পারে। দেখ দিদি, আমাদের অবস্থান্তর দেখিয়া তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। সেই ব্যাকুলতার ফলে তুমি কলঙ্কভাগিনী, তোমার পিতা ও ভ্রাতা গৃহত্যাগী, তাহা আমি জানি। তোমাদের অভাব হইয়াছে মনে করিয়া আমি এই অর্থরাশি ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি, তাহা ভাবিও না। যে অর্থ আমার অভাবের সময়ে তুমি দিয়াছিলে, এখন আর আমার সে অর্থে প্রয়োজন নাই, অথচ সে অর্থ তোমার নিকট থাকিলে হয় ত অপরের অভাবমোচন হইবে, এই ভাবিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি আমার অপরাধ লইও না দিদি!"

অসীমের উক্তির শেষভাগ শুনিয়া দুর্গা হাসিয়া কহিলেন, "তাহার জন্য এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন দাদা? ভগবান তোমার

উন্নতি করিয়াছেন, তাহাতে আমারা যত সুখী, জগতে এত সুখী বোধ হয় আর কেহ নহে। দেখ দাদা, মোহরগুলি এখন তুমি রাখ, আমার যখন প্রয়োজন হইবে, আমি তখন তোমার নিকট হইতে চাহিয়া লইব।"

"দেখ দিদি, যে উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে মরণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমার এমন কেহ নাই, যাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া তোমার ধন গচ্ছিত রাখিয়া যাইতে পারি। যদি মরিয়া যাই বা যদি আর সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে তোমার স্বামীর বহুযত্নে সঞ্চিত অর্থরাশি হয়ত অপব্যয় হইবে।" দুর্গা দ্বিতীয়বার হাসিলেন এবং তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া অসীম বিস্মিত হইলেন।

দুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "দাদা, দেখা যদি না-ই হয় এবং অর্থ যদি ফিরিয়াই না পাই তাহাতে ক্ষতি কি? অর্থ ত আমার নহে; যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশ মত ব্যয় করিয়াছি। যাহাকে দিয়াছিলাম, সে তাহা ফিরাইয়া দিতেছে। যখন তাঁহার আদেশমত এই অর্থ ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইব, তখন তোমার নিকট যেমন করিয়া পারি সংবাদ পাঠাইব। যদি ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তুমি না থাক কিম্বা অর্থ যদি দাতার ইচ্ছামত দ্বিতীয়বার প্রযুক্ত হইতে না পারে, তাহার জন্য তুমি বা আমি দোষী নহি। একবার দাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। একই অর্থ যে দুইবার ব্যবহৃত হইবে, ইহা দাতা হয় ত জানিতেন না।"

অসীম দুর্গাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "দিদি, যতদিন এই মোহরগুলি ফিরাইয়া না লইবে, ততদিন আমি ইহার জন্য দায়ী। গচ্ছিত অর্থ ফিরাইয়া না দিয়া যদি মরি, তাহা হইলে নরকেও আমার স্থান হইবে না। না, তাহা হইবে না। মুরশিদাবাদের মাণিকচাঁদ শেঠ প্রসিদ্ধ ধনী। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র তাহার কুঠী আছে, তোমার নামে এই অর্থ তাহার নিকট জমা দিতে চলিলাম। আর একটা কথা বলিয়া যাই! ভূপ রহিল, সে অন্ধ সুতরাং অসহায়। যদি আমি মরি, তাহা হইলে তুমি আর সুদর্শন তাহাকে দেখিও। মাতৃহীন শিশুকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি, তোমাকে আর অধিক কি বলিব?"

দুর্গাঠাকুরাণী এতক্ষণ স্থির হইয়া ছিলেন, ভূপেনের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, তুমি যেখানে লড়াই করিতে যাইবে, ভূপেনও কি তোমার সঙ্গে যাইবে?"

"যতদূর পারিব তাহাকে সাবধানে রাখিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দেশে বাদ্‌শাহের মৃত্যু একটা মহাপ্রলয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"

অসীমের উক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই, যে ব্যক্তি বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভূপেনের জন্য কোন চিন্তা করিও না, আমি সুদর্শনকে তোমার সঙ্গে দিব, সে ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। অসীম, তুমি যখন জয়ী হইয়া

ফিরিয়া আসিবে, তখন আমি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া আবার দেশে ফিরিব। আমি তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত; তোমাকে বঞ্চিত হইতে দেওয়া আমার উচিত হয় নাই। দেখ অসীম, আমি চেষ্টা করিলে হরনারায়ণের কবল হইতে তোমার বিষয় রক্ষা করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি অন্ধ হইয়াছিলাম,—তাহার বন্ধুত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবং কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই‌ ‌ ‌লাম; সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন

অসীম বিদ্যালঙ্কারকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলে‌ ‌ সরস্বতী প্রাঙ্গণের যে কোণে লুকাইয়া ছিল, সেস্থান পরি‌ ‌ ‌ করিয়া বড়বধূর নিকট গিয়া বলিয়া উঠিল, "বৌ-ঠাকরুণ, পেট‌ ‌ ‌ কমন গুলুচ্চে, আমি একবার আসি।" উত্তরের অপেক্ষা না‌ ‌ ‌ যাই সরস্বতী প্রস্থান করিল।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অন্ধ প্রেম

বিদ্যালঙ্কারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মণিয়া কম্পিত পদে চলিতে আরম্ভ করিল। সে তখন অশ্রু-অন্ধ; কোন্ দিকে যাইতেছে বা কোন্ পথে চলিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কিয়দ্দূর চলিবার পরে সে একটা ক্ষুদ্র খর্জ্জুরবৃক্ষের উপর পড়িয়া আঘাত পাইল এবং তখন তাহার চেতনা ফিরিয়া

আসিল। সে চক্ষু মুছিয়া দেখিল যে, তীক্ষ্ণ খর্জ্জুর-কণ্টকের আঘাতে তাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, অঙ্গেও আঘাত লাগিয়াছে এবং নানাস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। নিকটে একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ছিল; মণিয়া তাহাতে নামিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল এবং ক্ষতস্থান ধৌত করিল। সে যেস্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে স্থানটা নগরোপকণ্ঠ; পথে লোকজন ছিল না, মধ্যে মধ্যে দূরে শকটচক্র-নির্ঘোষ শুনা যাইতেছিল। মণিয়া পুষ্করিণী-তীরে তালবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল।

বেলা বাড়িল; ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল; খর্জ্জুরবৃক্ষের স্বল্পছায়া দূরে সরিয়া চলিল; মণিয়া তাহা বুঝিতে পারিল না, সে সেই প্রচণ্ড নিদাঘ-রৌদ্রে বসিয়া রহিল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। সে পথে যে দুই-একজন লোক চলিতেছিল, তাহারাও ছায়ায় আশ্রয় লইল। মণিয়া বসিয়াই রহিল। তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হইলে যে স্থানে খর্জ্জুরবৃক্ষের ছায়া ছিল, সে স্থান হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "আহা, বহিন, তোমার দেহটা যে জ্বলিয়া গেল, এমন সোণার অঙ্গ মলিন হইয়া গেল?" মণিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল এবং দেখিল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া সরস্বতী বৈষ্ণবী উভয়হস্তে খঞ্জনী বাজাইতেছে। সে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন আসিলে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই?" "বুঝিতে পারিবে কি বহিন! প্রেমবিষ যাহাকে জর-জর করে, তাহার কি বাহ্যজ্ঞান থাকে? এই প্রচণ্ড বৈশাখ মাসের রৌদ্র, আর তুমি কি না একপ্রহর কাল ধরিয়া খালি

মাথায় রৌদ্রে বসিয়া আছ!" "আমি কি রৌদ্রে বসিয়া আছি? কেন, আমি ত ছায়ায় বসিয়া ছিলাম!" "সে যে প্রায় দুই প্রহরের কথা। বাপ! রৌদ্র বলিয়া রৌদ্র, আমার মাথার গামছাখানা চারিবার শুকাইয়া গেল! একবার করিয়া শুকায়, আবার ভিজাইয়া আনি; কিন্তু তুমি ত একবারও নড়িলে না? এ কি যেমন-তেমন বিষ, প্রেমবিষ—কালসাপের বিষ অপেক্ষাও তীব্র।" তাহার কথা শুনিয়া মণিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরে ধীরে ধীরে কহিল, "আশনাই কি জহর? বহিন, প্রেম কি বিষ? দেখ, এই হাজার হাজার বছর ধরিয়া কবিকুল প্রেমের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে,—যাহার জন্য দুনিয়া পাগল। তাহা কি বিষ,—ইহা কি সম্ভব?"

সরস্বতী খর্জ্জুরবৃক্ষের ক্ষীণ ছায়া হইতে উঠিয়া আসিয়া মণিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে ছায়ায় লইয়া গেল। পুষ্করিণী হইতে দুই তিন বার গামছা ভিজাইয়া আনিয়া তাহার হাতে-মুখে জল দিল; কিন্তু মণিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি অনুভব করিল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন, আশ্‌নাই কি জহর? তুমি বোধ হয় বড় দাগা পাইয়াছ? দেখ, কবি মজনু আশ্‌নাইয়ের জন্য দেওয়ানা হইয়া গিয়াছিল। সে কি জহর?" সরস্বতীর মুখ দৃঢ় হইল, সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বহিন, এখনও তোমার রূপ-যৌবন পূর্ণমাত্রায় আছে সুতরাং আশ্‌নাই ত মিঠা লাগিবেই! এই রূপ আর এই যৌবন যখন ঐ সূর্য্যের মত পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িবে, যখন মধুর অভাব বোধ করিয়া ভ্রমর

আর আসিবে না ; তখন বুঝিবে যে প্রেম বিষ এবং এ বিষ যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার আর উদ্ধার নাই। দেখ বহিন, এই সরস্বতী বৈষ্ণবী এমন চেহারা লইয়া তুনিয়ায় আসে নাই। এমন দিন ছিল, যেদিন কত কত রাজা-রাজড়া তাহাকে দেখিবার আকাঙ্খায় দরিদ্র বৈষ্ণবের কুটীরের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সে দিন গিয়াছে ; এখন আর সরস্বতী মাটীতে পা দিলে তাহার পায়ের তলে পদ্মবর্ণ ফুটিয়া উঠে না, হাসিলে গণ্ডস্থলে গোলাপের আভা দেখা দেয় না ; সেইজন্য সরস্বতীও ফুলের বাস ছাড়িয়া এই গৈরিক ধরিয়াছে, কারণ তাহার চারিদিকে তাহার যৌবনের রূপমাধুর্য্যের আকর্ষণে যে শত শত ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বেড়াইত, কালধর্ম্মে তাহারা ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। বহিন, এমন দিন চিরদিন থাকিবে না। এই চাঁপার বরণ জ্বলিয়া কাল হইয়া যাইবে ; ঐ চোখের কোলে বিষের জ্বালা কালির দাগ টানিয়া দিবে ; ঐ কোকিল-কূজনের মত কণ্ঠস্বর হয় ত দাঁড়কাকের আওয়াজ ধরিবে।—তখন বুঝিবে এ বাঙ্গালী সরস্বতী বৈষ্ণবী কেন এ কথা বলিয়াছিল। বহিন, ফিরিয়া যা ; গেরুয়া ধরিবার অনেক সময় আছে,—এই ত তোর প্রথম যৌবন, সারাটা জীবন দীর্ঘ পথের মত সম্মুখে পড়িয়া আছে। ফিরিয়া যা। যতদিন যৌবন আছে, ততদিন উপার্জ্জন করিয়া নে ; তাহা হইলে বুড়া বয়সে আর সরস্বতীর মত খঞ্জনী বাজাইয়া মুরশিদাবাদ ও পাটনার পথে-পথে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতে হইবে না।”

প্রৌঢ়ার রেখাদীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া তুই বিন্দু অশ্রু বহিল,

কোমল-হৃদয়া মণিয়া তাহা দেখিয়া ব্যথা পাইল। সে তাহার গৈরিক বসনের অঞ্চল দিয়া সরস্বতীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কাঁদ কেন বহিন, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় কি?" "কাঁদি কেন? বহিন, তাহা এখন বুঝিতে পারিবে না, যতদিন উপায় থাকে মানুষ ততদিন বুঝিতে পারে না। এই দেখ তুমি না জানিয়া না বুঝিয়া প্রথম যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছ কেন? পুরুষ-ভ্রমর বুঝি দুই দিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছে, দুইদিন বুঝি অনাদর করিয়াছে?" "না।" "তবে কি?" "বহিন, আমার ভ্রমর একদিনের জন্যও আমার কামনা করে নাই।" "তবে তুমি এ বেশ ধরিয়াছ কেন?" "কেন, তাহা বলিতে পারি না বহিন! আমি যাঁহার চরণে মন সমর্পণ করিয়াছি, সে ধন আমার অপ্রাপ্য—দুষ্প্রাপ্য নহে বহিন—অপ্রাপ্য।" সরস্বতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণিয়া তাহা দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইয়া বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সরস্বতী কহিল, "বহিন, স্ত্রীলোক এমন করিয়াই মরিয়া থাকে। যতদিন সময় থাকে, রূপ থাকে, যৌবন থাকে, ততদিন রমণী নিজের অসীম ক্ষমতা বুঝিতে পারে না। সে ক্ষমতা যখন যায়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে কি আধিপত্য হেলায় হারাইয়াছে। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। যাহার জন্য যোগিনী সাজিয়াছ, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিও না। গৈরিক ছাড়িয়া ফুলের সাজ ধর, দেখিবে দুইদিন পরে সে আপনিই তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে।" "বহিন, আর যদি সে না পড়ে?" "তাহাতে

ক্ষতি কি বহিন? একটা না পড়ে আর দশটা পড়িবে।” “তাহা হয় না বহিন, এই দুনিয়ায় সেই একজনই আমার সব; সে যদি না আসে, এ দুনিয়া আঁধার।” “ঐ ত মরণের লক্ষণ বহিন! ঐ করিয়া আমি মরিয়াছি,—আমার মত শত শত মরিয়াছে। চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি, তুমিও মরিতে যাইতেছ। তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি, তবু তুমি ত বুঝিতেছ না! পুরুষ তোমাকে যে চোখে দেখে, তুমি আমি ত তাহাকে সে চোখে দেখিতে পারি না; পুরুষ জানে যে আমরা তাহা পারি না এবং এই সন্ধিস্থল জানে বলিয়াই কঠিন পুরুষ চিরদিন অবলা নারীজাতিকে হেলায় পদদলিত করিয়া থাকে। শোন্ বহিন, এখনও সময় আছে, ঘরে ফিরিয়া যা। যদি তোর সে এতই কঠিন হয়, তবে তাহাকে ভুলিয়া যা। তাহার কঠিনতা কি তোকে কঠিন করিতে পারে না?”

বৈষ্ণবীর কথা শুনিতে-শুনিতে মণিয়া আবার অশ্রুধারায় অন্ধ হইয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, “না, পারিব না বহিন, পারি কৈ? অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, ভুলিতে পারি কৈ? শোন বহিন, আমি বেশ্যাকন্যা, বেশ্যাবৃত্তি আমার পেশা। আমার পিতামাতা ইচ্ছা করিয়া আমাকে এই বৃত্তি অবলম্বন করাইয়াছে, সুতরাং স্বভাবতঃ আমার মন সচরাচর পুরুষ অপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। কিন্তু আমি ত কঠিন হইতে পারি নাই। তিনি আমার পক্ষে দেব-দুর্লভ,—তিনি স্বর্গের দেবতা, আমি কৃমি। তাঁহার পদস্পর্শ

আমার পক্ষে অসম্ভব বহিন, আমার মাতা হিন্দু, পিতা মুসলমান; আমি জারজা; আর তিনি সদ্বংশজাত হিন্দু, বাদ্‌শাহের সভায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আমার পক্ষে তিনি দেবদুর্লভ, তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক্ দর্শনও আমার পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা। বহিন, তোমার চোখে জল দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, তুমিও জ্বলিয়াছ,—আমা অপেক্ষা শতগুণ, সহস্রগুণ জ্বলিয়াছ। বহিন, যে আমার মত হীনা, তাহার মনে এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন আসে? যে কীট, সে কেমন করিয়া দেবদুর্লভ পদ কামনা করে? এ দুর্দ্দমনীয় আশা, এ অশেষ বাসনা, এ অদম্য মনোবেগ যেখানে অসম্ভব,—যিনি হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর, যিনি দিন-রাত্রির সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি সেখানে কেন তাহা আসিতে দেন, কেন দেন,—তুমি ত হিন্দু, তাহা বলিতে পার কি?”

অশ্রুধারায় মণিয়ার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। সরস্বতীও উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। বহুক্ষণ পরে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “বহিন, কে সে? কেমন পুরুষ সে, যে তোমার এই প্রথম যৌবন, তোমার এই অতুল রূপরাশির ডালি হেলায় উপেক্ষা করে? সে কেমন, তাহাকে একবার দেখিতে চাই। পুরুষ-ভ্রমর-সমাজেও এমন পুরুষ দুর্লভ।” বৈষ্ণবীর প্রশ্ন শুনিয়া মণিয়া অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। প্রায় একদণ্ড পরে সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, “বহিন, আমার অপরাধ লইও না। আমি নীচ, তিনি পবিত্র। আমি কলুষিতা। শুনিয়াছি, হিন্দুর পক্ষে যবনী দর্শন হেয়,—বারনারী-স্পর্শ অধর্ম্ম। তাঁহাকে দেখিলে

মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যদি কিছু বলিয়া ফেলি ? না বহিন, তুমি আমাকে লোভ দেখাইও না, মাফ করিও। হিন্দু ও মুসলমানের যিনি একমাত্র ঈশ্বর, তিনি তোমার মঙ্গল করুন।"

মণিয়া এই বলিয়া উঠিল। সরস্বতী বসিয়াই রহিল। মণিয়া একমনে পথ ধরিয়া সহরের দিকে চলিল। সে চক্ষুর অন্তরাল হইবার পূর্ব্বে সরস্বতী অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিল। তখন অপরাহ্ণ; নগরোপকণ্ঠের পথেও দুই-একজন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরস্বতী মণিয়ার অনুসরণ করিতে করিতে চকের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানে এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া তালপত্রের ছত্রের অন্তরালে মুখ লুকাইল। সরস্বতী কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন হইতে সরস্বতী মণিয়ার, এবং সেই নবাগত সরস্বতীর অনুসরণ করিতে লাগিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মুন্‌শীর পত্র

"কাল বিড়ালের লেজ একতোলা, কাণা হরিণের শিং এক-তোলা, আর বাদুড়ের ডানা একতোলা—এই তিনটি মিলাইয়া দুইসের জলে নূতন হাঁড়ীতে চাপাইবে। যতক্ষণ জ্বাল দিবে,

বামদিকে ফিরিবে না, বাম অঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিবে না, খাটি এক পোয়া থাকিতে নামাইবে।”

“জী, এমন জিনিস কোথায় পাইব?” “সমস্ত মৌজুদ বিবি-জান, একমাত্র কড়ির কথা। কড়ি ফেলিলেই সমস্ত হাজির। আর এই একখানা তাবিজ বোগ্দাদের পীর মক্কাশরিফ হইতে আজমীরসরিফে আনিয়াছিলেন; এবং ইহার জোরে আলমগীর বাদশাহ তখ্ত পাইয়াছিল, দারাশেকোর কাফেরী ছুটিয়া গিয়াছিল।”

“আমি বড় গরীব, এত পয়সা কোথায় পাইব যে এখন তাবিজ কিনিয়া লইয়া যাইব?” “বিবিজান, আমার ওস্তাদের হুকুম, যে যেমন লোক, তাহার কাছে সেই রকম দাম লইবে,—তাহা না হইলে কি আমাদের ব্যবসা চলে? খোদা যাহাকে বুলন্দ করিয়াছেন, সে যদি আমার মত গরীবের নিকট কোনও উপকার পায়, তাহা হইলে সে তাহার ওজন মাফিক দেয়;—আর দেওয়ানা ফকীর, সে আর কি দিবে,—দোয়া করিয়া যায়।” যাহারা বুজরুককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে এক-জন বলিয়া উঠিল, “ওঃ নবীবখ্শ মিঞা কি মেহেরবান!” বুজরুক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, “বিবিজান, ঔষধের জন্য এক টাকা, আর তাবিজের দুই টাকা দিয়া তুমি জিনিস লইয়া যাও,—মতলব হাসিল হইলে যাহা তোমার মনে আসে দিয়া যাইও।”

মতিয়া তিনটাকা দিয়া তাবিজ ও ঔষধ লইয়া গৃহে ফিরিল।

উপরে উঠিয়া দেখিল যে, তাহার কন্যা কেশবিন্যাস করিতেছে। সে প্রথমে তাহাকে তিরস্কার করিতে যাইতেছিল; তাহার পরে কি ভাবিয়া আর কোনও কথা কহিল না,—তাবিজ ও ঔষধ লুকাইয়া রাখিয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিল। প্রসাধন শেষ হইলে মণিয়া ডাকিল, "আম্মা!" মতিয়া মশলা পিষিতে-পিষিতে কহিল, "কেন?" "ওস্তাদরা আসিবে না?" "কেমন করিয়া জানিব বল?" "ডাকিতে পাঠাও।" "কেন, তোমার কি মজুরা আছে না কি?" "আছে।" "কোথায়? কেহ ত বায়না করিয়া যায় নাই!" "ফরীদ খাঁ যে আমাকে বায়না দিয়া রাখিয়াছে,—কাল অনেক রাত্রিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া দিতে মনে ছিল না।" মণিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে দুইটা নূতন আশরফী খুলিয়া লইয়া মাতার হস্তে দিল। বৃদ্ধা অর্থ লইয়া, মশলা ফেলিয়া রাখিয়া, ওস্তাদ ডাকিতে চলিল।

মণিয়া নীচে নামিয়া আসিল; এবং এক প্রতিবেশী পুত্রকে একটা ডুলি আনিতে বলিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। বালক ডুলি ডাকিতে গেল, মণিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। ক্ষণকাল পরে সে দেখিতে পাইল যে, সরস্বতী বৈষ্ণবী আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মণিয়া হাসিল, কিন্তু নড়িল না। সরস্বতী তাহার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে দুই তিনবার তাহার দিকে চাহিল। মণিয়াও তাহাকে দেখিল; কিন্তু সে যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন ভাব প্রকাশ করিল না। সুতরাং সরস্বতীও তাহার সহিত কথা কহিতে ভরসা করিল না। সরস্বতী চলিয়া

গেল ; কিন্তু মণিয়া তখনও দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্ত পরে তালপত্রের এক ছত্র মাথায় দিয়া এক ব্যক্তি সেই পথে আসিল। সেও মণিয়াকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল এবং তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। মণিয়া তাহার সহিতও কথা কহিল না। ডুলি আসিল, ওস্তাদও আসিল ; মণিয়া ফরিদ্ খাঁর উদ্যানে চলিয়া গেল। মতিয়া আশ্বস্তা হইয়া ঔষধ জ্বাল দিতে বসিল।

সরস্বতী সন্ধ্যাকালে নগরপ্রান্তে এক ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ করিল। সেটা বৈষ্ণবদিগের একটা আখড়া ;—একজন মহান্ত তাহার একটি সেবাদাসী এবং অনেকগুলি চেলা ও চেলী লইয়া সেই আখড়ার অধিবাসী। মহান্ত অঙ্গনে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছিলেন। দুই একজন চেলা প্রসাদের প্রত্যাশায় নিকটে বসিয়া ছিল। সরস্বতী আখড়ায় প্রবেশ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। মহান্ত স্মিতমুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৈষ্ণবী দিদি, কি হোইলো, মতলব হাসিল ?" সরস্বতী কহিল "ছাই হাসিল বাবা! আমি যে আর কতদিন এমন করিয়া বসিয়া থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। বাবা, একটা জরুরী কাজ আছে, একখানা চিঠি পাঠাইতে হইবে।" "বৈষ্ণবী দিদি, তোমার সমস্ত কামই জরুরী। এখন সন্ধ্যাবেলা চিঠি লিখিবে কে, ভেজিবে কে ?" "না বাবা, বড় জরুরী কাজ, এখনই একজন লোক পাঠাইয়া দাও।" "লোক এখন আসিলে বহুত পয়সা লাগিবে।" "লাগুক, নগদ একটাকা দিব।"

কস্‌বী,—মনের কামনা দূর করিয়া ফেলিয়া দিব; বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অনলে দগ্ধ করিয়া—"মণিয়া আর বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার তাহার হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন; এবং ধীরে-ধীরে কহিলেন, "মা, তুমি আমার দুর্গার মত চির-দুঃখিনী; আজি হইতে আমার নিকট দুর্গাও যে, তুমিও সে। বস, শুন, —অসীম শত্রু-বেষ্টিত; কিন্তু সে নিরপরাধ। তাহার শত্রুবর্গ প্রবল; আর অসীম বালকের মত অসন্দিগ্ধ-চিত্ত। আমি ষাট বছরের বুড়া; কিন্তু এ কথা কাল সন্ধ্যাকালে বুঝিতে পারিয়াছি মা। অসীম যখন শিশু, তখন তাহার পিতা তাহার অন্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ; কারণ, এইমাত্র অ... আমার করে সমর্পণ করিয়া ...ল।" মুনশী জেবে হাত দিয়া দেখিল টাকা...াম। মোহে আচ্ছন্ন সে টাকাটি লইয়া তাহার অনুসরণকারীকে বহু ধন্যবা... বায় আজ

দ্বিতীয় ব্যক্তি এই সময়ে মুনশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আখড়ায় থাকেন?" মুনশী কহিল, "রাম রাম, আমি শকসেনা কায়স্থ,—আমি আখড়ায় থাকিতে যাইব কেন? এক বাঙ্গালী আউরৎ একখানা জরুরী খৎ লিখাইবার জন্য একটাকা কবুল করিয়া ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আখড়ায় কি ভদ্রলোক থাকে?" "মহাশয় কি এই দেশের লোক?" "রাম রাম, বাবুজী, এই পাটনা সহর দোজখ্। আমার নিবাস লখনউ, আমি ওয়াকিয়ানবীশের নকলনবীশ।" "কত দিন আছেন?" মুনশী দরিদ্র; সহানুভূতি পাইয়া সে একেবারে গলিয়া গেল এবং তাহার মনে যত দুঃখ সঞ্চিত ছিল তাহা আগন্তুককে

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নবীন দূত

যখন হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার পাটনা নগরে মণিয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন মুরশিদাবাদের পরপারে ডাহাপাড়া গ্রামে, গঙ্গাতীরে কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নাপিত চোপ্‌দারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "কর্ত্তা কি খৌরী হইবেন?" চোপদারের হৃদয় প্রেমপ্রবণ, সে কহিল, "নবীনদাদা, একবার তামাকু ইচ্ছা করিবে না কি? কলিকা তৈয়ার,—তুমি সেবা কর, আমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" চোপদার হুঁকা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া নবীনের হস্তে দিল। নবীন তাহা লইয়া দ্বারের সম্মুখে উপবেশন করিল। চোপদার অন্দরে প্রবেশ করিল।

অন্দরে সুদীর্ঘ প্রশস্ত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া কানুনগোই হরনারায়ণ তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দুই গজ পরিমাণ ভূমি ব্যাপিয়া তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী বিরাজ করিতে-ছিলেন। একজন দাসী তালবৃন্ত লইয়া গৃহিণীকে ব্যজন করিতে-ছিল; অপরা একটি প্রকাণ্ড ছিলিমচি স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তৃতীয়া এক বিশাল তাম্বুলাধার উভয় হস্তে গৃহিণীর সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কর্ত্তা কহিলেন, "তাই ত, আপদ যে গিয়াও যায় না।" গৃহিণী কহিলেন, "তোমার এত ভয় কেন?" গৃহিণী

তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। বিশেষতঃ, এই দলিল-অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তি দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার যখন আমার নাই, তখন আর আমি কি বলিব?” “সুদর্শনকে কি তোমার আবশ্যক আছে?” “আমার আবশ্যক না থাকিলেও, বাদ্‌শাহ তাহাকে ছাড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।” “স্ত্রীলোক-গুলিকে লইয়া বড়ই বিপদ হইল। যখন ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া আসি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, দুই-এক দিন পরে হর-নারায়ণ স্বয়ং আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। কারণ মানুষ এত সহজে অত দিনের প্রেম, জীবন-ব্যাপী বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইতে পারে না। ভুল অসীম, বড় ভুল,—কামিনী-কাঞ্চনের জন্য মানুষ পারে না এমন কার্য্য নাই। স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া বড় বিপদ হইল; সংসারে পুরুষ মাত্র আমরা দুইজন;—একজন যদি বাদ্‌শাহের সহিত দিল্লী যায়, আর অপর যদি মুরশিদাবাদ যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকগুলা কোথায় যায়?” “যাইবে আর কোথায়,—আপনি সঙ্গে লইয়া যান।” “তাহারা আমার সহিত গেলে সুদর্শনের কষ্ট হইবে না?” “কিসের কষ্ট? আর সে যুদ্ধ-যাত্রী—স্ত্রীলোক লইয়া যাত্রা তাহার অসম্ভব। আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; সুতরাং আপনার সহিত তাহাদের যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।”

পরিবারস্থিত স্ত্রীলোকগণের প্রসঙ্গ-কালে হরিনারায়ণ বিদ্যা-লঙ্কারের চক্ষুর কোণে বিষণ্ণতা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু অসীমের কথা শুনিয়া, তাঁহার মুখ আবার প্রসন্ন হইল। তিনি কহিলেন,

"তবে তাহাই হউক; তুমি কিন্তু আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া, বিষয় সম্বন্ধে কাহাকেও কোনও কথা দিও না, অথবা কোন কাগজপত্র সহি করিও না।" "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে। আপনি কি এখন মুরশিদাবাদে যাইবেন?" "উপস্থিত দুই-চারি দিন নহে।" "আমাদের বোধ হয় শীঘ্রই দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে।" "তবে আমি এখন আসি। তোমরা দুইজন খুব সাবধানে থাকিও; কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না। জানিয়া রাখিও, হরনারায়ণের গুপ্তচর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে।" "চরটা কে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়?" "সরস্বতী বৈষ্ণবী ত একজন; তাহার সহিত আর কয়জন আছে, তাহা বলিতে পারি না।"

হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার বিদায় হইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে সরস্বতী বৈষ্ণবীও তাঁহার অনুসরণ করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কালীপ্রসাদ

"কৈ ঠাকুর, কড়ি কৈ?" "তাই ত বাবা, কড়ি ত নাই।" "ওসব ন্যাকাপনা রাখ ঠাকুর, ভেবেছ যে, পায়ের ধূলা দিয়া হীরাপাটনীর কাছে পার হইবে! এমন জিনিসটি হবার জো

নাই। দেখ ঠাকুর, যদি ভাল চাও, তবে কড়ি রাখিয়া নৌকা হইতে নাম।" "বড় বিপদে ফেলিলে বাপু! আসিবার সময় খেয়ার কড়ি ভাঙ্গাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে।" "তাহার জন্য চিন্তা নাই। টাকা বাহির কর, আমিই ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।" "টাকা নহে বাপু, আমার নিকট মোহর আছে।" "আঃ, ঠাকুর হীরাপাটনী কি তাহাতে ডরায়? ভাল, মোহরই বাহির কর।" ব্রাহ্মণ কোঁচার খোঁট হইতে নস্যের আধার, এবং তাহার মধ্য হইতে একটি নস্যরঞ্জিত সুবর্ণ-মুদ্রা বাহির করিল; এবং তাহা পাটনীর হস্তে দিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিল। পাটনী তাহা জলে ধুইয়া লইল, এবং আর একজন যাত্রীকে দিয়া কহিল, "দেখ ত ভাই, মোহরটা আসল কি না?" সে ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ লোক। সে কাছার খোঁট হইতে একটি থলিয়া বাহির করিল। সেই থলিয়ার ভিতর হইতে একখানি কষ্টি, এক শিশি তৈল, আর দুই টুক্‌রা সোণা বাহির হইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তুমি কি সেকরা?" সে ব্যক্তি কহিল, "আজ্ঞা না, আমরা নরসুন্দর।" "নাম?" "নবীন দাস।" "নিবাস?" "পূর্ব্বে ছিল রুকনপুর, উপস্থিত ডাহাপাড়া।" "কোন্ ডাহাপাড়া?" "শহরের পশ্চিম পার?" "ঢাকার পশ্চিম পারে ত কোন ডাহাপাড়া নাই?" "ঢাকা কেন ঠাকুর, শহর বলিলে কি ঢাকা বুঝায়? শহর ত শহর মুরশিদাবাদ।" তাহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিল। নবীন মোহর পরীক্ষা করিল; এবং তাহা পাটনীর হস্তে দিয়া মাথা নাড়িল।

পাটনী বারটি টাকা ও একখণ্ড কম এক কাহন কড়ি ব্রাহ্মণকে দিল। নৌকা তীরে লাগিল। যাত্রিগণ নামিল, ব্রাহ্মণও তাহাদিগের সহিত নামিল। নবীন দাস ব্রাহ্মণের সঙ্গ হইল।

কিয়ৎক্ষণ চলিতে চলিতে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল; এবং দেখিল যে, দূরে থাকিয়া নবীন দাস তাহার অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সেইস্থানে পথটি অত্যন্ত বক্র বলিয়া নবীন তাহা দেখিতে পাইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বৃক্ষতলে অন্ধকার ঘন; সুতরাং যে বৃক্ষতলে ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিল, নবীন দাস যখন তাহার নিকটে আসিল, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাইয়াও নবীন দাঁড়াইল না,—ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে বনমধ্যে পথের রেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া নবীন দাঁড়াইতে বাধ্য হইল; কারণ সেই স্থানে পথের উপরে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ পড়িয়াছিল; এবং তাহা সরাইতে নবীনের সাহসে কুলাইল না। একে রাত্রিকাল, তাহার উপর জনশূন্য অরণ্য; কোন দিকে মানুষের আবাসের চিহ্নমাত্র নাই। নবীন এদিক-ওদিক চাহিয়া ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে বিষম ফাঁপরে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া সে স্থির করিল যে, গঙ্গাতীরে ফিরিয়া যাইবে। সে দুই-একপদ অগ্রসর হইবামাত্র সম্মুখে একটা দীর্ঘ নরকঙ্কাল দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তাহার পতনের সঙ্গে-সঙ্গে কঙ্কালটাও পড়িয়া গেল; এবং বৃক্ষ হইতে এক মনুষ্য-মূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া কঙ্কালটা উঠাইয়া লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া, নবীনের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিল; এবং অনায়াসে তাহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার সহিত আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক তাঁহাকে দেখিয়া নবীন দাসের দেহ নামাইয়া রাখিল; এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব, ইহাকে কি আপনি আনিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, "আমি আনি নাই বটে, তবে এ ব্যক্তি আমার জন্যই বনে আসিয়াছে।" "সে কি? এ কি তবে দীক্ষিত?" "উহার নাম নবীন দাস, জাতিতে নাপিত। খেয়ার কড়ি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সেইজন্য একটা মোহর বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই মোহর দেখিয়া নবীনচন্দ্র আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বনে আসিয়াছে।" "জগদম্বার ইচ্ছা প্রভু, মা'র বুঝি এত দিনে তৃষ্ণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে?" "কেন কালী-প্রসাদ, এত পশুতেও কি মা তৃপ্তা নহেন?" "গুরুদেব, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।" "আশ্চর্য্য নহে কালীপ্রসাদ,—আমি কোন দিনই মহাবলির পক্ষপাতী নহি।" "এমন আজ্ঞা করিবেন না প্রভু! অমানিশার মহানিশায় মা মহামায়া মহাবলি ভিন্ন মহাতৃপ্তি লাভ করেন না।" "ইহাকে কি বলি দিবে না কি?" "চারি মাস যাবৎ একটিও ফাঁদে পড়েনাই প্রভু; সুতরাং বলি না দিয়া আর উপায় কি?"

নবীন দাসের ততক্ষণে জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু প্রভু-শিষ্যের কথোপকথন শুনিয়া তাহার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছিল। সে বদ্ধাবস্থাতেই গড়াইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল; কারণ কালীপ্রসাদ তাহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সে দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হইল। তখন গুরু শিষ্যকে কহিলেন, "দেখ কালীপ্রসাদ অমাবস্যার বিলম্ব আছে; সুতরাং ইহাকে তোমার অনেক দিন ধরিয়া রাখিতে হইবে।" শিষ্য কহিল, "প্রভু, অনুমতি করিলে শুক্লপক্ষেই ইহার সদ্গতি করিয়া দিই।" "তাহাতে আর প্রয়োজন নাই। আমি বলি কি, ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" কালীপ্রসাদ চমকিত হইয়া উঠিল; এবং কহিল, "প্রভু, বলেন কি! এমন কাজ করিলে কি মহামায়া আর রক্ষা রাখিবেন? চারিমাস মহাবলি না পাইয়া মহামায়ার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আছে। সেইজন্য মা নিজের বলি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কালীপ্রসাদ!" অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কালীপ্রসাদ কহিল, "আজ্ঞা?" "তুমি জান, আমি কে?" বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় অবনত মস্তকে শিষ্য কহিল, "জানি প্রভু!" "ইহাকে লইয়া গিয়া, মহামায়ার মন্দিরে বজ্রকুট্টিমে রাখিয়া আইস।"

নবীন যখন পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিল, তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না যে, সে কোথায় আসিয়াছে। সে যে-স্থানে পতিত ছিল, তাহার অদূরে একটা পুরাতন মন্দিরমধ্যে অগ্নি

জ্বলিতেছিল। তাহার আলোকে দেখিতে পাইল যে, সে একটা ক্ষুদ্র কক্ষে পতিত আছে। কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া নবীন দাস তৃতীয়বার মূর্চ্ছিত হইল। সে দেখিয়াছিল যে, কক্ষের দুইটি দ্বারে দুইটা দীর্ঘ নরকঙ্কাল ত্রিশূল হস্তে দাঁড়াইয়া আছে; এবং তৃতীয় দ্বারে একটা বৃহৎ বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। শীতল কর-স্পর্শে তাহার জ্ঞান পুনরায় ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সেই ব্রাহ্মণ তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে জল সেচন করিতেছেন এবং কঙ্কালদ্বয় ও সর্প অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাপু, কেমন আছ?" প্রত্যুত্তরে নবীন আর কোন কথা কহিল না; কিন্তু তাহার চক্ষুর কোণ দিয়া একবিন্দু জল গড়াইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন একটু নরম হইল। তিনি মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি উঠিয়া আইস।" নবীন উঠিল এবং ঘরের চারি দিকে চাহিয়া যখন ত্রিশূলধারী কঙ্কাল বা বিষধর সর্প দেখিতে পাইল না, তখন সে ধীরে-ধীরে গৃহের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া নবীন দেখিল যে, একটা বহু পুরাতন ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের সম্মুখে কতকটা পরিষ্কৃত স্থান। মন্দিরমধ্যে বৃহৎ কুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে,—পূজক কালীপ্রসাদ। তাহার পশ্চাতে একটা মৃতদেহ, দুই-তিনটা সর্প ও কতকগুলা শৃগাল বসিয়া আছে। মন্দিরের অঙ্গনে, তিন দিকে তিনটা জীর্ণ পুরাতন গৃহ এবং তাহারই একটার মধ্যে সে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ মন্দিরাঙ্গন পার হইয়া অপর পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন,

—নবীন দাসও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। শিবা ও সর্পগুলি তাহাদিগকে দেখিলও না।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আহার করিবে কি?" নাপিত-পুত্র মাথা নাড়িল। "তৃষ্ণা পাইয়াছে কি?" নবীন দাস কহিল, "হাঁ।" ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত মৃৎপাত্রে জল পান করিয়া নবীন দাস গৃহের এক কোণে উপবেশন করিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বাপু, তুমি বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, এখানে আমার সাহায্য ব্যতীত তোমার আর রক্ষা নাই?" প্রত্যুত্তরে নবীন দাস সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, আমার পাছু লইয়াছিলে কেন?" নবীন কহিল "চোর-ডাকাইতের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য।" "ভাল কথা,—আমার সঙ্গে আসিলে না কেন?" "পাছে আপনি সন্দেহ করেন। প্রভু, আমি কোন মন্দ অভিসন্ধিতে আপনার পাছু লই নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মোহরের অভাব নাই।" নবীন এই বলিয়া কোঁচার খুঁট হইতে দশ খান মোহর খুলিয়া ব্রাহ্মণকে দেখাইল। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভাল কথা। তোমাকে প্রভাতে বাদশাহী সড়কে পৌছাইয়া দিয়া আসিব।" নবীন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "প্রভু, সকাল হইলে কাল ঠাকুরটি যদি না ছাড়েন?" "তুমি চিন্তা করিও না। আমি এখানে থাকিতে আর কেহ তোমাকে স্পর্শ করিতে ভরসা করিবে না। এখনও প্রায় এক প্রহর রাত্রি

অবশিষ্ট আছে,—তুমি কি বিশ্রাম করিতে চাহ?” বিশ্রামের নামে নবীন শিহরিয়া উঠিল; এবং কহিল, “প্রভু, বিশ্রাম করিব কি—এখানে পা ফেলিতে অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে, এখনই সাপে খাইবে,—না হয় ত উপদেবতার হস্তে প্রাণটা যাইবে।” “তবে জাগিয়াই থাক; কিন্তু ভয় পাইও না।”

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জলে অগ্নি

পূজা সাঙ্গ হইলে কালীপ্রসাদ গৃহের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, “গুরুদেব, মহাপ্রসাদ?” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “বাপু হে, অদ্য আমার উপবাসের দিন; তুমি আহার করিয়া বিশ্রাম কর।” শিষ্য চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ একটা বৃহৎ তাম্রকুণ্ডে জল ভরিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে রাখিলেন, এবং দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। নবীন ভয়ে তটস্থ হইয়া ব্রাহ্মণের দিকে ঘেঁসিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ স্থির, নিশ্চল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীনের মনে হইল যে, তাম্রকুণ্ডের জলে চন্দ্রালোক আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে গৃহের দ্বার ও বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিল, কোন দিক হইতেই কক্ষমধ্যে চন্দ্রালোক আসিতেছে না। তখন সে অত্যন্ত ভীত হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানহারা হইল না।

দেখিতে দেখিতে তাম্রকুণ্ডের জলে অগ্নিশিখা খেলিয়া

বেড়াইতে লাগিল। প্রাণভয়ে নবীনদাস ডাকিল, "প্রভু, ঠাকুর!" কেহ উত্তর দিল না। তখন নবীনদাস ভয়ে ঘরের চারিদিক হাতড়াইয়া বেড়াইল; কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। সে ভয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতি দুয়ার হইতে এক-একটি সর্প তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিল। তাম্রকুণ্ডের জল আগুন লাগিয়া দপ্‌দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—ধূমে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া নবীন এক কোণে বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সে বসিয়া বসিয়াই জ্ঞান হারাইল।

তখন অন্ধকার হইতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, তুমি কি জাগিয়া আছ?" উত্তর হইল, "না।" "তবে উত্তর দিতেছ কেমন করিয়া?" "আপনার আদেশে।" "উত্তম, তাম্রকুণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ।" "দেখিতেছি।" "কি দেখিতেছ?" "জল জ্বলিতেছে।" "আর কি?" "ধূম। ধূমের মধ্যে একটা মানুষ। স্ত্রীলোক, বয়স অল্প; তেমন সুন্দরী নহে, সন্ন্যাসিনীর বেশ। কোন এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে। কি বলিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, সে বলিতেছে, 'যদি আমি সতী হই, তাহা হইলে আমার মনের বলে আমার স্বামী আবার ফিরিয়া আসিবে, আবার আমাকে গ্রহণ করিবে,—তোরা দেখিবি, দেখিবি, দেখিবি।' আর একদল রমণী তাহাকে পরিহাস করিতেছে।" অন্ধকার হইতে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বৈশ্বানর, বর্ত্তমান হইতে

অতীতে যাও। নবীন কি দেখিতেছ?" "রাত্রি শেষ। সেই গৃহের চারিদিকে অনেকগুলা কুক্কুর কলরব করিতেছে। অঙ্গনে অনেক কলার পাতা পড়িয়া আছে,—বোধ হয় রাত্রিতে বৃহৎ ভোজ ছিল। চেলীর কাপড় পরিয়া বর ও বধূ সেই অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কেহ তাহাদিগের সহিত আসিল না। বাড়ীর সকলে ঘুমাইতেছে। বর বধূকে কি বলিল, বধূ কাঁদিতেছে। বর তাহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার চেলীর উত্তরীয় বধূর সাটীর সহিত বাঁধা রহিল। বধূ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে, চারিদিক হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ মূর্চ্ছিতা বধূকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ তাহাকে গালি দিতেছে, কেহ দুঃখ করিতেছে, কেহ বা তাহার মুখে জল ছিটাইতেছে। বধূ উঠিল; কিন্তু সে কাহারও তিরস্কার মানিল না, সান্ত্বনা লইল না। স্বামীর পরিত্যক্ত উত্তরীয় অঙ্গে জড়াইয়া কহিল, সে সতী,—তাহার স্বামী যেখানেই থাকুক, তাহার সতীত্বের বলে আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে।" অন্ধকার হইতে পুনরায় কে কহিল, "আরও দূরে যাও।" নবীন আবার বলিতে আরম্ভ করিল "প্রশস্ত নদীতীরে দীর্ঘ অট্টালিকা। তাহার দুয়ারে দুইটা হাতী দাঁড়াইয়া আছে। আটজন গোলাম একখানা রূপার তাঞ্জাম বহিয়া আনিল। অট্টালিকার মধ্য হইতে দুইজন গোলাম আসিয়া একখানা প্রকাণ্ড গালিচা বিছাইয়া দিল। গোলামেরা গালিচার উপর তাঞ্জাম রাখিল। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গালিচার

উপর দাঁড়াইল,—গোলামেরা তাহাকে অপমান করিয়া নামাইয়া দিল। সন্ন্যাসী তাঞ্জামের আরোহীকে কি বলিল। আরোহী তাহার উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী বলিতেছে, 'তোর দর্প চূর্ণ হইবে; তোর এই 'অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম ক্ষমতা অতি শীঘ্র ভস্ম হইয়া যাইবে। ইহার কণামাত্র থাকিবে না। তুই পথে-পথে দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবি; লোকালয় ছাড়িয়া শ্মশানে আশ্রয় লইবি; তবে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যাহার রূপের মোহে দেবগুরু বিস্মৃত হইয়াছিস্ সে বিষধরী হইয়া তোকে দংশন করিবে। তাহার বিষের যন্ত্রণায় ঐশ্বর্য্য, পদ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশের গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে ছুটিয়া বেড়াইবি।" নবীন থামিল। গৃহমধ্যে আবার কে কহিল, "বৈশ্বানর, স্থির হও,—ভবিষ্যতে যাও।" নবীন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আর একটা নদীতীর, সম্মুখে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহার সম্মুখে হাজার সওয়ার তলওয়ার খুলিয়া পাহারা দিতেছে। এ অট্টালিকা আমি চিনি, ইহা মুরশিদাবাদের স্থবাদার জাফর কুলী খাঁর দেউড়ী। তাঞ্জামে চড়িয়া একজন আমীর আসিল,—সে হিন্দু, বাঙ্গালী। সে দেখিতে অনেকটা আজিকার ব্রাহ্মণের মত। আরজবেগী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল।" অন্ধকার হইতে পুনরায় শব্দ হইল, "আরও দূরে যাও।" নবীন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল। "গঙ্গাবক্ষে একখানা প্রকাণ্ড ছিপ নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। তাহা দেখিতে-দেখিতে পদ্মার মোহনায় পৌঁছিল। তিনজন

ছিপ্ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, একখানা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের পথে একটি যুবতী স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। সে বোধ হয় পাগলী; কারণ, তাহার পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী, কপালভরা সিন্দুর, অঞ্চলে একখানা জীর্ণ পুরাতন চেলীর উত্তরীয় বাঁধা। নৌকার আরোহীকে দেখিয়া সেই পাগলী উঠিয়া দাঁড়াইল। আরোহী অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তধারণ করিল। প্রকাশ্যে গ্রামের মধ্য দিয়া সেই পাগলী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের অনেক লোক তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়াছে। মেয়ে পুরুষ সকলেই বলিতেছে, যে, এতদিনে পাগলী পিতার জাতি নষ্ট করিল। পাগলী তাহা শুনিল। সে হাসিতেছে, এবং একরাশি রুক্ষ জটার উপরে কাপড় টানিয়া দিয়াছে। সকলে একটা পুরাতন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অঙ্গনে নামিয়া আসিল। নৌকার আরোহী ও পাগলী তাহাকে প্রণাম করিল। অঙ্গনটা আমার পরিচিত এইখানে বিবাহের রাত্রিতে বর বধূকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।" অন্ধকার হইতে শব্দ হইল, "স্থির হও। বৈশ্বানর প্রত্যাবর্তন কর। এই ব্যক্তি কোথায় যাইবে?" নবীন বলিতে আরম্ভ করিল, "একটা প্রশস্ত নদীতীরে এক প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী বসিয়া আছে,—আমি তাহাকে চিনি। সে ডাহাপাড়ার সরস্বতী বৈষ্ণবী। আমার পরামর্শানুসারে কানুনগোই হরনারায়ণ রায় তাহাকে গোয়েন্দা করিয়া পাটনায় পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাণ্ড সহর,—বোধ হয় পাটনা। এ সহর আমি কখনও দেখি নাই। সরস্বতীর পার্শ্বে একটি পরমা

সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছে। তাহার রূপ এত যে, বস্ত্র-অলঙ্কারের অভাবে গৈরিক বসনে তাহাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইতেছে।”

“নদীতীরে একখানা নৌকা লাগিল। সেখানা গহনার নৌকা। কারণ, অনেক লোক মালপত্র লইয়া নামিল। আমিও তাহার মধ্যে ছিলাম। সরস্বতী আমাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিল; কিন্তু আমি তাহার সহিত কথা কহিব কি,—মেয়েটির রূপ দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাদের সহিত সহরে চলিলাম। প্রকাণ্ড চৌক,—অনেক দোকান-পসার। একটা বেণিয়ার দোকানের সম্মুখে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে চিনি। তিনি ডাহাপাড়ার হরি-নারায়ণ বিদ্যালঙ্কার। এই লোকটাকে সরাইতে পারিলে একশ' খান মোহর বকশিশ পাইব। আর যদি কাবার করিতে পারি—” কক্ষ মধ্যে শব্দ হইল, “অগ্নি, যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” সহসা কক্ষের ধূম দূর হইয়া গেল,—তাম্রকুণ্ডের অগ্নি নিবিয়া গেল। দ্বিতীয়বার শব্দ হইল, “নবীন, তুমি ঘুমাও।” নবীন দাস যেখানে বসিয়া ছিল, সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন মুক্ত বাতায়ন-পথে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া সে ত্রিশূলধারী নরকঙ্কাল, বিষধর সর্প অথবা তাম্রকুণ্ড কিছুই দেখিতে পাইল না। নবীন দাস উর্দ্ধশ্বাসে কক্ষত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমানন্দের আবির্ভাব

ভস্মরাশি যেমন প্রজ্জলিত হুতাশনকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মলিন বসনও তেমনই রূপসীর রূপ লুকাইতে পারে না। রমণী-রূপ বহুবিধ। কবিকুল তাহার মধ্যে স্নিগ্ধ ও তীব্র রূপের বর্ণনাই করিয়া থাকেন। মণিয়ার রূপ তীব্র। যে মানুষের মনে বল নাই, তাহার চক্ষু এ রূপে ঝলসিয়া যায়। বিদ্যালঙ্কার-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনে সে রূপ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। সামান্য গৈরিক বসনের এমন কি শক্তি আছে যে, সে জ্বলন্ত রূপ-শিখা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে! মণিয়া যখন পথে চলিত, তখন পথের লোক আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার মাতা দুঃখ করিত যে, কন্যা এমন রূপের মর্য্যাদা বুঝিল না,—সময় থাকিতে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইল না। তাহার ভক্তবৃন্দ তাহার এই পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মণিয়া যখন মজুরা করিতে যাইত, তখন সে রীতিমত পেশোয়াজ ও ওড়না চড়াইয়া যাইত; কিন্তু অপর সময়ে সে হিন্দু-সন্ন্যাসিনী সাজিয়া থাকিত। ইদানীং সে প্রায় সমস্ত দিনই সরস্বতীর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরিত। তাহার এক ভয় ছিল, পাছে মজুরা করিতে যাইবার সময় সরস্বতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

একদিন অপরাহ্নে সে সরস্বতীর সহিত চৌক দিয়া যাইতেছিল। একটা দোকানের সম্মুখে একজন লোককে দেখিয়া সরস্বতী দূরে দাঁড়াইয়া গেল; এবং মণিয়াকে কহিল, "বহিন, তুমি ঘরে যাও; আমি এখন যাইতে পারিব না।" মণিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া গেল। সরস্বতী সেই দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অসীম ও হরিনারায়ণ দোকান হইতে বাহির হইলেন। তখন সরস্বতী অন্তরাল হইতে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ দোকানটা কাহার?" সে ব্যক্তি কহিল, "মনোহর সাহা বণিয়ার। সাহাজী সহরে খুব নশ্‌হুর লোক,—তুমি কি নূতন আসিয়াছ?" সরস্বতী তাহার কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া, পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল; এবং দূরে থাকিয়া অসীমের অনুসরণ করিল। কিন্তু অসীম ও হরিনারায়ণকে ছাউনীর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে-আসিতে পথে তাহার সহিত এক মুসলমানের সাক্ষাৎ হইল। মুসলমান তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া, সরস্বতী দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মুখখানা পরিচিত বোধ হইলেও, সরস্বতী কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া মুসলমান হাসিয়া কহিল, "বিবি, স্থালাম, মুই বাঙ্গলা ছাশ হইতে আয়েলাম, এ ছাশের কথা ত বুঝতি পারি নে?" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরস্বতী হাসিয়া কহিল, "ওমা, নবীন দাদা বুঝি! এ আবার কি ঢং?" মুসলমান হাসিয়া উঠিল;

এবং কহিল, "তবে প্রথমটা চিনিতে পার নাই। সরস্বতী দিদি! এবারে একবারে একশ' থান মোহর বকশিশ! তোমার সঙ্গে রাধেকৃষ্ণ সম্পর্ক অর্থাৎ নিস্কী, কৃষ্ণ বলরাম আর বলিব না। কোন গতিকে বুড়াকে কাশী কি বৃন্দাবন পার করিতে পারিলেই হয়।" সরস্বতী তাহার উৎসাহে উৎসাহিত না হইয়া কহিল, "মামলাটা যত সোজা মনে করিয়াছ নবীন দাদা, ততটা সোজা নহে। ছোটরায় আর বামুনঠাকুর কয়দিন ধরিয়া কি কানাঘুষা করিতেছে, আমি কিছুই সমঝাইতে পারিতেছি না। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। কিন্তু তুমি থাকিবে কোথায়? যে পোষাকে আসিয়াছ,—আমাদের আখড়ায় ত জায়গা পাইবে না।" "তাহার জন্য চিন্তা করিও না। তুলসীর কণ্ঠী, জপের মালা, এবং নামাবলী সঙ্গেই আছে; সুতরাং খাঁ সাহেবের প্রেমানন্দ বাবাজী সাজিতে বিলম্ব হইবে না।" এই সময়ে সরস্বতীকে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "কি বহিন, এখনও এইখানেই আছ?" সরস্বতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার পশ্চাতেই মণিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক বিস্ময় নবীনচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মণিয়ার দিকে চাহিয়া ছিল। সরস্বতী তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধা হইল, এবং অস্ফুট স্বরে কহিল, "আ মর মিনসে, মেয়েটাকে যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছে,—একটু লজ্জাও করে না?" নবীন বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিল। মণিয়া তাহার রকম দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বহিন, খাঁ সাহেব

বুঝি তোমার দেশের লোক ?” সরস্বতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, “বহিন, ও আমাদের দেশের বহুরূপী,—দু’পয়সা রোজগারের চেষ্টায় পাটনায় আসিয়াছে। ও মুসলমান নয় হিন্দু, উহার নাম নবীন।” নবীন নিজের নাম শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মণিয়াও ঈষৎ হাসিল সুতরাং নবীন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। নিজের রূপ-পরিবর্ত্তনে কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য নবীন ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল, “বিবি, আমি এই এক লহমা ঐ গাছটার আড়াল হইতে আসিতেছি,—তোমরা এইখানেই দাঁড়াও।” সরস্বতী ও মণিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নবীন একটা বৃহদাকার তিন্তিড়ী-গাছের অন্তরালে গিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাজিয়া আসিল। সে ফিরিয়া আসিলে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “নবীন দাদা, পরচুলা আর কাপড়গুলা কি করিলে ?” নবীন একটা গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্রের ঝুলি দেখাইয়া কহিল, “এই যে, ইহার মধ্যে।” এই বলিয়া সে একবার প্রশংসা আকর্ষণ করিবার জন্য মণিয়ার দিকে চাহিল। মণিয়া তাহা বুঝিতে পারিল; এবং একমুখ হাসিয়া কহিল, “বাঃ! তোফা!” নবীন ভাবিল, বিষ্ণুদূত আসিয়া গরুড়পৃষ্ঠে তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

সরস্বতী ও মণিয়ার সহিত নবীন আখড়ায় চলিল। পথে যাইতে-যাইতে নবীন মণিয়ার প্রতি যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তাহা হইতে বুদ্ধিমতী মণিয়ার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইহারই মধ্যে নবীন দাস তাহার অনুগত দাসানুদাস

হইয়া পড়িয়াছে। যাইতে যাইতে মণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বহুরূপী-সাহেব, তুমি কাল কি সাজিবে?" প্রশ্ন শুনিয়া নবীন বিষম সমস্যায় পড়িল। সরস্বতী তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বহুরূপী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল মাত্র; কিন্তু সে ত সত্য-সত্যই বহুরূপী নহে; সুতরাং রূপ-পরিবর্ত্তনে তাহার অভ্যাস নাই। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে নবীন একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইল। সে কহিল, "বিবি সাহেব যাহা বলিবেন, তাহাই সাজিব।" মণিয়া কহিল, "কাল বাঙ্গালী রাজা সাজিও।" নবীন চরিতার্থ হইয়া বলিল, "যো হুকুম।" আখড়ার দরজায় আসিয়া মণিয়া, সরস্বতী ও নবীনের নিকট বিদায় লইল। তখন সরস্বতী তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলে বাঁচে; এবং সেও সরস্বতীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহে; কারণ, সরস্বতী অন্তরালে নবীনের নিকট সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক, এবং মণিয়ারও একটা বড় মজলিসে মজুরা ছিল।

আখড়া ছাড়িয়া মণিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; পথে যাইতে যাইতে তাহার অদৃষ্টক্রমে একখানা এক্কা মিলিয়া গেল। সে এক্কায় চড়িয়া বসিল, এবং চালককে দ্রুতবেগে চালাইতে আদেশ করিল। এক্কা যখন তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন সে দেখিতে পাইল, হরিনারায়ণ পদব্রজে গৃহে ফিরিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মণিয়া এক্কা থামাইয়া নামিল। হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, মা?" মণিয়া কহিল, "বাপজান, সংবাদ আছে; তবে জরুরী কি না তাহা বলিতে পারি না।

সরস্বতীর দেশের এক দোস্ত আসিয়াছে, তাহার নাম নবীন,—সে বহুরূপী।” “নবীন, বহুরূপী! লোকটা দেখিতে কেমন?” মণিয়া যতদূর পারিল নবীনের রূপ বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন, “লোকটাকে একবার দেখাইতে পার?” “তাহার জন্য চিন্তা কি? বোধ হয় আমি যাহা বলিব সে তাহাই করিবে।” হরিনারায়ণ উত্তর শুনিয়া হাসিলেন; এবং কহিলেন, “প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমাকে মনোহর সাহার দোকানে পাইবে।”

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নব-নবীন-মিলন

নবীন দাস নিশ্চিন্ত মনে শীতল প্রভাত-সমীরণের সহিত তামাকু-সেবন করিতেছিল। সেই সময়ে আখড়ার সম্মুখ দিয়া একজন পুরুষ চলিয়া যাইতেছিল। লোকটাকে দেখিয়া নবীনের মনে হইল যে, সে বাঙ্গালী। নবীন প্রথমে মনে করিল যে, বাঙ্গালীই হউক, আর বিহারীই হউক, সে কথায় তাহার প্রয়োজন কি? তাহার পরে আবার কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বলি ওহে, তুমি কি বাঙ্গালী না কি?” সে ব্যক্তি বাঙ্গালী; সুতরাং প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিল, এবং আখড়ার দাওয়ায় উঠিয়া নবীনকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কতদিন এখানে

আসিয়াছেন ?” নবীন তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলায়। তোমরা—আপনারা ?” “আমরা নাপিত, নিবাস গৌড়। একজন আমীরের সহিত চাকরী লইয়া এদেশে আসিয়াছিলাম।” “বটে—বটে, আমরাও পরামাণিক, তামাক ইচ্ছা হইবে কি ?”

আগন্তুক হুঁকা লইয়া দাওয়ায় বসিয়া গেল। এ-কথা সে-কথার পর নবীন জিজ্ঞাসা করিল, “কাহার কাছে চাকরী কর বন্ধু ?” আগন্তুক দুঃখিত হইয়া কহিল, “চাকরী আর করি কই বন্ধু! উপস্থিত সেটি গিয়াছে।” “কোথায় চাকরী করিতে ?” “একজন কায়স্থ রাজা,—নূতন বাদ্‌শাহের দোস্ত্‌,—বড় আমীর লোক। আমার বরাতের দোষেই চাকরীটা গেল।”

নবীন দাস বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। চাকরী যে কেন গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে আগন্তুকের আত্মাভিমানে আঘাত করিল না ; বরঞ্চ কথাটা ফিরাইবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল, “আমীরের নামটা কি ?” আগন্তুক কহিল, “রাজা অসীম রায়।” কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া, নবীন জিজ্ঞাসা করিল, “পূর্ব্বদেশের লোক বুঝি ?” আগন্তুক কহিল, “না দাদা, নূতন মুরশিদাবাদ সহরের লোক। বয়স কম, পয়সারও দরদ নাই। দিব্য আরামে ছিলাম,—বিলক্ষণ দু'টাকা উপরি পাওনা ছিল। অদৃষ্টদোষে সব গেল দাদা, সব গেল !”

এই সময় নবীন হুঁকাটা লইল।

নবীন কিছু কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ

করিল। আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মনিবের আমার দিল্‌খানা ছিল যেন দরিয়া;—বরাত দাদা, বরাত! মেয়েমানুষের জন্য দুনিয়াটা ছারেখারে গেল।" নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকাটা আগন্তুকের হস্তে প্রদান করিল। কলিকার তামাকু শেষ হইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং আগন্তুক একটা টান দিয়াই কাশিয়া উঠিল। নবীন সেই অবসরে হুঁকাটা আত্মসাৎ করিয়া, নিজে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কাশি সামলাইয়া আগন্তুক বলিতে লাগিল, "দাদা রে, বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গেলেই, এইরূপ হইয়া থাকে। এই সহরে একটা খুবসুরৎ বাঈজী আছে,—তাহার নাম মণিয়া। এই উঠ্‌তি বয়স,—চেহারাখানাও জম্‌কালো, গলাটা বুলবুলের মত,- হাসিটা এস্রাজের আওয়াজের মত। আমি দাদা গরীবের ছেলে,—বড়লোকের জুতা বহিতে আসিয়া, দু'দিন সোণার মুখনলে অম্বরী তামাক টানিয়া, মনিব বাহির হইয়া গেলে মখমলের মস্‌নদে বসিয়া, মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল। মেয়েমানুষটার সহিত মনিবের গলায় গলায় ভাব!"

এতক্ষণে নবীন দাস বিচলিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বটে! মেয়েমানুষটার বুঝি তখন তোমার উপর টান?"

"আরে রামচন্দ্র! সে তেমন চিড়িয়াই না। বন্ধু, পাটনা সহরের মণিয়া বাঈ যেন লোটন পায়রা,—যতটা দম পায়, ততটা ঘুরপাক খায়। পয়সা ভিন্ন সে ভাল করিয়া কথাই কয় না!"

"তবে কি হইল ?"

"বেকুবের যাহা হইয়া থাকে! একদিন মনিবের শাল-দোশালা চড়াইয়া, নকল রাজা সাজিয়া বাজারটা যাচাই করিতে গেলাম; কিন্তু সে বাজারে মেকী চলা ভার! কত আসল রাজা সে নিত্য কিনিয়া বেচিতেছে,—নকল রাজা চিনিতে তাহার বাজাইতেও হইল না। বরাত, বন্ধু, বরাত। নেশাটা ভালরকম জমিয়া গিয়াছিল; সুতরাং মনিব আসিয়া যখন ধরিয়া ফেলিল, তখন পলাইবার উপায় পর্য্যন্ত রহিল না। ফলে চাকরীটি পর্য্যন্ত গেল।"

নবীন দাস একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিল; এবং কলিকার ভস্ম ঢালিয়া ফেলিয়া, পুনরায় তামাকু সাজিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া আগন্তুক ব্যস্ত হইয়া কলিকাটা লইয়া তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল। নবীন প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটি কি দাদা ?"

আগন্তুক কহিল, "নবকৃষ্ণ।"

"বাঈজীটির নাম কি বলিলে ভাই ?"

"মণিয়া বাঈ।"

"সে এ সহরে কোথায় থাকে ?"

"সহরের মধ্যেই।"

এই সময়ে নবকৃষ্ণের তামাকু সাজা শেষ হইল; কিন্তু সে পূর্ব্বেই নবীনের তামাকু-সেবন-পদ্ধতি জানিতে পারিয়াছিল; সুতরাং সে কলিকাটি নবীনের হস্তে না দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে

ধূমপান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নবীন মনে-মনে অল্প-বিস্তর বিরক্ত হইল; কিন্তু নবকৃষ্ণকে চটাইবার ভয়ে কিছু বলিতে ভরসা করিল না। কলিকার তামাকু যখন প্রায় শেষ হয়-হয় হইয়াছে, তখন নবকৃষ্ণ কলিকাটি নবীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া উঠিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "এখন চলিলে কোথায়?"

"চাকরীর চেষ্টায়।"

নবীন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, ওবেলায় দর্শনটা পাওয়া যাইবে ত?"

নবকৃষ্ণ কহিল,—"যাইবে, অবশ্য যাইবে। আমি নিজেই আসিব।" নবকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, নবীন সরস্বতীর সন্ধানে আখড়ার দিকে গেল; এবং তাহাকে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া, পুনরায় দাওয়ায় আসিয়া, তামাকু সাজিতে বসিল। এই সময়ে মুণিয়া আসিয়া আখড়ার দুয়ারে দাঁড়াইল; এবং নবীনকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি ভাই সাহেব, শহরে বাহির হও নাই?" হাসি দেখিয়া নবীনের হৃদয় যে দীর্ঘ লম্ফ দিয়াছিল, সম্বোধন শুনিয়া অর্দ্ধপথে তাহা স্তম্ভিত হইয়া গেল। নবীন দীর্ঘকাল প্রেমের ব্যবসা করিয়া আসিয়াছে; সুতরাং একেবারে আশা ত্যাগ করিল না। সে অম্লানবদনে ভ্রাতৃ-সম্বোধন হজম করিয়া কহিল, "বিবিসাহেব, আমাদের মুরশিদা-বাদ শহরে বহুরূপীরা সন্ধ্যার সময়ে বাহির হয়। তোমাদের পাটনা শহরের নিয়ম কি?"

মণিয়া কহিল, "ভাই সাহেব, বহুরূপীদের নিয়ম কি তাহা ত বলিতে পারি না; তাহারা যখন বহুরূপী সাজিয়া আসে, তখনই দেখিতে পাই। ঘরে ত কাহাকেও দেখি নাই। কোন-কোন দিন মেলাতে যেন সকালেও বহুরূপী দেখিয়াছি।"

"ভাল কথা, আজ বিকালে সাজিয়া বাহির হইব। বিবি-সাহেব, কোথায়-কোথায় যাইব, আমি ত শহরের পথ চিনি না! তোমার যদি অবসর থাকে, তাহা হইলে আমাকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে ত?"

মণিয়া হাসিয়া বলিল, "কেন পারিব না!" মণিয়ার সঙ্গ-লাভের সম্মতি পাইয়া, নরসুন্দর-কুলশেখর নবীন তৎক্ষণাৎ সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল; তাহার দেহখানা মাত্র পাটনা শহরের আখড়ায় পড়িয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি, কোথায়-কোথায় যাইব বলিলে না?"

মণিয়া কহিল, "শহরের আমীর-ওমরাহ—কাহারও নাম শুনিয়াছ কি? পথে-পথে ঘুরিলে উপার্জ্জন অধিক হয় না; দুই দণ্ড পথে না ঘুরিয়া, যদি একদণ্ড আমীরদের ঘরে-ঘরে ফির, তাহা হইলে রোজগার দ্বিগুণ হইবে।"

নবীন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমীর ওমরাহ ত কাহাকেও চিনি না। তবে শুনিয়াছি যে, এই সহরে এক বিখ্যাত বাঈজী আছে,—সকল আমীর-ওমরাহ না কি তাহার জুতা বহিয়া চলে।" "বটে! এমন বাঈজী কে?" "মণিয়া

বাঈ।" মণিয়া গম্ভীর হইয়া গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে কহিল, "নাম শুনিয়াছি বটে, তবে দেখি নাই।" নবীন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার ঠিকানা জান?" "ঠিকানা জানিতে কতক্ষণ লাগিবে? আমি এখনই জানিয়া আসিতেছি।" "বিবিসাহেব, তবে চল আজ সন্ধ্যাবেলায় মণিয়া বাঈয়ের ঘরে যাওয়া যাক। যদি অদৃষ্টে রোজগার থাকে, তাহা হইলে সেই-খানেই দুই-চারিটা আমীর মিলিয়া যাইবে।" মণিয়া বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, আখড়ার দুয়ার হইতে চলিয়া গেল; সরস্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

"তবে সেই ভাল, আমাদের বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই ছাউনি উঠাইয়া এলাহাবাদে যাইতে হইবে। বাদশাহ স্বয়ং এই পত্রখানা লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সহিত দেওয়ানের যে সম্পর্ক তাহাতে পত্রে কোন কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। দেওয়ানের দরবারে আরজি পেশ করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন; অত টাকা কোথায় পাইব, কাকা?" "আমি কি তোমার নিকট অর্থ চাহিয়াছি বাপু? যদি তোমার সম্পত্তি

তোমাকে কখনও ফিরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিবার বহু অবসর পাইবে। ভাল কথা! মণিয়ার সহিত কি তোমার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছে?” “না।” “নবীন নাপিত পাটনায় আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কেন আসিয়াছে তাহা বলিতে পারি না তবে সংবাদটা আমাদিগের পক্ষে শুভ নহে।” “এই বাদশাহী ছাউনীর মধ্যে নবীন আর আমার কি করিবে? আপনারা ত চলিয়া যাইতেছেন সুতরাং ভয়ের কোন কারণই নাই।” “দেখ বাপু, নবীনচন্দ্র নরসুন্দর কি জন্য পাটনায় আসিয়াছে, তাহা যতক্ষণ জানিতে না পারিতেছি ততক্ষণ হরিনারায়ণ শর্ম্মা পাটনা শহরের বাহিরে পদার্পণ করিতেছেন না।”

হরিনারায়ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, অসীম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; ভূপেন্দ্র তাম্বুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল। সেও আসিয়া প্রণাম করিল। হরিনারায়ণ বস্ত্রাবাস পরিত্যাগ করিলেন। সেদিন নগরোপকণ্ঠে ভীষণ জনতা। দলে দলে নর-নারী পথ ধরিয়া চলিয়াছে, হরিনারায়ণ ধীরে ধীরে চৌকের দিকে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে হইল কে যেন তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন আপাদ মস্তক গৈরিকবসনমণ্ডিতা এক রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তিনি পথের ধারে সরিয়া গেলেন, রমণী বলিল “বাপজান, আমি মণিয়া। আমার সঙ্গে আসুন।” হরিনারায়ণ পথ ছাড়িয়া মণিয়ার পশ্চাতে ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। দূরে ক্ষেত্রের মধ্যে একটা কবর ছিল, তাহার চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা, মণিয়া সেই কবরস্তানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গুলীনির্দ্দেশ মত হরিনারায়ণ দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড জীর্ণ সমাধির অন্তরালে বসিয়া দুই জন মানুষ বাঙ্গালায় কথা কহিতেছে। হরিনারায়ণ শুনিলেন একজন বলিতেছে "নগদ একটি হাজার টাকা, বুঝিলে বন্ধু ?" "হাজার টাকা পাইলে আমি সব করিতে পারি।" "দেখ তোমার মনিবের সঙ্গে মুরশিবাদ হইতে এক বুড়া বামুণ আসিয়াছে তাহার নাম হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার, তাহাকে চেন কি ?" "বিলক্ষণ চিনি।" "সেই বামুণকে যদি পার করিতে পার তাহা হইলে এখনই নগদ হাজার টাকা।" "দাদা বুড়াত মন্দ লোক নয়, তবে তাহাকে পার করিতে চাও কেন ?" "কে ভাল কে মন্দ লোক, বুঝিলে ভায়া সে কথা বলা বড়ই কঠিন ; বিশেষতঃ বড় লোকের সম্পর্কে। বুড়া হয়ত ভাললোক কিন্তু তাহার একটি বিধবা মেয়ে আছে জান কি ? তাহার সহিত, বুঝিলে কি না, তোমার মনিবের—বুঝিতে পারিয়াছ ত ? বুড়া সমাজের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে কিন্তু মেয়েটা এখনও, বুঝিলে কিনা, তোমার মনিবকে—বুঝিতে পারিয়াছ ত ? দেখ ভায়া তোমার মনিবও যে আমার মনিবও সে। আমি তোমার মনিবের বড় ভাইয়ের খাস নফর ; তাঁহারই হুকুমে বুড়া বামুনকে আর তাহার মেয়েটাকে ছোট কর্ত্তার সঙ্গ ছাড়াইতে আসিয়াছি। দেখ, যদি কোন গতিকে

এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে আর বুড়াটাকে কাবু করিতে পার তাহা হইলে নগদ একটি হাজার টাকার তোড়া তোমার দুয়ারে পঁহুছাইয়া দিয়া আসিব।” “বুড়াকে কেমন করিয়া পার করিব?” “সে কথা তুমি বুঝ। পার করার অনেক উপায় আছে—ছালায় ভরিয়া খেয়ার নৌকায় গঙ্গার পরপারেও রাখিয়া আসা যায় আবার এক ঘায়ে বৈতরণী পার করিয়াও দেওয়া যায়।” “বৈতরণী পার করাই সুবিধা কারণ মড়ায় কথা কহে না।” “তবে তুমি ভার লইবে?” “হাজার টাকা অনেক টাকা দাদা। এখন হইতে চেষ্টায় রহিলাম।”

মণিয়া ইসারা করিয়া হরিনারায়ণকে ডাকিল, হরিনারায়ণ প্রাচীরের অন্তরাল ছাড়িয়া দূরে সরিয়া আসিলে মণিয়া বলিল “বাপ্‌জান, এখন হইতে আমার কথা শুনিয়া চলিতে হইবে, আপনার সঙ্গে তিন চারিজন লোক দিতেছি। পাটনা সহরে নবকৃষ্ণ খানসামা মুঠা মুঠা সোণা ছড়াইয়া যাহা না করিতে পারিবে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মুখের কথায় তাহা হইবে।” মণিয়া হরিনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সহরে ফিরিল এবং তিন চারিজন লোক তাঁহার সঙ্গে দিয়া হরিনারায়ণকে মনোহর সাহার দোকানে পাঠাইয়া দিল। সে হরিনারায়ণকে বলিয়া দিল যে সে নিজে তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ দিয়া আসিবে।

———

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

জিন

"কাঁদ কেন?" সুদর্শন উত্তর না দিয়া ঘন ঘন বস্ত্রের কোণ দিয়া চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল, বধূ জিজ্ঞাসা করিল "সকাল বেলায় শুধু শুধু কাঁদিতে বসিলে কেন?" সুদর্শন চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বড় বউ—একে তুমি—তাহার উপর তম্বুরা—" ব্রাহ্মণ সত্যসত্যই কাঁদিয়া আকুল হইল। তখন ব্রাহ্মণী নিজে অস্ত্র ধরিলেন, তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, চুপ্ করিবে কি?" ব্রাহ্মণ চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হুঁ।" "তবে চুপ কর।" ব্রাহ্মণের ক্রন্দন সত্যসত্যই থামিল। ব্রাহ্মণী জানিল যে তিনটি তম্বুরা, দুইটি পাখোয়াজ ও একটি সুরবাহার ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণের শোক উপস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণী কহিল, "তার জন্য ভাবনা কেন? পাটনা সহরে তোমার ত কত বন্ধুবান্ধব রহিয়াছে, তাহাদের একজনের কাছে রাখিয়া যাওনা কেন?" তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে বলিয়া উঠিল "ঠিক বলিয়াছ ব্রাহ্মণী, এ পাটনা সহরে আমাকে চিনিয়াছে তিনজন, তুমি, নূতন বাদশাহ আর মণিয়া বাঈ।"

ব্রাহ্মণ তখনই তম্বুরা আর পাখোয়াজগুলি লইয়া বাহির হয় দেখিয়া বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেলায় যাইতেছ খাইয়া

যাওনা কেন?" সুদর্শন বলিল "না না তাহা হইলে বিলম্ব হইয়া যাইবে, আমি ফিরিয়া আসিয়াই আহার করিব।"

বাড়ী ছাড়িয়া সুদর্শন একমনে শহরের দিকে চলিল, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পদদ্বয় তাহাকে মণিয়ার গৃহে লইয়া চলিল। মণিয়া তখন গৃহে ছিল না, মণিয়ার মাতা সুদর্শনকে দেখিয়াই চটিয়া গেল। সুদর্শন যখন জিজ্ঞাসা করিল "মনিয়া কোথায় ও কখন আসিবে" তখন সে সকল কথাতেই বলিল "আমি জানিনা।" মতিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল তাহা দেখিয়া সুদর্শন তম্বুরা ও পাখোয়াজগুলি লইয়া অদূরে এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করিল। দেখিতে দেখিতে দুই দণ্ড কাটিয়া গেল; কিন্তু মণিয়া আসিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া পুনরায় মণিয়ার দুয়ারে করাঘাত করিল।

পুনরায় সুদর্শনকে আসিতে দেখিয়াই বৃদ্ধা জ্বলিয়া উঠিল এবং কহিল, "তুই ফের আসিয়াছিস্?" সুদর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল; এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্রন্দনে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং সকলেই একসঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে উত্তর দিল না। বৃদ্ধা ক্রন্দনের মধ্যে দুই একবার "জিন-জিন" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। তাহা হইতে দুই-একজন বুদ্ধিমান্ প্রতিবেশী বুঝিল যে, জিন মতিয়া

বাঈকে ধরিতে আসিয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "জিন কোথায়?" বৃদ্ধা চীৎকার বন্ধ না করিয়াই, গৃহের রুদ্ধ দ্বার দেখাইয়া দিল। দুই-চারিজন সাহসী পুরুষ সাহসে ভর করিয়া দুয়ার খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধ গৃহস্বামী ও একজন অপরিচিত পুরুষ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুদর্শনকে দেখিয়া বৃদ্ধার চীৎকারের মাত্রা বাড়িল; এবং সে বলিল, "ঐ জিন, ঐ জিন।" তখন সকলে মিলিয়া সুদর্শনকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সুদর্শন এত আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সহৃদয় প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন ওঝা ডাকিতে ছুটিল; একজন কাজী ডাকিতে গেল; এবং দুই-চারিজন দল বাঁধিয়া ফৌজদারকে সংবাদ দিতে গেল। সুদর্শনের তম্বুরা ও পাখোয়াজগুলি বৃক্ষতলে পড়িয়া ছিল,—তাহা যে পাইল সে-ই উঠাইয়া লইয়া গেল।

ওঝা ও কাজী আসিবার পূর্ব্বে ফৌজদার আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই, সুদর্শনকে লইয়া কোতোয়ালীতে চলিয়া গেল। মণিয়া যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গৃহে আসিল, তখন মাতাকে দেখিতে না পাইয়া সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিতা হইল না। কারণ, তাহার মাতা মধ্যে-মধ্যে না বলিয়া চলিয়া যাইত। কোমল-হৃদয়া প্রতিবেশিনী-দিগের অনুগ্রহে তাহার সংবাদ জানিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা আসিয়া বলিয়া গেল যে, জিন তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল; এবং তাহাকে না পাইয়া, তাহার মাতাকে

ধরিতে গিয়াছিল। পল্লীর সকলে মিলিয়া তাহার মাতাকে বাঁচাইয়াছে; এবং ফৌজদার আসিয়া জিনকে লইয়া গিয়াছে। মণিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, হয় ত অসীম আসিয়াছিলেন; কিন্তু সে যখন শুনিল যে, জিন তালগাছের মত লম্বা এবং কৃষ্ণবর্ণ, তখন তাহার চিন্তা দূর হইল। সে প্রতিবেশিনীদিগকে বিদায় করিয়া কাফ্রী বালক সাজিল, এবং বুর্খায় আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একজন প্রতিবেশী আসিয়া যখন অসীমকে সংবাদ দিল যে, হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার এবং সুদর্শন তখনও গৃহে ফিরিয়া যান নাই, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। বাদশাহ আদেশ দিয়াছেন যে, লস্কর প্রভাতে পাটনা ত্যাগ করিয়া কুচ করিবে। তিনি ভূপেন্দ্রকে বিদ্যালঙ্কার-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, যাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল,—রাত্রির প্রথম দণ্ড কাটিয়া গেল; কিন্তু ভূপেন্দ্র তখনও ফিরিল না দেখিয়া, অসীম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যালঙ্কার-গৃহে যাত্রা করিলেন।

তিনি গিয়া দেখিলেন যে ভূপেন্দ্রের নিকট হরিনারায়ণের সংবাদ পাইয়া দুর্গাঠাকুরাণী ও বধূ আশ্বস্তা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও কেহ আহার করেন নাই। অসীম বড় বধূর নিকট জানিলেন যে, সুদর্শন সম্ভবতঃ তম্বুরা ও পাখোয়াজগুলি স্কন্ধে লইয়া মণিয়ার গৃহে গিয়াছেন; এবং তাহা শুনিয়া ভূপেন্দ্রও সেই দিকে গিয়াছে। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে আশ্বাস দিয়া মণিয়ার

গৃহাভিমুখে চলিলেন। মণিয়ার গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, অসীম প্রতিবেশী দিগের নিকট জানিলেন যে, মণিয়ার পিতা ও মাতা ফৌজদারীতে গিয়াছে। তাহা শুনিয়া তিনি সহর কোতোয়ালীতে চলিলেন।

ফৌজদার তাঁহার পরিচয় পাইয়া সুদর্শনকে ছাড়িয়া দিল।

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ত্রিবিক্রম

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চিমদিকে একখানা ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। তাহা দেখিতে দেখিতে সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলিল। তখন হরিনারায়ণ ভীত হইলেন। ছিপ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। চারিদিক যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন অল্প-অল্প বাতাস উঠিল। প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্রবৃহৎ বীচিমালা দেখা দিল। হরিনারায়ণ দাঁড়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝড় উঠিল, তোরা কোথায় যাইতেছিস্?" পশ্চাৎ হইতে মাঝি উত্তর করিল, "আর এক ক্রোশ গেলেই পথ পাইব। যদি হাওয়া না উঠিত, তাহা হইলে একদণ্ডের মধ্যেই এক ক্রোশ চলিয়া যাইতাম।" "হাওয়া যখন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, তখন আর ছিপ চালাইয়া কাজ নাই; তুমি তীরে লাগাও।"

"এখানটায় জলে অনেক পাথর আছে,—হাওয়ার মুখে তীরে লাগান সহজ নহে।"

হরিনারায়ণ আর কিছু বলিলেন না; ছিপ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। সহসা বায়ুর বেগ বৰ্দ্ধিত হইল। তাহার মুখে পড়িয়া ছিপ বিদ্যুদ্বেগে উড়িয়া চলিল। হরিনারায়ণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তখনও দাঁড়ীরা বাহিতে ছাড়ে নাই। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। এবং বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বহুদূরে একটা আলো দেখা গেল। পশ্চাৎ হইতে মাঝি কহিল, "ঝড়ে নৌকা পড়িয়াছে; এখনই পাথরে লাগিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। ঠাকুর মহাশয় যদি একটু স্থির হইয়া বসেন, তাহা হইলে লোকগুলাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিও না। তোমার নৌকা ডুবিলেও আমি মরিব না।" দেখিতে-দেখিতে আলোক নিকটে আসিল। হরিনারায়ণ দেখিলেন, একখানা অতি বৃহৎ বোঝাই নৌকা ঝড়ের মুখে পড়িয়া বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মাঝিরা দুইটা নোঙ্গর ফেলিয়াছে; কিন্তু তাহা বাধে নাই। ঝড়ের বেগে মাস্তুলটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সেটা নৌকা ছাড়ে নাই। সুতরাং তাহার ভারে নৌকা বিষম হেলিয়া পড়িয়াছে; এবং প্রতি মুহূর্ত্তে জল উঠিতেছে। ছিপ্ নিকটে আসিলে, বৃহৎ নৌকার মাঝি-মাল্লারা লাফাইয়া ছিপে উঠিল। ছিপের মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের চড়নদার নাই?" তাহারা কহিল, "এক পাগলা ঠাকুর আছে; সে

কথাও কহে না, উঠেও না।” “সে কোথায়?” “নৌকাতেই আছে।”

ছিপ ফিরিল এবং মজ্জনোন্মুখ নৌকায় লাগিল। সকলে দেখিল, এক নগ্ন মূর্ত্তি নৌকার সম্মুখে ধ্যানাসনে বসিয়া আছে। ছিপের মাঝি ডাকিল, “ঠাকুর!” উত্তর নাই। সে দ্বিতীয় বার ডাকিল, “বলি, ও ঠাকুর, নৌকা যে বানচাল হয়!” নগ্ন মূর্ত্তি উত্তর দিল না। তখন নৌকার মাঝি কহিল, “তুমি কাহাকে ডাকিতেছ! ও ঠাকুর একেবারে পাগল। আজ সাতদিন রাজমহল ছাড়িয়াছি। ইহার মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গণ্ডূষ জল ছাড়া উহাকে কেহ কিছু খাইতে দেখি নাই।” ছিপের মাঝি ইঙ্গিত করিল; চারিজন ছিপের দাঁড়ী নগ্ন মূর্ত্তি উঠাইয়া ছিপে আনিল,—ছিপ ছাড়িয়া দিল। সহসা শুভ্র অনলশিখা অসিত-বরণ গগন দীর্ণ করিল। তাহার আলোকে সকলে সভয়ে, সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, একটা মহাকায় উর্ম্মি আসিয়া নৌকা গ্রাস করিল। যখন দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ ঝলকিল, তখন আর তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না।

ছিপ ফিরিল; প্রবল বায়ুর বিরুদ্ধে অতি ধীরে ধীরে শিলাসঙ্কুল জলপথ অতিক্রম করিয়া তীরের নিকটে আসিল। সেই সময়ে আর একটা প্রকাণ্ড উর্ম্মি ছিপ উঠাইয়া লইয়া তীরে শুষ্কভূমিতে নিক্ষেপ করিল। প্রচণ্ড আঘাতে সুদৃঢ় তরণী খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। সকলেই অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছিল। বিদ্যুতালোকে মাঝিরা দেখিল যে, কেহই মরে নাই। সহসা

হরিনারায়ণ শুনিতে পাইলেন, অন্ধকারে তাঁহার পার্শ্বে কে বলিতেছে, "হাঁ দেখিলাম, এখন ফিরিয়া যাই। প্রভু, বিংশতি বৎসর যাবৎ আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছি,—কখনও কণামাত্র অবহেলা করি নাই। আজি প্রথম অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনের বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" আবার বিদ্যুৎ চমকিল। হরিনারায়ণ দেখিলেন, নগ্ন মূর্ত্তি চক্ষু মেলিয়াছে। অন্ধকারে তাহার কথা শুনিয়া মাঝিমাল্লারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

নগ্ন মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হরিনারায়ণের হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার সহিত আইস।" হরিনারায়ণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার সহিত চলিলেন। বিদ্যুতের আলোকে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ছিপের মাঝি বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর মহাশয়, কোথায় যান? আমার উপরে হুকুম আছে, আপনাকে পাটনায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "তবে তুমিও আইস।" মাঝি যখন তাহাদের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল, তখন সহসা একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোকে হরিনারায়ণ দেখিতে পাইলেন, মাঝিমাল্লারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

নগ্ন মূর্ত্তি হরিনারায়ণের হস্ত ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। হরিনারায়ণের পরিধেয় সিক্ত হইয়া গিয়াছে; এবং তিনি কোন্ পথে চলিতেছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে

পারিতেছিলেন না। নগ্ন মূর্ত্তি চির-পরিচিতের ন্যায় দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে অজ্ঞাত পথ অতিক্রম করিতেছিল। ক্রমে হরিনারায়ণের অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল,—তাঁহার পদস্খলন আরম্ভ হইল। নগ্নমূর্ত্তি তাহা দেখিয়া থামিল। হরিনারায়ণের অবসন্ন পদদ্বয় দেহের ভার বহন করিতে পারিল না। তিনি পথের কর্দ্দমের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিনারায়ণ কতক্ষণ সেইভাবে বসিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। পরে যখন তাঁহার চেতনা ফিরিল, তখন তিনি দেখিলেন যে, দুই-তিনজন লোক মশাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং আরও চারিজন লোক তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া একটা ডুলিতে স্থাপন করিতেছে। ডুলি চলিল; এবং তিন চারি দণ্ড পরে এক গ্রামের মধ্যে একটি অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ধৌত পরিষ্কৃত হইয়া বৃদ্ধ হরিনারায়ণ যখন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন গৃহস্বামী আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সঙ্গী আসিলে হরিনারায়ণ কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাবক্ষে ও নদীতীরে যে নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এ মূর্ত্তি তাহা হইতে বিভিন্ন। শুভ্র বসন পরিহিত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া হরিনারায়ণ তাহাকেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ গঙ্গাবক্ষে মজ্জনোন্মুখতরণীর আরোহী বলিয়া কোনমতেই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু তথাপি তাহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আগন্তুক তাঁহাকে এক দৃষ্টিতে চাহিতে দেখি

কহিল, "আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না?" হরিনারায়ণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "চিনিতে পারিব না কেন। তবে মনে হইতেছে যেন আপনাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" "আমাকে আর কোথায় দেখিবেন,—আমি বাঙ্গালী, নিবাস পূর্ব্বদেশে, এদেশে সম্প্রতি আসিয়াছি।"

সহসা হরিনারায়ণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; এবং সে ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এমন করিয়া 'সম্প্রতি' কথাটা আর একজন ব্যবহার করিত, তুমি কি সে-ই?" হরিনারায়ণের ভাব দেখিয়া আগন্তুক সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আপনি কাহার কথা বলিতেছেন? একটা কথা উচ্চারণের ভাব কতলোকের এক রকম হইয়া থাকে।" হরিনারায়ণ উভয় হস্তে আগন্তুকের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আজ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমার মত 'সম্প্রতি' উচ্চারণ শুনি নাই। এই ষাট বৎসরের মধ্যে আর কেহ ত এই একটা কথা তেমন করিয়া উচ্চারণ করে নাই? বল, গোপন করিও না।—চেষ্টা করিলেও আমার নিকট গোপন করিতে পারিবে না। আমি হরিনারায়ণ, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। আশৈশব একগ্রামে বাস করিয়াছি, যৌবনে একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি, তুমি কি আমার নিকট আত্মগোপন করিতে পার?—তুমি ত্রিবিক্রম, তুমি আর কেহ নহ, তুমি নিশ্চয় ত্রিবিক্রম।" আগন্তুক বৃদ্ধকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিল, "হাঁ, আমি ত্রিবিক্রম।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

মণিহরণ

সুদর্শন শয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তখনও নিদ্রিত হন নাই, এমন সময়ে বহির্দ্বারে কে সবলবেগে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সুদর্শন গৃহের দুয়ার খুলিয়া দেখিলেন, আগন্তুক একজন আহদী। আহদী তাঁহাকে কহিল, "আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে একবার ছাউনিতে যাইতে হইবে। বাদশাহ প্রভাতেই দিল্লী যাত্রা করিবেন; সুতরাং এখন না গেলে আপনার সহিত তাঁহার হয় ত সাক্ষাৎ হইবে না। আমীরও বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি আপনার দিল্লী-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; সাক্ষাতে সমস্ত কথা জানাইবেন।" নূতন বাদশাহ ফর্‌রুখসিয়রের ফৌজে অসীম আমীর আখ্যায় পরিচিত ছিলেন।

সুদর্শন কোন আপত্তি না করিয়া, আহদীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। তখন ত্রিযামা রজনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, ননন্দা ও ভ্রাতৃজায়া শয়নকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রদীপ লইয়া পূজার ঘরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। বাদশাহী ছাউনীতে তখন তৃতীয় প্রহরের নৌবৎ বাজিয়া উঠিল; এবং তাহা শেষ হইতে না হইতে, গৃহের দুয়ারে পুনরায় করাঘাত হইল। তাহা শুনিয়া বধূ বলিয়া উঠিলেন, "ঐ তোর ভাই আসিয়াছে। ভাই, দুয়ার খুলিয়া

দিয়া আয়।" ব্যঙ্গ করিয়া দুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "পোড়ারমুখী, দুনিয়ায় সকলেই কি আমার ভাই না কি?" "তবে তোর জন্য নূতন নাগর আসিয়াছে।" "দাঁড়া ভাই, কাহার নাগর আসিল, দেখিয়া আসি। পরিচিত গলার আওয়াজ না পাইলে, দুয়ার খুলিতেছি না।" দুর্গা প্রদীপ লইয়া দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" উত্তর হইল "আমি।" "তুমি কে?" "এই কি সুদর্শন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী?" "হাঁ, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" "আমি ফৌজদারের লোক,—জরুরী খবর লইয়া আসিয়াছি; শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দাও।" "বাড়ীর মালিক বাড়ীতে নাই; এখন ফিরিয়া যাও;—সকাল-বেলায় আসিও।" "আমার সংবাদ অত্যন্ত জরুরী,—বিলম্ব করিলে চলিবে না; শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দাও।" "বাড়ীতে পুরুষ নাই; সুতরাং তুমি যেই হও, এখন দুয়ারের বাহিরে বসিয়া থাক;—বাড়ীর মালিক আসিলে দুয়ার খুলিয়া দিব।"

দুর্গাঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া, ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে বসিলেন; এবং বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, দাদা বাড়ী না ফিরিলে, কোনমতেই দুয়ার খুলিয়া দেওয়া উচিত নহে; কি বলিস্?" বধূ কহিলেন, "সে কথা আর বলিয়া! বাড়ীতে পুরুষ নাই; লোকের মধ্যে আমরা দুইটি স্ত্রীলোক। দেশ নয়, ঘর নয়, যে পাড়াপড়শী ডাকিয়া আনিব। এই তৃতীয় প্রহর রাত্রি, এখন কি দুয়ার খুলিতে আছে?" ফৌজদারের লোক আরও দুই-তিনবার দ্বারে করাঘাত করিল এবং উত্তর না পাইয়া বোধ হয়

চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বড়বধূ দুর্গাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি!" দুর্গা কহিলেন, "কি ভাই?" "তাঁহাকে যদি দুয়ার হইতে ধরিয়া লইয়া যায়?" "আমরা আর কি করিব ভাই! সকাল হইলে ছোট দাদাকে খবর দিব।" একবার আড়াল হইতে দেখিলে হয় না,—লোকটা ... কি না?" "কোথা হইতে দেখিবি?" "কেন, উপর হইতে।" "প্রাচীরের উপরে উঠিয়া?" "কেন, দোষ কি?" "তুই উঠিতে পারিবি?" "আমি ভাই মোটা মানুষ, উঠিব কেমন করিয়া? ... ওঠ।"

দুর্গা প্রদীপ রাখিয়া বহির্দ্বারের নিকটে গেলেন। সেই সময়ে অঙ্গনে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া বধূ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে-দেখিতে দ্বিতীবার শব্দ হইল; এবং এক-এক করিয়া সাত-আটজন পুরুষ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা ক্ষিপ্রহস্তে দুর্গা ও বড়বধূর হস্তপদ বন্ধন করিল; এবং বাহিরের দুয়ার খুলিয়া দিল। বাহিরে আমবৃক্ষ-তলে অন্ধকারে ... আট-দশজন লোক দুইখানা ডুলি লইয়া লুকাইয়া ছিল। ... মিলিয়া স্ত্রীলোক দুইজনকে ডুলিতে তুলিয়া প্রস্থান করিল। হরিনারায়ণের প্রতিবেশীরাও জানিতে পারিল না যে, তাঁহার বধূ ও কন্যা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন।

হরিনারায়ণের গৃহের অদূরে একজন পুরুষ ও একজন রমণী অপেক্ষা করিতেছিল; তাহারাও দস্যুদলের সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, রমণী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি,

ও নবীন দাদা, তুমি বল কি গো! আমি একা যেতে পারব না। বিদেশ বিভূঁই, এ কি আমার রাঢ়দেশ? আমি মেয়েমানুষ—এত তাল সামলান কি আমার কর্ম্ম? কাজ হাসিল হইয়াছে,—দেশে ফিরিয়া চল। বড়কর্ত্তার কাছে টাকাটা আদায় করিয়া, আমরা সরিয়া দাঁড়াই। বড় ঘরের কথা,—কখন কি হয় বলা যায় না!—আর তুমি এখন পাটনায় বসিয়া কি করিবে?" পুরুষ কহিল, "দোহাই সরস্বতী দিদি, এত চেঁচাইয়া কথা কহিও না। তোমার কল্যাণে নবীনচন্দ্রের পাটনা শহরে খাতির আছে। নবীনচন্দ্র যেঁহ তেঁহ লোক নহেন। এই সাতটা দিন দিদি—সাতটা দিন। কোনমতে যদি এই সাতটা দিন কাটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে নবীনচন্দ্র তোমার একেবারে কেনা গোলাম। তোমার বাজার করিয়া দিব; পালং শাকের ক্ষেত বানাইয়া দিব; লাউ কুমড়ার মাচা বাঁধিয়া দিব।" "বলি, তা ত দিবে। সাতদিন পাটনায় থাকিয়া তোমার হইবে কি?" "একটু পরকালের চর্চ্চা করিব। অনেক কাল পরে মনের মত গুরু পাইয়াছি; হাতছাড়া হইলে এ জন্মে হয় ত আর পাইব না। গুরু বলিয়াছেন, এই সাতটা দিন।" সরস্বতী কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া, আপন মনে গর্‌গর্‌ করিতে-করিতে চলিল।

আফ্‌জল খাঁর বাগানে যখন নৌবতে ভৈরবী বাজিয়া উঠিল, তখন ডুলি দুইখানি পাটনা শহর পরিত্যাগ করিয়া নগরোপকণ্ঠ দিয়া চলিতেছিল। পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

যাহারা উপকণ্ঠ হইতে নগরে উপার্জ্জন করিতে আসে, তাহারা তখন পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পথে লোক দেখিয়া নবীন বাহকগণকে দ্রুতপদে চলিতে আদেশ দিল; এবং সরস্বতীকে বড়বধূর ডুলির কাছে রাখিয়া, স্বয়ং দুর্গাঠাকুরাণীর ডুলির সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। এত প্রত্যূষে নগরোপকণ্ঠে একসঙ্গে দুইখানি ডুলি দেখিয়া, যাহারা তখন পথ চলিতেছিল, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কিন্তু সঙ্গে অস্ত্রধারী লোক ছিল দেখিয়া, কেহ কিছু বলিল না। পথের ধারে একখানা ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে বসিয়া এক রমণী মুখ প্রক্ষালন করিতেছিল। নির্জ্জন পথে সহসা এত অধিক জনসমাগম দেখিয়া, সে ত্রস্তপদে ঘরের ভিতরে পলাইল; নবীন বা সরস্বতী তাহাকে দেখিতে পাইল না। ডুলির পার্শ্বে নবীন ও সরস্বতী যখন সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ডুলি দুইখানি অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে, সে গৃহস্বামিনীকে সঙ্গে লইয়া অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইতেছে দেখিয়া, বাহকগণ পথের ধারে এক বৃক্ষতলে ডুলি নামাইল। তাহা দেখিয়া অনুসরণকারিণীদ্বয় একটা ঝোপের অন্তরালে লুকাইল। বেলা যখন দুই দণ্ড, তখন বাহকেরা ডুলি উঠাইল; এবং দ্রুতপদে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তিন ক্রোশ পথ চলিয়া, দ্বিতীয় প্রহর বেলায় ডুলি একখানা বৃহৎ গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত এক ধনীর উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানের

মধ্যে দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র গৃহে বন্দিনীদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া, দস্যুগণ নবীন ও সরস্বতীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। নবীন তাহাদিগকে দুইটি করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা দিল; তাহারা একে-একে সহরের দিকে ফিরিল। তখন নবীন কোথা হইতে একটা ভাঙ্গা কলিকা এবং কিঞ্চিৎ তামাকু সংগ্রহ করিয়া, গৃহের সম্মুখে বসিল; এবং সরস্বতী বাজার করিতে গ্রামে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধদণ্ড পরে অনুসরণকারিণীদ্বয় সেই উদ্যানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগের একজনের চলন দেখিয়া নবীন অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু উঠিল না।

তৃতীয় প্রহর বেলায় সরস্বতী যখন চাউল, দাল, হাঁড়ি, কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল, তখন নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, ও সরস্বতী দিদি, তিন প্রহর বেলা হইল, ঠাকুরাণীরা খাইবে কি?" সরস্বতী বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কেন, রাঁধিবে!" "আজি কি আর উহারা উঠিবে?" "তাহাও ত বটে!" "দিদি, তুমি একবার যাও।" "ঐটী পারিব না, নবীন দাদা। এক গাঁয়ের লোক,—মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?" "কোন রকমে একবার নৌকায় চড়াইতে পারিলে হয়।" "তবে আমিই যাই। তুমি কিছু দুধের চেষ্টা দেখ।"

[library stamp]

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

নৌকাপথে

পরদিন প্রভাতে হরিনারায়ণ ত্রিবিক্রমের সহিত গৃহের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট আছেন। হরিনারায়ণ একমনে চিন্তা করিতেছেন; এবং ত্রিবিক্রম একখানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে-ছেন। এই সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, নৌকা প্রস্তুত।" তাহার কথা শুনিয়া হরিনারায়ণের চিন্তা ভঙ্গ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা! নৌকা কি হইবে?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ভাই, নৌকা আমি আনাইতে বলিয়া-ছিলাম।" "কেন, কোথায় যাইবে?" "দেশে ফিরিব।" "কখন যাত্রা করিবে?" "তোমার আহার হইলেই নৌকা ছাড়িব মনে করিয়াছি।" "আমার জন্য একখানা গরুর গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে বল।" "গরুর গাড়ি কি হইবে?" "আমি পাটনায় ফিরিব। "পাটনায় ফিরিবে কি জন্য?" "কি বলে পাগল! আমার পুত্রকন্যা পুত্রবধূ সকলেই যে পাটনায় রহিয়াছে।" "এখন বেলা দুই দণ্ড, কেমন? তোমার পুত্র এখন পাটনা পরিত্যাগ করিতেছে; কন্যা এবং পুত্রবধূ অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।" "বল কি! তাহারা কাহার সহিত আসিল, কেন আসিল?" "সে কথা পরে জানিতে পারিবে। গেলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।" "তবে কোথায়,

কখন তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে?" "সাক্ষাৎ শীঘ্রই হইবে। তুমি শীঘ্র রন্ধন সারিয়া লও। দেড় প্রহর বেলায় যাত্রার সময় উৎকৃষ্ট।" "ত্রিবিক্রম, তুমি কি বলিতেছ ভাই, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পুত্র কন্যা পাটনায় রহিল, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" "তোমাকে পুত্র কন্যা ত্যাগ করিতে কে বলিতেছে? তাহা-দিগের সহিত শীঘ্রই তোমার সাক্ষাৎ হইবে।" "তবে আমি এখন কোথায় যাইব?" "বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে।" "সে পথটা এখন কোন দিকে?" "পূর্ব্বে।" "তবে চল।"

হরিনারায়ণ ও ত্রিবিক্রম উঠিলেন। গৃহস্বামী আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। আহারান্তে উভয়ে পদব্রজে গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা আরোহণ করিলে, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। অনুকূল স্রোতের মুখে নৌকা পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া মাঝিরা নৌকা তীরে লাগাইবার উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে একজন দাঁড়ী হাঁকিল, "বাদ্‌শাহী ছিপ।" তাহা শুনিয়া মাঝি উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং দেখিল, একখানা দীর্ঘাকার ছিপ তীরবেগে তাহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

ছিপে আরোহী মাত্র দুইজন; কিন্তু দাঁড়ী পঞ্চাশজন। আরোহীদিগের মধ্যে একজন দূর হইতে নৌকা দেখিয়া মাঝিকে কহিল, "মাঝি, নৌকাখানা রাখিতে বল।" মাঝি দূর হইতে

হাঁকিল, "নৌকা রাখ্।" তাহা শুনিয়া নৌকার মাঝি স্রোতের দিকে নৌকার মুখ ফিরাইয়া লগি পুঁতিয়া রাখিল। দেখিতে-দেখিতে ছিপ আসিয়া পড়িল; এবং ছিপের মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা কোথাকার?" "পাটনার।" "কোথায় যাইবে?" "রাজমহল।" "চড়নদার কয়জন?" "এক সন্ন্যাসী বাবা, আর এক বুড়া ব্রাহ্মণ।" উত্তর শুনিয়া ছিপের প্রথম আরোহী বলিয়া উঠিলেন, "চড়নদারদের বাহিরে আসিতে বল।" কিন্তু নৌকার মাঝি কথা কহিবার পূর্ব্বেই হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "এ যে অসীমের কণ্ঠস্বর।" এবং বলিতে-বলিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ছিপের দুইজন আরোহীই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরিনারায়ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, "এ কি অসীম আর সুদর্শন! তোমরা কোথা হইতে আসিলে? কেমন করিয়া সন্ধান পাইলে? সুদর্শন, তুমি কাঁদিতেছ কেন?" অসীম কহিলেন, "যে ছিপে আপনি আসিতেছিলেন, তাহার দাঁড়ী-মাঝি গিয়া খবর দিল যে আপনি এক নাগা সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহারা আপনার সঙ্গে যাইতেছিল; কিন্তু সাপের ভয়ে যাইতে পারে নাই। আপনি শীঘ্র পাটনায় ফিরিয়া চলুন। বড় বিপদ হইয়াছে।" "তোমরা ভাল আছ ত, তবে আর বিপদ কিসের?" "কাল রাত্রিতে একজন লোক আমার নাম করিয়া সুদর্শনকে ডাকিয়া লইয়া যায়; এবং সুদর্শন বাড়ীর বাহির হইলে, জোর করিয়া দুর্গাকে এবং বৌঠাকুরাণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

কোথায় লইয়া গিয়াছে, ফৌজদার বা কোতোয়াল পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে পারে নাই।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে নৌকার ভিতর হইতে ত্রিবিক্রম বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "হরিনারায়ণ, তুমি চিন্তা করিও না,—তোমার কন্যা-পুত্রবধূর জন্য কোনই আশঙ্কা নাই। তাঁহারা দুইজনেই কুশলে আছেন।" ত্রিবিক্রমের কথা শুনিয়া হরিনারায়ণ বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ত্রিবিক্রম তুমি পাগল! তুমি না এইমাত্র দেশে ফিরিতে বলিতেছিলে? বল কি, আমাকে লইয়া ত যাত্রা করিতেছিলে। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন আমার পক্ষে এখন অসম্ভব।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "তুমি ত এখন পাটনায় যাইবে না,—তুমি সত্য-সত্যই দেশে ফিরিবে।" "পাগল, বলে কি! কন্যা-পুত্রবধূকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—বিদেশে বান্ধব-হীন অবস্থায় জাতি যাইতে বসিয়াছে,—আর আমি কি না দেশে ফিরিব? ত্রিবিক্রম, তবে কি সত্য-সত্যই তোমার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে? "দেখ দাদা, বুদ্ধিবৃত্তির লোপ বা বৃদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখিও যে, ত্রিবিক্রম যাহা বলে, তাহার প্রায় অন্যথা হয় না।"

এই সময়ে অসীম ত্রিবিক্রমের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" "হাঁ, দেখিয়াছ।" "তবে উপস্থিত আপনার নামটা স্মরণ হইতেছে না।" "আমার নাম ত শুন নাই বাপু, যে স্মরণ হইবে!"

"তবে আপনার মুখ পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।" "বলিলাম ত বাপু, তোমার সহিত দেখা হইয়াছে।" "কিন্তু কোথায় দেখা হইয়াছে স্মরণ হইতেছে না।" "যখন সময় হইবে, তখন ঠিক স্মরণ হইব।" অসীম ত্রিবিক্রমের সহিত আর কথা না কহিয়া, হরিনারায়ণকে কহিলেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, আর বিলম্বে কাজ নাই,—সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আপনি ছিপে আসুন।" এই সময়ে ত্রিবিক্রম বলিয়া উঠিলেন, "বুড়া মানুষ, আর ছিপে তুলিয়া কাজ কি বাপু, ছিপখানাকে বল না, নৌকাখানাকে টানিয়া লইয়া চলুক। বেলা দুই দণ্ড বাকী আছে, অনুকূল স্রোতের মুখে চলিতে বিলম্ব হইবে না।" অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুকূল স্রোতের মুখে?" "বাপু হে, রাজমহল কি প্রতিকূল স্রোতের মুখে?" "রাজমহল, কর্ত্তা কি—" হরিনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত্রিবিক্রমের কথা কাণে তুলিও না অসীম; চল, আমি এখনই ফিরিয়া যাইব।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "সাধ্য কি, ছিপও পাটনায় ফিরিবে না,—তোমরাও কেহ পাটনায় ফিরিবে না—সকলকেই দেশে ফিরিতে হইবে।"

অসীম হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মহাশয়, যদি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গৃহে এই বিপদ না হইত, তাহা হইলেও আমি দেশে ফিরিতাম না। আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, স্বয়ং বাদশাহ আমার অন্নদাতা; সুতরাং আমাকে এখনই দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে।" "যাত্রা করিতে পার; কিন্তু কোথায় পৌছিবে, তাহা

কে বলিতে পারে?" এই সময়ে অসীম পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি ভৃত্য,—প্রভু যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। প্রভু যখন আদেশ করিয়াছেন, দিল্লী যাইতে হইবে, তখন আমাকে যাইতেই হইবে।" "প্রভুর ক্ষমতা কি, তোমাকে দিল্লী লইয়া যান! জান, প্রভুরও প্রভু আছেন?"

হরিনারায়ণ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ত্রিবিক্রম, উপস্থিত কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধানে আমি পাটনায় চলিলাম। তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরিব। এখন বড় বিপদের সময়; সুতরাং আর বাধা দিও না ভাই।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "আমি বাধা দিব না ভাই। কিন্তু তোমাদের কাহারও পাটনায় ফেরা হইবে না। কন্যা ও পুত্রবধূর জন্য চিন্তিত হইও না। তাহারা নিকটেই আছে এবং সত্বর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" "কি বলে পাগল! তাহাদিগকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ছাড়াইয়া না দিলে কেমন করিয়া আসিবে?" "যে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে, সে তাহাদিগের সঙ্গেই আছে। তোমরা কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবে না। এমন কি চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাইবে না।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিব?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ছিপ ও নৌকা তীরে লাগাও, নামিতে হইবে।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

মণিয়ার চার

যে প্রকোষ্ঠে দুর্গা এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-বধূ আবদ্ধা ছিলেন, তাহার সম্মুখে কিয়দ্দূরে একটা বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকা-তীরে একটা অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বয়সের ভারে দীর্ঘিকা-গর্ভে হেলিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাহার বহু শাখা প্রশাখা বাহু বিস্তার করিয়া, অনেক নূতন কাণ্ড স্থাপন করিয়াছিল। নবীন যখন তাহার বন্দিনীদ্বয়কে আহার করিতে অনুরোধ করিবার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন যে দুইজন রমণী তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা সেই রমণীয় অশ্বত্থকুঞ্জে একটা স্থূল মূলের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।

নবীন কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু বন্দিনীদ্বয়ের একজনও মুখ তুলিয়া চাহিল না। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, মা-ঠাকরাণরা, সেবা হবে না?" আপাদমস্তক বস্ত্র-মণ্ডিতা রমণীদ্বয় মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, কেহই উত্তর দিল না। নবীন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা যে তিন পহর হ'ল?" তথাপি কেহ উত্তর দিল না। এই সময়ে দীর্ঘিকা-তীরে অশ্বত্থকুঞ্জে উপবিষ্টা রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন গান ধরিল:—

মাহ্ কি জ্যোছনা হোয়ে আঁধিয়ার।
যব তুঁহু ছোড়ি গয়ে হমারে পিয়ার॥

আকাশে বিদ্যুৎ চমকিলে পাদপহীন প্রান্তরে পথিক যেমন

চমকিয়া উঠে, গায়িকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নবীন সেইরূপ চমকিয়া উঠিল; এবং তৎক্ষণাৎ বন্দি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। সে যখন কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দীঘিকা-তটে আসিল, তখন রমণী গায়িতেছে:—

ভর দিবসে মিহির কি রোশনী,
নয়ন ছোড়ে মেরে হোয় রজনী,
তুঁহু বিনে আজি দুনিয়া আঁধার ॥

নবীন দাস ভয় বিস্মৃত হইল। সহসা যেন তাহার যৌবন ফিরিয়া আসিল। সে বাধা-বিপত্তি অবহেলা করিয়া অশ্বত্থতলে ছুটিল। গায়িকা কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে একমনে গায়িতে লাগিল:—

যৌবন গুঞ্জরে যব ভর যৌবনী,
রূপ গয়ে মেরে যব ভর রূপিণী,
তুঁহারি বিহনে মেরি দিলদার ॥

গীত থামিল, নবীন ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি,—আপনি—এখানে?" গায়িকা কহিল, "বাবুসাহেব, আমি ভিখারিণী; নিত্যই কি একস্থানে ভিক্ষা মেলে? সেইজন্য এক-একদিন এক-এক গ্রামে যাই।" "কই, তুমি কাল আসিলে না?" "ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি ত লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।" "কাহাকে?" "কেন, মণিয়া বাঈয়ের কাফ্রী গোলামকে।" "সে কি তোমার লোক? আমি তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই। আর তাহার যে চেহারা!" এইবার

মণিয়া হাসিল; এবং সে হাসি দেখিয়া প্রৌঢ় নবীন দাসের মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল। মণিয়া কহিল, "বাবুসাহেব, ভাল চেহারা মন্দ চেহারায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি যাইবে মণিয়া বাঈয়ের বাড়ীতে; তাহাকে রাজী করিয়া যাহাতে পাটনা সহরে দুই পয়সা রোজগার করিতে পার তাহার চেষ্টায়। মন্দ চেহারার লোক দিয়া যদি সে কাজ ভাল হয়, তাহা হইলে খুবসুরৎ চেহারায় আবশ্যক কি? তুমি কি জান যে, সেই কাফ্রী গোলাম মণিয়া বাঈয়ের ছাতীর ছাতী, কলিজার কলিজা? পাটনা সহরের লোক বলে, মণিয়া বাঈও যে, হাবশী গোলামও সে।" "এত কথা কি জানি বিবিসাহেব? আমি তোমার গোলামের মত তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। তুমি আসিলে না, তখন হাবশী গোলামকে ফিরাইয়া দিলাম।" "ভাল কর নাই বাবুসাহেব! এ সকল কাজে কি মেজাজ দেখাইতে আছে?" "বিবিসাহেব, তুমি কি এখনই পাটনায় ফিরিবে?" "না, এখন ফিরিব না; আজি বোধ হয় এই গ্রামেই থাকিব।" "এইখানেই থাকিবে? আমিও বোধ হয় থাকিব। চল, তোমার বাসা দেখিয়া আসি।" "ভিখারিণীর আবার বাসা কি বাবুসাহেব? যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেইখানেই আবাস। হয় ত একটা মসজিদে, না হয় ত একটা ভাঙ্গা কবরে মাথা গুঁজিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিব।" এই সময়ে মণিয়ার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, "নিকটেই একটা মস্‌জিদ্‌ আছে—আজ রাত্রিটা সেইখানেই কাটাইলে হয় না?" মণিয়া সাগ্রহে কহিল, "চল, দেখিয়া আসি।"

তাহারা কেহ নবীনকে আহ্বান করিল না; অথচ নবীন মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহাদিগের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল।

দীর্ঘিকার পরপারে আম্র-পনসের বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে একটা পুরাতন মস্‌জিদ ছিল। মসজিদটি ক্ষুদ্র কিন্তু দ্বিতল। নিম্নতলের খিলানগুলায় দুয়ার বসাইয়া ক্ষুদ্র কক্ষে পরিণত করা হইয়াছে।

মণিয়া প্রথমে উপরে উঠিল এবং দেখিল, মস্‌জিদের ভিতরে দুই-তিনখানা ছিন্ন খর্জ্জুর পত্রের চাটাই, দুই-তিনটা মৃৎভাণ্ড এবং একখানা ছিন্ন কোরাণ সরিফের পুঁথি পড়িয়া আছে। নীচে আসিয়া মণিয়া দেখিল যে, চারিদিকে বারটা খিলান; তাহার মধ্যে এগারটা রুদ্ধ এবং একটি মাত্র মুক্ত। ভিতরে শব-বহন করিবার দুই-তিনখানা খাটিয়া, মহরমের তাজিয়ার একখানা কাঠাম এবং একটা বহু পুরাতন খর্জ্জুর-পত্রের সম্মার্জ্জনী পড়িয়া আছে। মণিয়া সেই সম্মার্জ্জনী লইয়া গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। নবীন ব্যস্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী লইতে গেল; কিন্তু মণিয়া তাহা দিল না। তখন নবীন তাজিয়ার কাঠামখানা গৃহের মধ্য হইতে টানিয়া এককোণে লইয়া গেল। সেই অবসরে মণিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল; এবং স্বয়ং গৃহতল পরিষ্কার করিতে-করিতে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। নবীন তখন একখানা শব-বহনের গুরুভার খাটিয়া গৃহের এক কোণ হইতে অপর কোণে লইয়া যাইতেছে। মণিয়া তাহা দেখিয়া, বিদ্যুদ্বেগে

গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল; এবং বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। রুদ্ধদ্বারে শিকল লাগাইয়া মণিয়া সঙ্গীনীকে কহিল, "তুই এইখানে বসিয়া থাক্। যদি গ্রামের কেহ আসে, তাহা হইলে বলিস্ যে ফরীদ খাঁর হুকুম,—তিনি না আসিলে এই দুয়ার যেন কেহ না খোলে।" তখন নবীন দুয়ারের নিকট আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, "বিবিসাহেব, ও বিবিসাহেব, দুয়ার দিলে কেন গো?" মণিয়া তাহার কথার উত্তর না দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

রন্ধন করিতে-করিতে সরস্বতী বৈষ্ণবী নবীনদাসের সন্ধান করিতে আসিয়া দেখিল, গৃহে কেহই নাই। প্রৌঢ়া তখন আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল, "বুড়ার যেন ভীমরতি ধরিয়াছে। দুই-দুইটা ব্রাহ্মণের মেয়ে খামকা ধরিয়া আনিল; তিন-পহর বেলা হইয়া গেল,—তাহারা কি খায় তাহার ঠিক নাই। নিজের পেটে দানাপানি নাই; কোথায় গিয়াছে তাহারও ঠিক নাই।" সম্মুখে একটা ক্ষেত্রে একজন কৃষক হল-কর্ষণ করিতেছি্ল। বৈষ্ণবী তাহাকে নবীনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে নবীনকে দীর্ঘিকা-তীরে যাইতে দেখিয়াছিল; সুতরাং অশ্বত্থতল দেখাইয়া দিল। তখন বৈষ্ণবী ভাতের হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া, নবীনদাসের সন্ধানে দীর্ঘিকা-তীরে, অশ্বত্থ-তলে চলিল।

দূর হইতে মণিয়া দেখিতে পাইল যে, সরস্বতী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। সে তীরবেগে ছুটিয়া গৃহের অপর পার্শ্ব

দিয়া প্রবেশ করিল; এবং একে-একে সকল প্রকোষ্ঠ সন্ধান করিয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মণিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নবীনের মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল যে সে যখন বাহিরে চলিয়া যায়, তখন দুয়ারে তালা লাগাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। দুয়ার খুলিয়া মণিয়া দেখিল যে, তখনও দুর্গা ও বড়বধূ শয়ন করিয়া আছেন। সে ডাকিল, "বহিন্, বহিন্, শীঘ্র উঠ। আমি মণিয়া, ভয় নাই, আমি তোমাদের মুক্ত করিতে আসিয়াছি। পুরুষটাকে এক জায়গায় বন্ধ করিয়া আসিয়াছি; আর বৈষ্ণবী বাহিরে গিয়াছে। সে হয় ত এখনই ফিরিবে। উঠ, শীঘ্র উঠ, পলাও।" দুর্গা ও বড়বধূ উঠিলেন। মণিয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া, যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই গৃহ ত্যাগ করিল। তখন দিবসের চতুর্থ প্রহর আরম্ভ হইয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

নবীনের মুক্তি

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামের চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া সরস্বতী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, এবং চুল্লীর নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরায় জ্বালিয়া রন্ধনে মনঃসংযোগ করিল। রন্ধনান্তে আহার করিতে-করিতে তাহার স্মরণ হইল যে, দুইটি ব্রাহ্মণকন্যা তখনও অভুক্তা আছে! সরস্বতী স্বভাবতঃ কঠিন হৃদয়া ছিল না।

দুর্গা ও বড়বধূর অবস্থা স্মরণ হওয়ায়, তাহার অন্নে রুচি সহসা অন্তর্হিত হইল। অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া সে উপরে গেল। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখী যে পলাইয়াছে এবং পিঞ্জর যে শূন্য, সরস্বতী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে অন্ধকারে শূন্য কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইয়া, বারবার ডাকিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে হাতড়াইতে আরম্ভ করিল। অনুসন্ধান শেষ হইলে তাহার মনে হইল, ধূর্ত্ত নবীনদাস তাহাকে ফাঁকী দিবার জন্য বন্দিনী-দ্বয়কে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখে ও ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে সরস্বতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে এক বৃদ্ধ মুসলমান একাকী সেই পুরাতন মস্‌জিদে আসিয়াছিল। বৃদ্ধ প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন, এবং বার্দ্ধক্য-বশতঃ প্রায় কোন কথাই শুনিতে পাইত না। তাহার কর্ণের নিকটে আসিয়া গগনভেদী রব না করিলে, তাহাকে কোন কথা শুনান অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ যখন মস্‌জিদের নিকটে আসিল, তখন কারারুদ্ধ নবীনদাস তাহার পদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নরসুন্দরকুল-তিলকের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সিংহনাদের কণামাত্র বৃদ্ধের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। মস্‌জিদের নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ যখন সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন নবীন হতাশ হইয়া সবলে কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড আঘাতে কবাটের সহিত প্রাচীন মস্‌জিদের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল।

দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তিহীন বৃদ্ধ সে কম্পন অনুভব করিল। সে সোপান অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসিল, এবং দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কম্পনের কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

গ্রামের সীমায় এক যুবাকে দেখিতে পাইয়া, বৃদ্ধ তাহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জানাইল। যুবা মুসলমান,—দিনান্তে লাঙ্গল-স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল। সে প্রথমে বৃদ্ধের কথায় পুরাতন মস্‌জিদে ফিরিতে সম্মত হইল না; কিন্তু অবশেষে কৌতূহলপ্রণোদিত হইয়া বৃদ্ধের সহিত চলিল। তাহারা মস্‌জিদের নিকটে আসিলে, নবীনদাস তাহাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া, পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সে ধ্বনি বৃদ্ধ শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু কৃষক-যুবা তাহা শুনিয়া, ভয়ে রুদ্ধ-গতি হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাহাকে দুয়ারের নিকটে আনিতে পারিল না।

মণিয়া যখন প্রথমে নবীনদাসকে বন্দী করে, তখন প্রৌঢ় নরসুন্দর প্রথমে কিঞ্চিৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, মণিয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতি অনুরাগিনী হইতেছে এবং এই বন্দীকরণ সেই অনুরাগের প্রথম লক্ষণ মাত্র। কিন্তু এক দণ্ডকাল পরেও বিবি সাহেব যখন দুয়ার খুলিয়া দিল না, এমন কি তাহার কাতর অনুরোধে বিচলিত হইয়া উত্তর পর্যান্ত দিল না, তখন নবীনের মনে সন্দেহ হইল। সে তখন স্বয়ং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই পুরাতন

মসজিদের নিম্নে প্রতিদিকে তিনটি করিয়া চারিদিকে দ্বাদশটি খিলান ছিল ; কিন্তু নবীনের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার মধ্যে একাদশটি চিররুদ্ধ ; এবং একমাত্র দ্বার বহির্দ্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ।

দুয়ার খুলিতে না পারিয়া নবীন ভিতর হইতে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; এবং সেই উপলক্ষে শববহনের খট্বা দুই-খানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুয়ার ভাঙ্গিল না দেখিয়া, সে তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল ; এবং কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইলে নিবৃত্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ যখন প্রথমবার মসজিদে আসিয়াছিল, তখন নবীন সেইমাত্র নীরব হইয়াছে।

বৃদ্ধ যখন কৃষক-যুবাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন নবীনের স্বরভঙ্গ হইয়াছে। অন্ধকারে, জনশূন্য প্রান্তরে তাহার বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার যুবাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। চীৎকার করিয়াও যখন সে উত্তর পাইল না, তখন সবলে কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম আঘাতের শব্দ শুনিয়াই যুবা জিন্, শয়তান, এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু ভাবে বুঝিতে পারিল যে, যুবা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে ; সুতরাং সে অযথা কালক্ষেপ না করিয়া, মসজিদ পরিত্যাগ করিল।

কৃষক-যুবা যখন গ্রামসীমায় উপস্থিত হইল, তখন একজন বিদেশী হিন্দু গ্রাম্য-পথ দিয়া গ্রামের বাহিরে আসিতেছিল। সে যুবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, এই গ্রামে কি মুসাফিরখানা আছে?" যুবা তাহা শুনিতে না পাইয়া কহিল, "শয়তান—

জিন্"; এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুত-পদে পলায়ন করিল। আগন্তুক বিদেশী; তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। যুবাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, সে বলিয়া উঠিল "গ্রামের জিন্ ও শয়তান হয় ত গ্রামের লোক অপেক্ষা মেহের-বাণ; সুতরাং মানুষের অভাবে জিন্ বা শয়তানের আশ্রয়ে দোষ নাই।" কিয়দ্দূর গমন করিতে-করিতে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। সে যথাসম্ভব নম্রতা সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, জিন্ কোথায়?" বৃদ্ধ কিছুই শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া মস্জিদটি দেখাইয়া দিল। আগন্তুক দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার পদশব্দ শুনিয়া, নবীন দাস পূর্ব্ববৎ চীৎকার ও কবাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আগন্তুক বিচলিত না হইয়া, মস্জিদের সোপানে আরোহণ করিল। ক্লান্ত, বিকৃত-কণ্ঠ নবীন যখন নিবৃত্ত হইল, তখন আগন্তুক ধীরে-ধীরে দুয়ারের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দোস্ত্, তুমি কি সত্য-সত্যই শয়তান?" প্রশ্ন শুনিয়া নবীন স্তম্ভিত হইয়া গেল; কোনও উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ পরে আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোস্ত্, জবাব দাও না কেন? তুমি কি সত্যই শয়তান? আমার উপস্থিত শয়তানের বিশেষ প্রয়োজন।" নবীন তাহার প্রশ্ন এবারেও বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সে ভরসা করিয়া কথা কহিল। সে কহিল, "আমি শয়তান নহি, মানুষ। তুমি দুয়ার

খুলিয়া দাও, আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।" আগন্তুক হাসিয়া কহিল, "এ কথা জিন্ মাত্রেই বলিয়া থাকে। তাহার পর মুক্ত করিয়া দিলে, ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়। তুমি আমাকে যতটা বেকুব মনে করিতেছ জিন্, আমি ততটা বেকুব নহি। তুমি কোন্ দেশের জিন্?" নবীন ভাবিল, আগন্তুক তাহার সহিত রহস্য করিতেছে; সুতরাং সে উত্তরে কহিল, "আমার নিবাস বাঙ্গালা দেশে।" "হুঁ। শুনিয়াছি, মুসলমান বাঙ্গালা দেশে গেলেই ভূত হয়; এইজন্য দিল্লীতে বাঙ্গালা দেশের নাম দোজখ্। তুমি যখন মস্‌জিদে আবদ্ধ আছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই মুসলমানের ভূত। আর আমি হিন্দু, সুতরাং দরজা খুলিলে, ঘাড়টি না ভাঙ্গিয়া ছাড়িবে না;—সঙ্গে-সঙ্গে চেলা বানাইবে। হরে, হরে, দোস্ত্, তোমাদের খোদা তোমার সদ্গতি করুন।" আগন্তুক উঠিয়া যায় দেখিয়া, নবীন দাস প্রথমে অনুনয় বিনয়, তাহার পরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সে কহিল "আমি দরিদ্রের সন্তান;—পঞ্জাব হইতে বিহারে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু জান দিতে ত আসি নাই। জান্‌ই যদি গেল, তবে পয়সায় প্রয়োজন কি?" ব্যাকুল হইয়া নবীন দাস ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে এক আশরফি হইতে মূল্য পাঁচ আশরফিতে গিয়া দাঁড়াইল। তখন আগন্তুক কহিল, "দোস্ত, শয়তানের আশরফি মানুষের হাতে আসিলে, হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে না ত? একটা নমুনা ছাড় দেখি।"

নবীন দাস ব্যগ্র হইয়া দুয়ারের নিম্নে একটা আশরফি গড়াইয়া দিল। আগন্তুক তাহা লইয়া, টিপিয়া বাজাইয়া, নানা রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল; এবং কহিল, "দেখ জিন্‌ সাহেব, পাঁচ-পাঁচ আশরফির লোভে দুয়ার ত খুলিয়া দিতে রাজি হইয়াছি; কিন্তু দুয়ার খুলিয়া দিলে যদি আশরফি না দাও?" নবীন যতগুলা দেবতার নাম জানিত, সকলের নাম লইয়া শপথ করিল; কিন্তু আগন্তুক তাহাতেও নরম হইল না। সে কহিল, "এ সকলগুলা ত হিন্দুর ঠাকুর; আর তুমি ত মুসলমানের ভূত?" নবীন কহিল, "দোহাই ধর্ম্মের, আমি হিন্দু।" "তোবা তোবা! আওরঙ্গজেব বাদসাহের পরে হিন্দুর ভূত ভুলিয়াও মস্‌জিদের কাছ দিয়া যায় না।" "তবে কি করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে?" "নগদ তিন আশরফি বায়না ছাড়—আর বাকি দুইটা দুয়ারের নীচে গলাইয়া রাখ,—আমি এক হাতে টিপিয়া ধরি, আর এক হাতে দুয়ার খুলি।" নবীন একে-একে আরও দুইটি আশরফি গলাইয়া দিল। তিনটি আশরফি হস্তগত হইলে, আগন্তুক কহিল, "জিন সাহেব, তুমি আমীর ছিলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, তুমি যখন জিন্‌,—মুসলমানের ভূত—আর আমি হিন্দু, তখন সাবধানে চলাই কর্ত্তব্য। তুমি একটু বিলম্ব কর আমি আশরফি তিনটা একজনকে দিয়া আসি।" নবীন তাহার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ফরীদের গৃহত্যাগ

ছিপ ও নৌকা তীরে লাগিল; আরোহিগণ অবতরণ করিলেন। সেই স্থানে রাজমহলের পথ তীরের ধারেধারে বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। হরিনারায়ণ প্রভৃতি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একখানা রথ অতি দ্রুতবেগে পাটনার দিকে চলিয়াছে। রথখানির সাজসজ্জা অতি মূল্যবান; এবং রথের সারথিকে দেখিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। দূর হইতে অনেক লোক আসিতে দেখিয়া সারথি কহিল, "মণিয়াজান্, দরিয়া হইতে অনেক লোক আসিতেছে।" রথের অভ্যন্তর হইতে মণিয়া কহিল, "রথ রাখ।" সারথি কহিল, "বাপ! মণিয়াজান্, অমন কাজ ফরীদ খাঁ হইতে হইবে না।" "কেন ফরীদ?" "বেগানা জায়গা,—ফরীদ একা,—ফরীদের হাত হইতে যদি পাটনা সহরের সাত বাদশাহের দৌলত লুঠ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না" "চালাকী রাখ্, রথ থামা।" "যো হুকুম জনাব।"

রথ থামিল; মণিয়া রথ হইতে নামিল। নদীতীর হইতে যাহারা আসিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া মণিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আল্লা, ও আল্লা, ও হিন্দুর ভগবান্, তবে তুমি আছ! ফরীদ, আমি তোর মজলিসে পূরা একহপ্তা মুজরা করিব। বহিন্, রথ হইতে নাম,—তোমার বাপ ও ভাই

আসিয়াছেন।" এই সময়ে অসীম কহিলেন, "দাদা, দূরে গেরুয়া পরিয়া মণিয়ার মত একটা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে না?" সুদর্শন কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, "সেই রকমই ত লাগে! ছোটরায়, ও বেটী কি মনে করিয়া আসিল?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "মণিয়া বাঈ বটে, এবং আমাদিগকেই ডাকিতেছে।"

সকলে দ্রুতপদে রথের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে রথ হইতে দুর্গাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া, বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার দৌড়িয়া গিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। ফরীদ খাঁ রথের দীপ জ্বালিলে, সকলে তাঁহার চারিদিকে উপবেশন করিলেন। মণিয়ার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অসীম কহিলেন, "এখন আপনারা কি করিবেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "এখনই সকলে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিবেন।" হরিনারায়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "তুমি আবার এই কথা বলিতেছ?"

ত্রিবিক্রম। এ কথা ত তোমাকে বরাবরই বলিয়া আসিতেছি।

হরিনারায়ণ। যাইব কেমন করিয়া?

ত্রিবি। কেন, কন্যা পুত্রবধূ ত পাইয়াছ?

হরি। তৈজসপত্র?

অসীম। বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। নবীন যাহা রাখিয়া আসিয়াছিল, প্রতিবেশীরা তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছে।

মণিয়া। এই রাত্রিতে পাটনায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে; কারণ, গুণ্ডার দল আবার আক্রমণ করিতে পারে।

হরি। তৈজসপত্র যখন কিছুই নাই, তখন আর পাটনায় ফিরিয়া কি হইবে? ত্রিবিক্রম, তোমার কথাই ঠিক,—আমরা এখনই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব।

ত্রিবি। তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই,—এখন যাত্রা করিলেই ভাল।

হরি। অসীম, তুমি কোথায় যাইবে?

ত্রিবি। অনেকদূর,—সূতীর মোহনা পর্য্যন্ত।

অসীম। চলুন, আপনাদিগকে কিয়দ্দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি। বাদশাহ এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন; ভূপেন ফৌজের সঙ্গে গিয়াছে।

ত্রিবি। তাই ত ভাই,—বিবাহের সময়ে আমাকেই কোলবর সাজিতে হইবে?

অসীম। বিবাহ! আপনি কি বলিতেছেন?

মণিয়া। পথে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। পাটনা সহরের চারিদিক তেমন ভাল জায়গা নহে।

সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সময়ে মণিয়া ত্রিবিক্রমের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ্ কেয়া ফরমাতে হেঁ? ইয়ে বাঙ্গালী রাজা সাহেব কেয়া সাদী করেন কে লিয়ে যা রহেঁ?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "জরুর। আপ ভি উনকো সাথ্ সাথ্ আওয়েঙ্গে।" "কবহি

নেহি” বলিয়া মণিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। চলিতে-চলিতে সহসা হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মণিয়া কোথায় গেল?” সকলে চাহিয়া দেখিলেন, মণিয়া বা ফরীদ খাঁ তাহা-দিগের সঙ্গে নাই। অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফরীদ খাঁও ত নাই?” ত্রিবিক্রম কহিলেন, “তাহারা দুইজনে রথে ফিরিয়া গিয়াছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে,—এখন আর তাহাদের সন্ধানে ফিরিলে চলিবে না।” সকলে নৌকায় উঠিলেন; নৌকা ও ছিপ রাজমহলের দিকে চলিল।

মণিয়া ত্রিবিক্রমের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া, ফরীদ খাঁর বস্ত্রাকর্ষণ করিল; এবং ধীরে ধীরে তাহার সহিত অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ফরীদ অনুভবে বুঝিল যে, তাহারা দুইজনে অন্য পথে চলিয়াছে। ক্রমে উভয়ে রথে ফিরিয়া আসিল। তখন ফরীদ খাঁ জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কোথায় যাইব?” মণিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, পাটনায়।” ফরীদ সোল্লাসে অভিবাদন করিয়া কহিল, “যো হুকুম, জনাব।” “এখান হইতে শহর কতদূর?” “আট-দশ ক্রোশ হইবে।” “কখন পৌছিব?” “সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে।”

রথ চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুইদণ্ড পরে ফরীদ খাঁ রথ থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মণিয়া বিবি, তুমি কি জাগিয়া আছ?” মণিয়া কহিল, “হাঁ। আমি ত ঘুমাই নাই। নানা চিন্তায় ঘুম আসে নাই।” “রথ থামাইলাম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। যদি অনুমতি দাও, তাহা হইলে

জিজ্ঞাসা করি।" "এত বড় কি কথা ফরীদ ভাই, যে রথ থামাইতে হইবে?" "মণিয়া বিবি, হয় ত তোমার কাছে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু আমার কাছে প্রকাণ্ড। এই সমস্ত দুনিয়াটার মত বড়।" "ফরীদ ভাই, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? এই দুই-তিন বৎসরের মধ্যে তুমি ত আমাকে মণিয়া বিবি বলিয়া ডাক নাই?" "সে কথা সত্য। দেখ মণিয়া, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহাতে আমার চোখে দুনিয়াটা যেন নূতন চেহারা ধরিল। অনেকদিন ধরিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া একটা সুর যেন কাণে বাজিতেছিল,—হঠাৎ সেটা যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রথ থামাইলাম। মণিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?" "কর।" "তুমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিও।" "দিব।"

"দেখ মণিয়া, এতদিন ধরিয়া জীবনটা কেমন করিয়া কাটাইয়াছি, তাহা এখন ভাল মনে পড়িতেছে না। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এতদিন কি করিয়াছ, তাহা হইলে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিব না। আমার পিতা, পিতামহ যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমার প্রথম জীবনটা ত সে ভাবে যাপন করি নাই! মণিয়া, জীবনের গতিটা পরিবর্ত্তন করিবার সময় বোধ হয় আসিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। হয় ত একা পারিব না। তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে?" "কেমন করিয়া ফরীদ ভাই?" "কেমন

করিয়া, সে কথা এক কথায় বলিতে পারিব না। মণিয়া, আমার মনে হইতেছে যে, জীবনের পথে প্রতি পদে যদি তোমার সঙ্গ পাই, তাহা হইলে হয় ত কখনও পদস্খলন হইবে না। তোমার সঙ্গ পাইবার অধিকার আমার নাই ; কারণ আমি মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ;—কখনও উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার নিকট তুমি দেবী,—তাহা জানিয়াও তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মণিয়া! কারণ, কে যেন আমাকে বলিতেছে যে, তোমার সঙ্গ যদি না পাই, তাহা হইলে প্রথম জীবনে উদ্দাম গতি রোধ করিতে পারিব না।" "ফরীদ, তুমি জান আমি কে, আর তুমি জান তুমি কে?" "জানি, তুমি রূপসী গুণশালিনী দেবী—আর আমি, মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল লম্পট।" "তুমি জান যে তুমি আমীরের পুত্র,—তোমার পিতা হিন্দুস্থানের একজন বিখ্যাত বীর,—আলমগীর বাদ্‌শাহের একজন বিখ্যাত কর্ম্মচারী ;—আর আমি হিন্দু বেশ্যার মুসলমান উপপতির কন্যা, —উদরের জন্য পাটনার পথে-পথে দেহ বিক্রয় করিয়া বেড়াই। ফরীদ্, আমি কি তোমার যোগ্যা জীবনসঙ্গিনী?" "হাঁ মণিয়া,—একবার নহে শতবার, শতবার নহে সহস্রবার। আমি জানি আমি কি। পিতার পুত্র হইলেই সে পিতৃপদ লাভ করে না,—তাহার যোগ্যতা প্রতিপাদন করিতে হয়। প্রথম জীবন আমি তোমার সঙ্গে কাটাইয়াছি; যদি চিরদিন তোমার সঙ্গ পাই, তাহা হইলে হয় ত একদিন হিন্দুস্থানে পিতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব ;—নতুবা নহে। মণিয়া জন্মকথা বিস্মৃত

হও। আমি মুসলমান,—আমার ধর্ম্মে, হিন্দুর যে বাধা আছে, তাহা নাই। মণিয়া, আমাকে কি মানুষ হইতে দিবে?" মণিয়া উত্তর দিতে পারিল না। অর্দ্ধদণ্ড পরে ফরীদ পুনরায় ডাকিল, "মণিয়া বিবি!" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মণিয়া কহিল, "কি ভাই?" "আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না?"

মণিয়া সহসা রথের বাহিরে আসিয়া ফরীদ খাঁর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "ফরীদ, তাহা হয় না ফরীদ। তুমি আমাকে যে সম্মান করিয়াছ, এ দুনিয়ায় কসবীর কন্যাকে সে সম্মান কয়জন করিতে পারে? কিন্তু আমি সে সম্মানের যোগ্যা নহি;—আমি তোমার সে খাতির রাখিতে পারিলাম কই? ফরীদ, ভাই, আমি তোমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসি। আমি জানি, আমার জন্য তুমি কত গঞ্জনা সহ্য করিয়াছ,—কত লাঞ্ছনা, কত অপবাদ হাসিমুখে উড়াইয়া দিয়াছ; কত বিপদে, কত আপদে বুক পাতিয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ। ফরীদ ভাই, তোমার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। তুমি আমার ভাই,—আমার বড় ভাই। জীবনে কখনও ভ্রাতৃ-স্নেহ পাই নাই,—গত দুই বৎসর সে স্থান তোমাকে দিয়া পূরাইয়া রাখিয়াছি। ভাই, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব,—যদি ছোট বহিন্ বলিয়া তোমার মনের কোণে একটু স্থান দাও,—তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।"

ফরীদ খাঁ নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। শেষ কথাটার সময়ে সে শিহরিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে

কহিল, "বহুৎ আচ্ছা—যো হুকুম বিবি সাহেব।" মণিয়া রথের ভিতরে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। একদণ্ড পরে মণিয়া যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন রথ শূন্য। সে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "ফরীদ, ফরীদ, ফরীদ ভাই, ফরীদ খাঁ!" দূর পর্ব্বত-প্রান্ত হইতে তাহার আকুল আহ্বানের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে ফরীদ খাঁর সুসজ্জিত শূন্য রথ পাটনা শহরে পৌঁছিল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সতী-বাক্য

গঙ্গাতীর জনশূন্য। বিস্তৃত শুভ্র শুষ্ক সৈকত ঝিল্লীরবে মুখরিত। তীরে জীর্ণ ঘাটের সোপানের উপরে বসিয়া এক তরুণী একমনে মাল্য রচনা করিতেছিল। অদূরে গ্রামে কোন ধনি গৃহে রৌশনচৌকী বাজিতে ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার শব্দ আসিয়া যুবতীকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল। তখন দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, শুষ্ক তপ্তসৈকত জনশূন্য। বাদ্যধ্বনি শুনিয়া তরুণী মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া মাল্য রচনা বন্ধ করিতেছিল, আবার তখনই ক্ষিপ্র হস্তে রাশি রাশি করবী সূত্রে গাঁথিতেছিল।

অদূরে একটা কুক্কুর প্রহৃত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া তরুণী অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং সূত্র ও সূচী

দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিল। গ্রামের দিক হইতে পরিপূর্ণ থালা লইয়া এক প্রৌঢ়া রমণী আসিতেছিলেন, তরুণী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কুকুরকে মারিলে কেন কাকিমা ?" প্রৌঢ়া কহিলেন "না মারিলে ছুঁইয়া দেয় যে মা!" "দিলেই বা!" "ও আমার পোড়া কপাল! তোমাকে বুঝাই কি করিয়া মা ? কুকুরের ছোঁয়া কি খাইতে আছে ?" এই সময়ে লোষ্ট্রাহত কুকুরটি তরুণীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া সে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সম্ভাষণ করিল, কুকুর লাঙ্গুল চালনা করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। প্রৌঢ়া এই অবসরে দেখিতে পাইলেন যে ঘাটের উপরে রাশি রাশি করবী ও শেফালি পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শৈলের জন্য মালা গাঁথিতেছিস্ বুঝি ?" তরুণী কুপিতা হইয়া কহিল "শৈলের জন্য মালা গাঁথিব কেন, আমার নিজের জন্য গাঁথিতেছি।" "কেন তোমার মালা কি হইবে মা ?" প্রশ্ন শুনিয়া সহসা তরুণীর সুন্দর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া কহিল, "আজি যে তিনি আসিবেন ?" প্রৌঢ়া দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তোমার কপালে আর তিনি আসিয়াছেন! এত দুঃখও ছিল তোমার বরাতে! সতীমা, ফুলগুলি নষ্ট করিও না মালা গাঁথিয়া শৈলকে দিয়া এস।" তরুণী প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া রাগিল এবং মস্তকের বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া কহিল, "শৈলকে দিব

কেন, তাহার বিবাহের দিন দিব।” প্রৌঢ়া হাসিয়া কহিলেন “রাগিস্ কেন মা, আজি ত শৈলর বিবাহ।” “কখ্খনো না।” “পাগলী, অমন অলক্ষণ কথা বলিতে নাই। ঐ শোন, নহবৎ, রোশনচৌকী বাজিতেছে।” “তা হোক্ শৈলের বিবাহ আজ হইবে না। কাকিমা ঐ দেখ পশ্চিমে মেঘ উঠিয়াছে, ঐ দেখ ঝড় উঠিল, ঐ দেখ নৌকা ডুবিল, বরযাত্রী সব, ডুবিয়া গেল—” “থাম্ থাম্ ও সতী, অমন কথা মুখে আনিতে নাই। পাগলী কি বলে গো! হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর, আমি যাই বাছা, মরিতে তোকে ফুলের কথা বলিতে গিয়াছিলাম!” “কাকিমা, যেওনা, ঐ যে দেখিতেছ শাদা বালির রাশি, এখনই জলে ভরিয়া যাইবে, ঐ অশ্বথ তলায় বরের নৌকা শত খণ্ড হইয়া আছড়াইয়া পড়িবে।”

প্রৌঢ়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে কুকুরটা তাঁহাকে ছুঁইয়া ছিল তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তরুণী পুনরায় মালা গাঁথিতে বসিল; বাদ্য থামিয়া গেল, গ্রামে কোলাহল বাড়িতে লাগিল, একটা, দুইটা, তিনটা করিয়া ক্রমে অনেকগুলি মালা গাঁথা হইল, তখন সুকোমল শুভ্রবাহুতে শুভ্র পুষ্প স্রজঃ সাজাইয়া লইয়া সুন্দরী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে একখানা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে বসিয়া এক প্রৌঢ় হুঁকা লইয়া আহারান্তে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। তরুণী তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তকের অবগুণ্ঠন টানি

দিয়া ডাকিল, "বাবা" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "কেন মা?" লজ্জাবনত মুখী কন্যা কহিল "বাবা, আজ যে তিনি আসিবেন?" পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে মা?" আনত বদনে পদনখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কন্যা কহিল, "তোমার জামাই।" কন্যার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া দিলেন, একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহা আবার উঠাইয়া লইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জেলে ডাকিয়া আনিব?" অন্যমনস্ক বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "জেলে কি হইবে মা?" "কেন মাছ ধরিবে? অনেক লোক আসিবে।" "অনেক লোক কোথা হইতে আসিবে?" "কেন তাঁহার সঙ্গে?" বিশ্বনাথ মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্বিতীয়বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কন্যা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "জেলে ডাকিব?" অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস।"

কন্যা সানন্দে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিশ্বনাথের পত্নী তখন আহারান্তে গৃহের সম্মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কন্যা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করি[illegible] "মা, জেলে ডাকিতে যাইব কি?" কন্যার শুষ্ক, রুক্ষ কেশগুচ্ছ কপাল হইতে সরাইয়া দিয়া মাতা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা?" "আজ যে তিনি আসিবেন?" "তিনি কে?" [illegible]াদরিণী কন্যা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কেন, [illegible]তামার জামাই।" মাতার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া গেল।

তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "ঘরে মাছ আছে।" "তাহাতে হইবে না, তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিবে মা?" মাতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি চির দুঃখিনী কন্যাকে বুকে চাপিয়া লইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যা মাতার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল "মা, লোকে বলে আমি পাগল কিন্তু আমি ত পাগল নই। তুমি কখনও আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ?"

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সতীর পতিপ্রাপ্তি

চারিদিকে ঘন অন্ধকার, ঝড়ের শব্দে অন্যশব্দ শোনা যাইতেছিল না। ভগ্নবৃক্ষশাখা ও পর্ণ কুটীরের ধ্বংসাবশেষে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ রুদ্ধপ্রায়। সেই ভীষণ ঝড়ের রাত্রিতে সতী একাকিনী সেই পথ ধরিয়া ভাগীরথী তীরে আসিল। তখন যেন ইন্দ্রজাল বলে ভাগীরথীর শুষ্ক বেলা অন্তর্হিত হইয়াছে, যে ভাগীরথী-বক্ষ সচরাচর ক্ষুদ্র বীচিখচিত প্রশান্ত, তাহা যেন সহসা কোন্ তীব্র মাদকের উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, নদীর জল প্রবল ঝড়ের তাড়নায় দীর্ঘ বেলা অতিক্রম করিয়া ঘাটের সোপানের পাদমূলে আছড়িয়া পড়িতেছে। সহসা বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

এবং মুহূর্ত্তপরেই বজ্র ভীষণনাদে এক তরুশিরে আঘাত করিল। কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া সতী ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল, আকাশ যেন সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, তাহার আলোকে সতী দেখিল একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ একখানা বৃহৎ নৌকাকে উর্দ্ধে উঠাইয়া আবার গভীর জলে নিক্ষেপ করিল, নৌকা সশব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে তরঙ্গমালা দুই একটি মৃতদেহ ও বহু কাষ্ঠখণ্ড তীরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। সতীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে ছুটিয়া গিয়া দেখে কে মরিল; কিন্তু একটা অদৃষ্ট শক্তি আসিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া দিল।

ক্রমে বায়ুর বেগ মন্দ হইয়া আসিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সতীর বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল, তথাপি সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, তাহার হৃদয় সহসা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সতী দ্রুতপদে শব্দের দিকে অগ্রসর হইল। একসঙ্গে তিনজন মানুষ আসিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না?" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়, অনেকক্ষণ ধরিয়াই তো অন্ধকার দেখিতেছি!" প্রথম ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি রায়জী, জায়গাটা চিনিতে পারিলে না?" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "কেমন করিয়া চিনিব?" "ঐ দেখ গঙ্গার ঘাট, অদূরে পুষ্করিণী, তাহার জীর্ণ ঘাটে একটা

শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে, গ্রামে আলোক নাই, বোধ হয় অনেক ঘর পড়িয়া গিয়াছে।” এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনি কি সত্য সত্যই এই সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন? আমার কিন্তু মনে হইতেছে যে, সমস্তই ভোজবাজী।” “ভোজ-বাজী নহে সুদর্শন, বহুকাল অন্ধকারই দেখিয়া আসিতেছি, সেই জন্য আমার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।”

দূর হইতে শেষ কথা সতীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে শব্দস্পর্শে তাহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সতী কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “অন্ধকারে দেখ, তুমি কে?” তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘোর সূচীভেদ্য অন্ধকারে মনুষ্যত্রয় দাঁড়াইয়া গেল। সতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, “অন্ধকারে দেখ তুমি কে?” ত্রিবিক্রম উত্তর দিলেন না, তাহা দেখিয়া অসীম সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, “মা, আমরা মানুষ, অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি, তুমি যদি পার, আমাদিগের নিকটে আইস।” সতী আবার জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদিগের মধ্যে যে অন্ধকারে দেখিতে পায় সে কোথায়?” ত্রিবিক্রম তখনও নিরুত্তর। সতী তখন অসীমের নিকট আসিয়া বলিল, “বাবা কাল তোমার বিবাহ, নিকটে মৃতদেহ পড়িয়া আছে, স্পর্শ করিও না।”

আবার বিদ্যুৎ চমকিল, তীব্র আলোকে অসীম ও সুদর্শন দেখিল, আগন্তুক তরুণী, রূপসী, বিবাহের বেশে সজ্জিতা। সতী আলোকে ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তখন অসীম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে মা?" উত্তর হইল, "আমি সতী!" "এই দুর্য্যোগে নিশীথ রাত্রিতে কোথায় চলিয়াছ মা?" "স্বামীর নিকট।" "তোমার স্বামী কোথায়?" সতী ত্রিবিক্রমকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইনিই আমার স্বামী।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমিই কি আমার নিয়তি?" সতী বলিল, "সে কথা বলিতে পারি না। আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে; এই গ্রামে আসিয়া আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া গিয়াছিলেন।" "তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আমি তোমার স্বামী?" "সে বলিয়া দিয়াছে।" "সে কে?" "দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শ্মশানে গেলে সে আমার সহিত কথা কহে কিন্তু আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই।" "তিনি কি বলিয়াছেন?" "আজ বলিয়াছেন যে দ্বিপ্রহর রাত্রির পরে অন্ধকারে পথ হারাইয়া আপনি এইখানে আসিবেন। আমি তাঁহার কথামত আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি!"

বৃষ্টির বেগ বাড়িল, ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাইব? আমার সঙ্গে অনেক লোক আছে, তাহাদিগের আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।" সতী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বলিল, "সে কথাও সে বলিয়াছে, সকলের বন্দোবস্তই হইয়াছে। আপনার বন্ধু তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, গ্রামে গিয়া লোক পাঠাইয়া দিই।" অন্ধকারে তিনজন

পুরুষ সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে উপস্থিত হইল।

পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া সতী পিতাকে কহিল, "বাবা, তাঁহারা আসিয়াছেন।" বিশ্বনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আগন্তুক-ত্রয়ের প্রতি চাহিলেন, তাঁহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া ত্রিবিক্রম প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমিই আপনার জামাতা ত্রিবিক্রম।" বিশ্বনাথের বিস্ময় কিন্তু তাহাতেও দূর হইল না, তিনি বলিলেন, "বাপু, মাত্র একটি দিন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সুতরাং চিনিতে পারিলাম না তো? প্রমাণ না পাইলে কেমন করিয়া তোমাকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিব?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া বলিলেন, "সাক্ষীর প্রমাণ সবই আনিয়াছি, আমার একবন্ধু কন্যা ও পুত্রবধূ লইয়া প্রায় একক্রোশ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনি তাহাদিগকে আশ্রয়ে আনিবার ব্যবস্থা করুন। জামাতা না হই, মনে করুন আমি অতিথি, বিপন্ন ও পথভ্রান্ত ব্রাহ্মণ।" বিশ্বনাথ দুই তিন জন গ্রামবাসীকে ডাকাইয়া, দুই তিনটা মশাল প্রস্তুত করাইয়া তাহাদিগকে হরিনারায়ণের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। অসীম ও সুদর্শন তাহাদিগের সহযাত্রী হইল। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার কন্যা ও পুত্রবধূ সহ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গৃহে আশ্রয় পাইলেন।

তখন বিশ্বনাথের প্রতিবেশী মিত্র-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে বরের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, বর ও বরযাত্রী দুই জনের দেহ ঘাটের নিকটে পাওয়া গিয়াছে।

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ বৈষ্ণব

রথ পরিত্যাগ করিয়া মণিয়া পাগলিনীর ন্যায় ফরীদ খাঁর সন্ধান করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু রজনীর অন্ধকারে, জনশূন্য প্রান্তরে সে ফরীদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। তখন তাহার চক্ষু যেদিকে যাইতেছিল, সে সেই দিকেই চলিতেছিল। চলিতে-চলিতে, একপ্রহর পরে দূরে একটা আলোক দেখিতে পাইয়া, মণিয়া সেই পথে চলিল। নিকটে গিয়া দেখিল, একটা জনশূন্য মন্দির মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। মণিয়া মন্দিরের ভিতরে দুয়ারের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ি

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও সূর্য্যো হয় নাই। মণিয়া জাগরিত হইয়া দেখিল, এক স্থূলকায় কার বৃদ্ধ তাহার দিকে চাহিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহ দেখিয়া, সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, মস্তকের বস্ত্র টানিয়া দিল। দ্ধ কহিল, "তোমার কোন ভয় নাই মা,—আমি বুড়া মানুষ, পথ চলিতে-চলিতে তোমাকে একাকিনী দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছি। এই নবীন বয়সে ভরা রূপের ডালি লইয়া একা কোথায় চলিয়াছ মা? তুমি গেরুয়া কাপড় পরিয়া আছ বটে, কিন্তু তুমি ত সন্ন্যাসিনী নহ; কারণ, তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভোগের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি অল্পদিন গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ।"

মণিয়া কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। তখন বৃদ্ধ কহিল "মা, আমি বুড়া, তোমার পিতামহের বয়সী, আমার নিকটে লজ্জা করিও না। তোমার অঙ্গুলিতে যে হীরকের অঙ্গুরীয়ক রহিয়াছে, তাহার মূল্য হাজার টাকার কম নহে। তুমি ধনীর বধূ;—যদি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে চল, আমি তোমাকে স্বামি-গৃহে দিয়া আসি। আমার সঙ্গে গেলে কোন দোষ তোমাকে স্পর্শ করিবে না।" এইবার মণিয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইল। সে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে কহিল, "আমার স্বামী নাই।" "তবে কি তুমি বিধবা?" "না, আমার বিবাহ হয় নাই।" "ভাল কথা। তবে চল, তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসি।"

মণিয়া বিষম বিপদে পড়িল। সে তখন ফরীদ্ খাঁর চিন্তায় বিব্রত। ধনীর পুত্র ফরীদ খাঁ আশৈশব সুখে লালিত,—একাকী তাহার জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদণ্ড তাহার সংবাদ না পাইলে, তাহার পিতামাতা আকুল হইয়া উঠে। না জানি, আজি দিনান্তে তাহাদিগের অবস্থা কি হইবে। সে কেমন করিয়া ফরীদ খাঁকে বুঝাইয়া, শান্ত করিয়া পিতৃগৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, ইহাই তখন মণিয়ার একমাত্র ধ্যান হইয়াছিল। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কথা তখন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

বুড়া তাহার মনের ভাব বুঝিল; বুঝিয়া হাসিল। সে কহিল, "মা, বুড়ার কথাগুলি বড়ই তিক্ত লাগিতেছে, তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু কি করিব মা, আমি তোমাকে এই জনশূন্য

পথে একাকিনী রাখিয়া যাইতে পারিব না। গোপাল যতক্ষণ তোমাকে সুমতি না দেন, ততক্ষণ তোমার সঙ্গেই রহিলাম।” বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া সহসা মণিয়া বলিয়া উঠিল, “গোপাল কে?” বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তুমি হিন্দুর মেয়ে,—অথচ, গোপালের নাম শুন নাই? আমরা বাঙ্গালী, আমরা গোপাল বলিয়াই ডাকি। এ দেশেও তাঁহার গোপালজী নামের অভাব নাই। তুমি বোধ হয় পঞ্জাবী? মা, যিনি গোপাল, তিনিই গোবিন্দ, তিনিই শ্রীচন্দ্র তিনিই পাণ্ডুরঙ্গ, তিনিই পার্থ-সারথী।” মণিয়া লজ্জিতা হইল, কারণ, নামগুলা সমস্তই তাহার নিকট অপরিচিত। সে অধোবদনে কহিল, “বাবা, আমি হিন্দুর মেয়ে নহি, আমি মুসলমানী।” বৃদ্ধ বৈষ্ণব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে গেরুয়া পরিয়াছ কেন মা?” মণিয়া অধিকতর লজ্জিতা হইয়া কহিল, “আমি হিন্দু হইতে চাহি।” তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল। মণিয়া পুনরায় কহিল, “বাবা, আমি মুসলমানী, নর্ত্তকীর কন্যা নর্ত্তকী। বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব বলিয়াই সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছি।” বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, “ভাল কথা মা, ধর্ম্মপথ ত মুসলমানেরও আছে, তবে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহ কেন? আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, নিজধর্ম্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যিনি গোপাল, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই আল্লা। নামের ভেদ ও উপাসনার আকার-ভেদে কিছুই আসে যায় না। দেখ মা, আমি বুড়া হইয়াছি, সমস্ত দাঁতগুলা পড়িয়া গিয়াছে, চোখেও

ভাল দেখিতে পাই না। তবে এই জগতে বহুদিন বাস করিতেছি; অনেক ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। সুতরাং সকল জিনিস দেখিতে না পাইলেও, অনুভবে বুঝিতে পারি। মা, আমার নিকট আত্মগোপন করিতেছ কেন? গুরুতর কারণ না থাকিলে, লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।"

বুড়ার কথা শুনিয়া মণিয়ার মন গলিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া সস্নেহে কহিল, "কাঁদ মা, প্রাণ ভরিয়া মন ভরিয়া কাঁদ,—প্রাণের ব্যথা আর মনের মলা অশ্রুজল ভিন্ন যায় না।" তখন রৌদ্র উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মণিয়ার নিকটে আসিয়া বসিল; এবং তাহার শীর্ণ হস্ত মণিয়ার মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া মণিয়া যখন শান্ত হইল, তখন বৃদ্ধ একে-একে মণিয়ার মনের সকল কথাই টানিয়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত শুনিয়া বুড়া কহিল, "মা, তোমার সমস্যা বড়ই জটিল। আমি কি বলিব বল? চক্রী ভিন্ন এ চক্রান্ত ভেদ করা অসম্ভব।"

মণিয়াকে শান্ত করিয়া, বুড়া ঘটিতে দড়ি বাঁধিয়া কূপ হইতে জল উঠাইল; এবং নিজে হাত মুখ ধুইয়া মণিয়াকে জল তুলিয়া দিল। তখন বুড়া মন্দিরের দুয়ারে বসিয়া কণ্ঠলগ্ন একটি রূপার কৌটা বাহির করিল; এবং তাহা হইতে একটি স্ফটিকের গোপাল-মূর্ত্তি বাহির করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পূজা শেষ হইলে, বুড়া আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল। মণিয়া একমনে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। বুড়া গোপালকে

শাসাইয়া কহিল, "বাপু হে, তোমার সা… …আর পারিয়া উঠা যায় না। শেষটা তোমাকে মারিতে …বে দেখিতেছি। পৃথিবীর যত নষ্টের মূল তুমি। ইহাকে … দিয়া তোমার কি সুখ হইতেছে? আজন্মকাল তুমি সোজা পথে চলিতে শিখিলে না। এখন ইহার একটা উপায় কর। যবনী বেশ্যা-কন্যাকে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বিবাহ করিবে না, এ কথা কি তুমি জান না?" মণিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, গোপাল কি বলিলেন?" বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, বিগ্রহটিকে রূপার কৌটায় তুলিল; এবং তাহার কণ্ঠে ঝুলাইয়া কহিল, "মা, গোপাল বড় কিছু বলিল না; এইমাত্র জানাইল যে, তুমি কাল হইতে উপবাসী আছ; কিছু আহার কর।" মণিয়া কহিল, "এখানে কোথায় কি পাইব? কোন একটা গ্রাম পাইলে কিছু কিনিয়া খাইব।" "গ্রাম এখনও অনেক দূরে। উপস্থিত গোপালের প্রসাদ পাও।" বৃদ্ধ বস্ত্রমধ্যে হইতে দুই মুষ্টি চূর্ণ বাহির করিল; এবং এক মুষ্টি অশ্বত্থ-পত্রে মণিয়াকে দিয়া, স্বয়ং আহার করিতে আরম্ভ করিল। আহারান্তে বৃদ্ধ কহিল, "মা, তোমার এখন পূর্ব্বদেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—না?" মণিয়া কহিল, "হাঁ।" "মনের বেগ কি কোন মতে দমন করিতে পারিবে না?" "উপস্থিত পারিতেছি না বাবা।" "পারিবে কেমন করিয়া মা? আমরা বলি বটে আমি করি, তুমি কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোপাল যাহা

করান, তাহাই করি। উপস্থিত তুমি পূর্ব্বদিকে গেলে, তোমার প্রিয়জনের অমঙ্গল সম্ভাবনা। কিন্তু যিনি তাহাকে তোমার প্রিয় করিয়াছেন, তিনিই যখন তাহার অমঙ্গল ঘটাইতে চাহেন, তখন নিবারণ করিবে কে? বেলা বাড়িয়া উঠিল,—চল গ্রামের সন্ধানে যাই।"

উভয়ে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের সন্ধানে চলিল। তখন করীদ খাঁ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছে।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

আপন্ন রক্ষণ

রাত্রি শেষে হরিনারায়ণকে লইয়া যখন অসীম ও সুদর্শন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। হরিনারায়ণ আসিয়া দেখিলেন যে, ত্রিবিক্রম বিশ্বনাথের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এক প্রৌঢ়ের সহিত কথা কহিতেছেন। সতী আসিয়া দুর্গা ও সুদর্শনের পত্নীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, সকলে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ত্রিবিক্রমের নিকটে বসিলেন। প্রৌঢ় বলিতেছিল, "আর কি তেমন পয়সার জোর আছে? বাপ-পিতামহের আমলে যাহা ছিল, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও নাই। আর

পয়সা থাকিলেই বা কি হইত ঠাকুর! গ্রামে আমাদের পর্য্যায়ের পাত্র নাই; সুতরাং আমার আর উপায় নাই। বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হইল না—এ কথা শুনিলে কোন্ কুলীন-সন্তান আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে আসিবে? তাহার উপর অলক্ষণা নাম শুনিলে সকলেই পিছাইয়া যাইবে।" প্রৌঢ় একমনে কথা কহিয়া যাইতেছিল। ত্রিবিক্রম উত্তর না দিয়া মন্দ-মন্দ হাসিতেছিলেন। বিশ্বনাথ তাহা দেখিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, হাসিতেছ কেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "অদৃষ্ট-চক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া।"

প্রৌঢ়। ঠাকুর, শৈল যেদিন ডুবিয়া গিয়াছিল, সেদিনও আপনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, শৈল হইতে আমার এমন দুরবস্থা হইবে। এখন জাতি যায়, তাহার উপায় কি?

ত্রিবিক্রম। মিত্রজা, তোমার জাতি যাইবে না।

বিশ্বনাথ। উপস্থিত রাত্তি পোহাইলেই যে জাতি যাইবে?

ত্রিবি। যাইবে না।

অসীম। কি করিলে আপনার জাতি রক্ষা হয়?

বিশ্ব। অদ্য রাত্রিতে যদি অপর পাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে জাতি রক্ষা হইতে পারে। কি বল সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বেশ্বর। সমাজের কথা ত দাদা সমস্তই আপনার জানা আছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সমাজ সমান।

অসীম। যদি আজ রাত্রিতে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কি আপনার কন্যার আর বিবাহ হইবে না?

ত্রিবি। তৃতীয় প্রহরে যে দ্বিতীয় লগ্নটা ছিল, তাহাও অতীত হইয়াছে। তবে বিধির বিধান—কাল গোধূলি লগ্নে বিবাহের যোগ আছে।

অসীম। মিত্র মহাশয়ের যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

সর্ব্বে। আপনি, তুমি—?

ত্রিবি। ইনি কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের ভ্রাতা, ভূতপূর্ব্ব কানুনগোই জয়নারায়ণ রায়ের পুত্র অসীমচন্দ্র রায়!

সর্ব্বে। বাবা, তুমি আমার স্বঘর। তোমার পিতামহ শ্রীনারায়ণ রায় আমাদের বংশে কন্যাদান করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ উঠিয়া উভয় হস্তে অসীমের হস্ত আকর্ষণ করিয়া ধরিল; এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে-করিতে কহিল, "বাপু, তুমি ভিন্ন আমার উপায় নাই। তুমি আমার অগতির গতি।" এই সময়ে ত্রিবিক্রম পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বনাথ ও হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিলে কেন?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সে কথা পরে জানাইব।" হরিনারায়ণ তখন অসীমকে কহিলেন, "দেখ, মিত্র মহাশয়ের এখন বড় বিপদ। বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করাই মহতের কর্ম্ম। তুমি মহৎ বংশজাত, সুতরাং তোমার উপযুক্ত কথা হইয়াছে। নারায়ণ বোধ হয় মিত্র মহাশয়কে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের অদ্য রাত্রিতে

এখানে আনিয়াছেন।" সুদর্শন এই সময়ে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "তবে বিবাহ ঠিক!" সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "ঠাকুর, আমার আর অন্য গতি নাই।" "তবে কন্যা দেখিতে হয়।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কন্যা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "যথারীতি আশীর্ব্বাদ ও আভ্যুদয়িক করিতে হইবে। ভূপেন্দ্রকে বা মুরশিদাবাদে সংবাদ দিবার উপায় নাই। অসীম, সমস্তই তোমাকে একা করিতে হইবে।" সর্ব্বেশ্বর সানন্দে কহিলেন, "তবে আমি সংবাদটা বাড়ীতে দিয়া আসি?" হরিনারায়ণ কহিলেন, "যাও।" সর্ব্বেশ্বর প্রস্থান করিলে, ত্রিবিক্রম অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়জী, কোন কথা স্মরণ হয়?" অসীম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কৈ, কিছুই নয়।" "না হইবারই কথা।" "আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না" "বুঝিতে পারিবে,—ঠিক এখনটা পারিবে না,—ক্রমে সকল কথাই মনে হইবে।"

এই সময়ে কাক ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বিশ্বনাথ বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "কি হে, শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছ বলিয়া কি নিত্য-কর্ম্ম ভুলিয়া গেলে?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "নিত্য-কর্ম্মের পূর্ব্বে একটা নূতন কর্ম্ম আছে। তুমি গঙ্গাতীরে যাও, আমি আসিতেছি।" ত্রিবিক্রম উঠিলে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, পথ চিনিতে পারিবে ত?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে বহুবার গ্রামের পথে পথে ভিক্ষা

ফিরিয়া গিয়াছি।" হরিনারায়ণ ও বিশ্বনাথ বাহির হইয়া গেলে ত্রিবিক্রম অন্য পথে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তখন পূর্ব্বদিকে আলোক দেখা দিয়াছে বটে; কিন্তু অন্ধকার দূর হয় নাই। গ্রামের সীমায় ত্রিবিক্রম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, এক রমণী তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। রমণী কাছে আসিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আসিলে কেন? ভয় নাই, আমি পলাইব না। যদি পলাইবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় আসিয়া ধরা দিতাম না।" রমণী সতী। সে কহিল, "আমি আপনাকে ধরিয়া রাখিতে আসি নাই। আপনি যেখানে যাইতেছেন, আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।" বিস্মিত হইয়া ত্রিবিক্রম পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকেও যাইতে হইবে? কেন যাইতে হইবে?" "তাহা বলিতে পারি না।" "তোমাকে কে বলিল?" "যে বলে।" "সে কে সতী?" "তাহা ত বলিতে পারি না—সে কোথা হইতে কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, তাহাও আমি বলিতে পারি না।"

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

হরিদাস বাবাজী

প্রভাতে সর্ব্বেশ্বর মিত্রের গৃহের সম্মুখে পুনরায় নহবৎ

বাজিয়া উঠিল। লোকজন আসিয়া নহবৎখানার বাঁশগুলা উঠাইয়া ফেলিল। ঝড়ে যে গাছ পড়িয়াছিল, তাহা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে মিত্রগৃহের শ্রী ফিরিয়া গেল। তখন বিশ্বনাথের গৃহে হরিনারায়ণ স্বয়ং পুরোহিত সাজিয়া আভ্যুদয়িকের আয়োজন করিতেছেন। সুদর্শন তাহার সহকারী; সুতরাং দায়ে পড়িয়া ত্রিবিক্রম বরকর্ত্তা হইয়াছেন।

পল্লীগ্রাম,—দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা সুতরাং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও বরকর্ত্তা বরের মর্য্যাদা অনুযায়ী বসনভূষণ পাইলেন না। তাহা দেখিয়া হরিনারায়ণ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। বাল্যবন্ধুকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া ত্রিবিক্রম চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে সতী বিষণ্ণবদনে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ ভার কেন সতী?" সতী উত্তর না দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সকলের সম্মুখে কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া, বিশ্বনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে মা, কাঁদ কেন মা?" সকলে মিলিয়া সতীকে শান্ত করিলেন। সে কহিল, "গ্রামের লোক বলিয়াছে,—উনি আমার স্বামী নহেন,—মিথ্যাবাদী জুয়াচোর। তাহারা বাবাকে সমাজে ঠেলিয়া রাখিবে।" বিশ্বনাথ কন্যার কথা শুনিয়া কহিলেন, "কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিবাহের সাক্ষী-সাবুদ সমস্তই উপস্থিত আছে। যে সময়ে সতীর বিবাহ হয়, সেই সময়ে যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দায় উদ্ধারের

চেষ্টায় ছিল। পারে নাই বলিয়া, সেই অবধি আমার উপর রাগিয়া আছে। তাহার জন্ম চিন্তা করিও না মা,—জামাই যখন ঘরে লইয়াছি, তখন ত ঠেলিতে পারিব না! তুমি নিশ্চিন্ত মনে বেড়াও।"

পিতার নিকট আশ্বাস পাইয়া সতী প্রফুল্ল হইল। তখন ত্রিবিক্রম তাহাকে কহিলেন, "পিছনের শিবমন্দিরে একটা তাম্রকুণ্ডে গঙ্গাজল লইয়া যাও, আমি আসিতেছি।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কোথা যাও?" "বরাভরণ আনিতে।" "শিবমন্দিরে কি বরাভরণ মিলিবে? এ কি শিবের বিবাহ, যে শুষ্ক বিল্বপত্র দিয়া বর সাজাইব?" "হিসাবনিকাশ পরে দিব ভাই,—তুমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়, আমি দুই দণ্ডের মধ্যেই ফিরিব।"

ত্রিবিক্রম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সতী পূজার আয়োজন করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহা দেখিয়া কহিলেন, "সতী, পূজার সময় এখনও হয় নাই। তুমি কি শুচি হইয়া আসিয়াছ?" সতী মস্তক চালনা করিয়া সম্মতি জানাইল। ত্রিবিক্রম কহিলেন, "তুমি এই আসনে বসিয়া তাম্রকুণ্ডের জলের দিকে চাহিয়া থাক।" সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বসিবেন না?" "আমি এই কুশাসনে বসিতেছি।" মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, পতি-পত্নী আসন গ্রহণ করিলেন। সহসা ত্রিবিক্রম তাম্রকুণ্ডের জলে ফুৎকার দিলেন। দিবামাত্র জলে আগুন লাগিয়া গেল। সতী শিহরিয়া উঠিল। তখন

ত্রিবিক্রম সতীর ললাট স্পর্শ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া গেল,—ক্রমে ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ হইল।

ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, কি দেখিতেছ?" সতী কহিল, "তাম্রকুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছে। তাহার মধ্যে একটা ছবি। না, বন, নিবিড় বন। বনের মধ্যে একটা সরু পথ। সেই পথ দিয়া একটা লোক চলিতেছে। লোকটা ভয়ানক কাল, বিশ্রী, কদাকার। পরণে রক্ত-বস্ত্র। লোকটা ফিরিল। সে কালীপ্রসাদ। সে উপরের দিকে চাহিয়া আছে।"

ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সতী, তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" উত্তর হইল, "আমার যে ভয় করে!" "তুমি জান, তুমি কে?" "জানি, আমি তোমার স্ত্রী, আমি সতী।" "আর কি?" "আমি শক্তি।" "তবে তোমার ভয় কি?" "কিছু না।" "তুমি কালীপ্রসাদের নিকটে যাও।" "গিয়াছি। কি বলিব?" "বল যে, আমার কতকগুলা অলঙ্কারের প্রয়োজন। মাতার ভাণ্ডারে আমার যে অলঙ্কার আছে, তাহাই আনিতে বল।" "কালীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, অলঙ্কার লইয়া কোথায় যাইবে?" "তাহাকে বল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই গ্রামে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে, পৌঁছাইয়া দিবে।" "বলিয়াছি। এখন কি করিব?" "ফিরিয়া এস। সতী, কি দেখিতেছ?" "কালীপ্রসাদ বনপথ ধরিয়া চলিয়াছে। বনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা মন্দির। তাহার সম্মুখে একটা মরা পড়িয়া আছে,—দুইটা শিয়াল বসিয়া আছে। কালীপ্রসাদ

মন্দিরে প্রবেশ করিল। একটা জবাফুল মরার উপরে ফেলিয়া দিল। কালীপ্রসাদ মরার উপর বসিল। শিয়াল দুইটা বসিয়া আছে।”

“সতী, মন্দিরের ভিতর দেখ।” “দেখিতেছি।” “কি দেখিতেছ?” “পাষাণময়ী প্রতিমা।” “কি প্রতিমা?” “বুঝিতে পারিতেছি না,—বড় অন্ধকার।” “সতী, অন্ধকার দূর কর।” “কেমন করিয়া করিব,—আমি ত জানি না!” “ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।” “দেখিতেছি।” “কি দেখিতেছ?” “মন্দিরে নীল আলো জ্বলিতেছে,—ভিতরে সিংহবাহিনী পার্ব্বতী।” “প্রতিমার মুখ দেখ।” “দেখিতেছি,—মা হাসিতেছেন।” ত্রিবিক্রমের মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি পুনরায় তাম্রকুণ্ডের জলে ফুৎকার দিলেন। আগুন নিবিয়া গেল,—মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূম লুকাইয়া গেল। সতী চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কি করিতেছি?” ত্রিবিক্রম কহিলেন, “কিছু না,—চল, গৃহে ফিরিয়া যাই।”

সতী মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল, এক দন্তহীন, পলিত-কেশ বৃদ্ধ বৈষ্ণব একটী অপূর্ব্ব রূপবতী তরুণী বৈষ্ণবীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন। সতী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি হাসিলেন কেন?” ত্রিবিক্রম কহিলেন, “নিয়তি। সমস্ত কথা এখন বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝাইয়া বলিব।” এই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণবীকে কহিল, “না বুড়া শরীর। কাল ইহার উপর দিয়া

অনেক ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। দুইটা দিন না জিরাইলে, আর চলিতে পারিব না।" বুড়া মন্দিরের সম্মুখে বসিল। বৈষ্ণবী সহসা পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল, ত্রিবিক্রম ও সতী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বুড়াও ফিরিয়া চাহিল। সে ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, বড়ই বুড়া হইয়াছি, উঠিয়া প্রণাম করিতে পারিব না। অপরাধ লইবেন না। কাল রাত্রিতে বড় কষ্ট গিয়াছে। দুইটা দিন না জিরাইলে, পথ চলিতে পারিব না। গ্রামে কি বৈষ্ণবের বাস আছে?" তখন রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রয়হীন বৃদ্ধকে দেখিয়া সতীর মনে দয়া হইল। সে কহিল, "বৈষ্ণবের বাস নাই বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস,—আমাদের বাড়ীতে থাকিবে।" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কে মা। অন্নপূর্ণা আমার,—বুড়া সন্তানের কষ্ট দেখিয়া গলিয়া গিয়াছ?" বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর দিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ত্রিবিক্রম তখন মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিল, এবং দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! ঠাকুর, বুড়া হইয়াছি, চোখে দেখিতে পাই না,—ছলনা করিও না, তুমি কি সেই?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "হরিদাস, আমি সেই, আমি সেই বটে! তোমার চক্ষু তোমাকে প্রতারণা করে নাই।" সহসা বৃদ্ধ মন্দিরের উপরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের পদতলে লুটাইয়া পড়িল; এবং কহিল, "ঠাকুর, বৃদ্ধ বয়সে বড় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি,—

উদ্ধার কর ঠাকুর।" ত্রিবিক্রম বৃদ্ধের হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "হরিদাস, সমস্যা যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই পূরণ করেন—তুমি আমি তাঁহার হাতে খেলার পুতুল মাত্র।" হরিদাস কহিল, "ঠাকুর, বুড়া বয়সে বিদেশে পথে গোপাল এই যুবতী কন্যা গলায় ঝুলাইয়া গিয়াছে,—ইহাকে লইয়া কি করিব ঠাকুর? আমি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল ভুলিয়াছি,—সত্তর বৎসর বয়সে আবার ঘোর সংসারী হইয়াছি,—এ কি ধাঁধায় ফেলিলে ঠাকুর?" "গোপালের কন্যা গোপাল দেখিতেছেন,—তুমি কেবল নিমিত্তের ভাগী। বুড়া হইয়া কি এতদিনের শিক্ষা-দীক্ষা সব ভুলিয়া গেলে হরিদাস?" "ভুলিয়া গেলাম বৈ কি ঠাকুর! এখন গোপালের চিন্তা, পরলোকের চিন্তা ভুলিয়া, উহাকে কি খাওয়াইব,—উহাকে কোথায় শোয়াইব,—উহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিব,—এই চিন্তাই পরম চিন্তা।" "বৈষ্ণবী মায়া, হরিদাস! এতদিন বিষ্ণুসেবা করিয়াও কি তাহা বুঝিলে না? গোপাল সেবক দিয়া ভক্ত উদ্ধার করিতেছেন। কন্যা ভক্তিমতী —তোমার উপযুক্তা কন্যা হইবে। চিন্তা করিও না হরিদাস, গোপাল ছলনা করিতেছেন।" "ঠাকুর, তোমার মত মনের জোর আমার ত নাই,—আমি যে দীনহীন বৈষ্ণব?" "তোমার শক্তি নাই! হরিদাস, সোণার গাঁয়ের মহামারীর বৎসর,— মনে হয়?"

বৃদ্ধ লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন সতী ত্রিবিক্রমকে কহিল, "আর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাজ নাই,—ছেলেকে

লইয়া ঘরে যাই।" হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কি—" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।" হরিদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রী! এ আবার কি ছলনা ঠাকুর! আপনার স্ত্রী!" "চক্রীর চক্রান্ত কে ভেদ করিতে পারে হরিদাস?" "ঠাকুর, আবার সংসার?" "মহামায়ার আদেশ, —নিয়তি কাহার বাধ্য?"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীর অনুসরণ করিল। ত্রিবিক্রম মন্দির ত্যাগ করিয়া সর্ব্বেশ্বর মিত্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে হরিনারায়ণ মন্ত্রপাঠ করাইতেছেন, অসীম আবৃত্তি করিতেছে। সহসা হরিনারায়ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,—সুদর্শন ও দুর্গা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বিশ্বনাথ আকস্মিক বিপত্তির কারণ বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। অসীমের হস্তে পিণ্ড অর্দ্ধপথে রহিয়া গেল, হরিনারায়ণের হস্ত হইতে তালপত্রের পুঁথি ভূমিতে পড়িয়া গেল, সুদর্শনের মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইল। সেই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত ধারণ করিয়া সতী পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের পশ্চাতে বৈষ্ণবের তরুণী কন্যাও অঙ্গনে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে মনের অজ্ঞাতসারে অসীম ডাকিলেন, "মণিয়া!"

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

দূত প্রেরণ

মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণ রায় একখানা বৃহৎ পালঙ্কের এককোণে আত্মহারা হইয়া যুগপৎ ধূমপান ও নিদ্রাসুখ লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা গুরুকায়া গৃহিণীর গুরুভার-বাহক পদদ্বয়ের শব্দে তাঁহার নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হইল। গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, ঘুমাইলে নাকি?" হরনারায়ণ কহিলেন, "কেন?" "আর একটা নূতন খবর; সরস্বতী ফিরিয়াছে।" "আর নবীন?" "তাহার কোন সংবাদ নাই।" "বলে কি?" "অনেক রকমই বলে—কতটা সাচ্চা, কতটা ঝুটা, জহুরী ভিন্ন চিনিবার উপায় নাই। ডাকিয়া আনিব নাকি?"

হরনারায়ণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সরস্বতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং নানাছন্দে বিনাইয়া নবীনের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা জানাইল। নবীন যে কোথায় গেল, এবং দুর্গা ঠাকুরাণী কোথায় গেলেন, সে সংবাদ সে দিতে পারিল না। তখন হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরস্বতী, নূতন খবর শুনিয়াছ?" সরস্বতী অতি বিনীত ভাবে কহিল, "না হুজুর এই মাত্র দেশে আসিয়াছি।" "তোমাদের ছোটরায়ের যে বিবাহ; বরকর্ত্তা ভটচায—তোমাদের বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর।" সরস্বতী কহিল, "বটে?" ধূর্ত্তা বৈষ্ণবী নিজের অভিমত ব্যক্ত করিল না।

দেখিয়া হরনারায়ণ স্বয়ং প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কহিলেন, "দেখ সরস্বতী, মেয়ে আর বৌ যদি এতদিন ডাকাতের হাতে থাকিত, তাহা হইলে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার যত বড়ই পণ্ডিত লোক হউক না কেন, নিশ্চিন্ত মনে সুতীর মোহনায় বসিয়া অসীমের বিবাহের ব্যবস্থা করিতে পারিত না। যেমন করিয়া হউক দুর্গা আর সুদর্শনের বৌ নবীনের হাতছাড়া হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে। আর না হয় নবীন টাকা খাইয়া তাহাদের সঙ্গে ভিড়িয়াছে। সরস্বতী, তুমি একবার সংবাদটা আনিতে পার?" সরস্বতী বৈষ্ণবী জীবন-সংগ্রামে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দূরদর্শিনী হইয়াছিল; সে হরনারায়ণের প্রশ্নে বহুদূর হইতে টাকার গন্ধ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া গেল। সে কহিল "হুজুর, বড় কষ্টের পথ, আমরা দুঃখী মানুষ, তাই সহ্য করিতে পারি। আর যে রকম দেশকাল পড়িয়াছে, খরচে কুলায় না।" রাজনীতিজ্ঞ হরনারায়ণ বুঝিলেন যে সরস্বতী অর্থের কথা বলিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সেজন্য চিন্তা করিও না বৈষ্ণবী, খরচপত্র যাহা লাগে, সমস্তই আমার; আর ঠিক খবর আনিবার বকৃশিশ নগদ এক শত টাকা।" টাকার কথা শুনিয়া সরস্বতীর প্রেমশূন্য শুষ্ক হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিগলিত হইল। সে কহিল, "হুজুরের হুকুম কি ঠেলিতে পারি? কবে যাইতে হইবে?" "আজিকার দিনটা কাটাইয়া কাল সকালে একখানা ছোট পানসী লইয়া রওনা হইবে। গহনার নৌকায় গেলে অনেকদিন লাগিবে।" সরস্বতী হুকুম

পাইয়া উঠিল। গৃহিণী টাকা দিবার জন্ম তাহার সহিত কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

কক্ষের বাহিরে আসিয়া গৃহিণী বৈষ্ণবীকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা পদভরে কম্পিত করিয়া রায়-গৃহিণী দুই তিনটা বড় দালান পার হইয়া গেলেন; সরস্বতীও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গৃহিণী অবশেষে অট্টালিকার আর এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। বৈষ্ণবী তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়াই ইতস্ততঃ করিতেছিল, কারণ গৃহিণীর কলেবর সে ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে আর একজন মনুষ্যের স্থান সঙ্কুলান হইবে কি না, সরস্বতী তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। গৃহিণী আদেশ করিলে সরস্বতী গৃহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। সে প্রবেশ করিলে গৃহিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। হরনারায়ণের পত্নী তাঁহার জগুবৎ দক্ষিণ হস্তখানি ক্ষুদ্রকায়া বৈষ্ণবীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কহিলেন, "দেখ্ বৈষ্ণবী দিদি, আমার একটা উপকার করিবি?" সরস্বতী রায়-গৃহিণীর হস্তের গুরুভার এবং বিনয়ে, যথোচিত অবনত হইয়া কহিল, "সে কি মা, উপকার করিব কি মা, আমি আপনার নিমকের চাকর, আপনার খাইয়া মানুষ—" রায়-গৃহিণী বাক্-যুদ্ধে নূতন নহেন; তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ্ সরস্বতী, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি করিয়া আসিতে পারিস, তাহা হইলে আমার এই গলার হার তোর গলায় ঝুলাইয়া দিব।"

গজ শৃঙ্খলবৎ পুষ্ট হার দেখিয়া দরিদ্রা বৈষ্ণবীর মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কেন পারিব না মা, নিশ্চয়ই পারিব; যদি মানুষের সাধ্য হয়, তাহা হইলে সরস্বতী নিশ্চয় আপনার হুকুম তামিল করিয়া আসিবে।" গৃহিণী তুষ্টা হইয়া হাসিলেন, সরস্বতী সশরীরে স্বর্গে গেল। তখন গৃহিণী কহিলেন, "দেখ্, ছোট রায় দেবর বটে, কিন্তু চিরদিন সতীনের মত ব্যবহার করিয়া গেছে। যতদিন ছিল, ততদিন এমন দিন যায় নাই যেদিন আমায় চোখের জল ফেলিতে হয় নাই। বাপের বাড়ীর খোঁটা বড় বেশী বাজে সরস্বতী, সুতরাং সে কথা আর ভাবিতে পারিতেছি না। এইবার ছোট রায় বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে জব্দ করিবার উপায় হইয়াছে। নূতন বৌ মানুষ কেমন? তাহার মতি-গতি বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন? বুঝিয়া দুর্গার কাহিনীটা যদি তাহার নিকট লাগাইয়া আসিতে পারিস, তাহা হইলে যদি কোন দিন হাড়ের জ্বালা মিটে! কেমন করিয়া লাগাইবি, সে ভার তোর। যদি পারিস, তাহা হইলে আমাকে যেমন চিরদিন বেড়া আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছে, তেমনই বেড়া আগুন জ্বালিয়া দিয়া আসিবি বুঝিলি সরস্বতী? এমন আগুন জ্বালিয়া আসিবি, তাহা যেন চিতার আগুনে না মিশিলে না নিবিয়া যায়। বুঝিলি ত?" সরস্বতী কহিল, "যতদূর সাধ্য করিব মা। তবে সে ত বিয়ের কনে, সে কি এত কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিবে?" "একদিনে না পারে, ছমাস-ছমাসে ত পারিবে; না হয় আর একবার যাইবি, তখন তার পথ-খরচ আমি

দিব।” গৃহিণী তখন বাক্স খুলিয়া সরস্বতীকে পথ-খরচ বাবদ এক এক করিয়া পঞ্চাশ টাকা গণিয়া দিলেন; সরস্বতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পথে আসিতে আসিতে সরস্বতী ভাবিতে লাগিল যে হরনারায়ণ রায় সহসা এত মুক্তহস্ত হইলেন কেন; নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনও গূঢ় তত্ত্ব আছে। তাহা না হইলে ধনহীন ক্ষমতা-শূন্য ভ্রাতার সন্ধানের জন্য হরনারায়ণ রাশি রাশি অর্থব্যয় করিবেন কেন? তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈষ্ণবী বুঝিল যে, ক্ষমতাশালী হরনারায়ণকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে তাহাকে আর ভবিষ্যতে অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। সহসা তাহার স্মরণ হইল যে হরনারায়ণ নবীনকে সন্দেহ করিয়াছেন; এই সন্দেহটা যদি সে কোন গতিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে ধূর্ত্ত নবীন নাপিত আর কখনও তাহার লাভের অংশ লইতে পারিবে না। মুরশিদাবাদে ফিরিবার পূর্ব্বে নবীনের উপরে সরস্বতীর ক্রোধ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল; কারণ তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, যে লাভের ন্যায্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য নবীন শিকার লইয়া পাটনা হইতে মুরশিদাবাদ পলাইয়াছে। সে যখন দেশে ফিরিয়া শুনিল যে, নবীন তখনও ফিরে নাই, তখন তাহার সন্দেহ দূর হইল বটে, কিন্তু ক্রোধ গেল না। সরস্বতী দীর্ঘ প্রবাস হইতে ফিরিয়া গৃহ-মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে হরিনারায়ণ স্নানার্থ ভাগীরথীর দীর্ঘ শুষ্ক

বেলা পার হইয়া জলে প্রবেশ করিতেছিলেন। একখানা বৃহৎ গহনার নৌকা সেই সময়ে তীরে লাগিল। তাহাতে একজন আরোহী বসিয়া ছিল। সে হরিনারায়ণকে দেখিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। হরিনারায়ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অপরাপর আরোহী নৌকা হইতে নামিয়া গ্রামে গেল, কিন্তু সে ব্যক্তি নামিল না; অসুস্থতার ভাণ করিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিল। হরিনারায়ণ স্নানান্তে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিলে সে দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার

"ও কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া দুর্গা ও বড়বধূ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কোন উত্তর না পাইয়া নববধূ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে, ও অমন করিয়া চাহিয়া থাকে কেন?" চমক ভাঙ্গিয়া দুর্গা ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিলেন; সে চাহনি কিন্তু নববধূর নিকট গোপন রহিল না। তখন দুর্গা জিজ্ঞাসা করিলেন; "ও কেমন করিয়া চায়, ভাই, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব; ও কাহার দিকে চায়?" শৈল কহিল, "কেন, ওঁর দিকে! তোমরা যেন কিছু জান না? মাগী যেন হাঁ করিয়া গিলিতে

আসে ; আমি সব বুঝিতে পারি গো, সব বুঝিতে পারি।" শেষের কথা শুনিয়া দুর্গা হাসিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া বধূ কহিলেন, "হাসিস কেন ভাই, ওর গায়ে জ্বালা ধরিয়াছে, তাই বলিতেছে।" এই সময়ে শৈল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী আর কত দিন থাকিবে? দাঁড়াও, আমি বাবাকে বলিয়া উহাকে এখনই বিদায় করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে ক্রোধভরে অলঙ্কারের ঝঙ্কার দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তখন দুর্গা হাসিতে হাসিতে গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বড়বধূ বহুকষ্টে হাসি দমন করিয়া কহিলেন, "হাসিস না ভাই, হয়ত এখনই ফিরিয়া আসিবে।" দুর্গা কহিলেন, "আসুক, আমি আর হাসি চাপিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দাদার হইল ভাল!" "ঠাকুরপোর উপযুক্ত গুরুমহাশয় জুটিয়াছে। এখন হইতেই এত শাসন। আমি ত বিবাহের পরে দুই তিন বৎসর অপর লোকের কাছে স্বামীর নাম মুখে আনিতে পারি নাই।" "তুমি আসিয়াছিলে কত বড়টি, আর শৈলর যে বুড়া বয়সে বিবাহ হইল?" "হউক ভাই, এখন হইতে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

এই সময়ে দূরে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া উভয়ে অন্য কথা পাড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া কহিল, "মা ঠাকরুণ, কত্তা ডাকচেন।" বধূ ও ননন্দা সদরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলেন যে, হরিনারায়ণ এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন; বুড়া বৈষ্ণব তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে।

হরিনারায়ণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন ; "মা, বিষম বিপদে পড়িয়া তোমাদের ডাকিয়াছি। মণিয়া কোনমতে এস্থান হইতে যাইতে চাহে না। বাবাজী দেশে ফিরিতে চাহে, কিন্তু মণিয়া তাহার সহিত যাইতে রাজী নয়। আমি তাহাকে লোকজন দিয়া পাটনায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সে দেশেও ফিরিতে চাহে না।" পিতার কথা শুনিয়া দুর্গা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, আমরাও মণিয়াকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি।" বধূ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন ; তাহা লক্ষ্য না করিয়া হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদ মা ?" "নূতন বৌ বলে যে মণিয়া নাকি দিনরাত্রি দাদার দিকে চাহিয়া থাকে। সে তাহার বাপের কাছে নালিস করিতে গিয়াছে।" দুর্গার কথা শুনিয়া হরিনারায়ণ ঈষৎ হাসিলেন এবং কহিলেন, "দেখ মা, এই বিষয়ে তোমাদের একটু সাহায্যের প্রয়োজন, মণিয়াকে কোনমতে এখান হইতে সরাইতে হইবে।" দুর্গা কহিলেন, "বাবা, মণিয়া কোন্ সময়ে কি মেজাজে থাকে, তাহা বলা যায় না। যখন তাহার মেজাজ ভাল থাকে, তখন বুঝাইয়া বলিলে হয়ত আমার কথা শুনিতে পারে ; কিন্তু অন্য সময়ে তাহাকে রাজী করা আমার সাধ্যাতীত। তবে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

দুর্গা ও বড়বধূ উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে ত্রিবিক্রম আসিয়া হরিনারায়ণকে কহিলেন, "দেখ হরি, তুমি যে কাগজপত্রগুলার কথা কহিতেছিলে, সেগুলা একবার দেখিলে ভাল হয় না ? রায়জীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; এখন সে বাদশাহের নিকট

যাইতে চাহে, আর তাহাকে সত্বর যাইতেও হইবে। আমি মনে করিতেছি যে, তোমাকে লইয়া মুরশিদাবাদে যাইব।” হরিনারায়ণ কহিলেন, “কাগজপত্র সঙ্গেই আছে, এখনই আনিতেছি; কিন্তু আমরা যদি মুরশিদাবাদে যাই, তাহা হইলে দুর্গা আর বৌমাকে কোথায় রাখিয়া যাইব?” পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, “তাহারা ত এইখানেই থাকিবে।” হরিনারায়ণ ফিরিয়া দেখিলেন সতী দাঁড়াইয়া আছে। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কখন আসিলে?” “এইমাত্র। একবার ঘাটে গিয়াছিলাম, পথে শুনিলাম একজন লোক নাকি আমাদের সকলের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। লোকটাকেও দেখিয়া আসিলাম, সে তিনু ময়রার দোকানে বাসা লইয়াছে।” ত্রিবিক্রম কহিলেন, “বটে! হরি, তুমি কাগজপত্র বাহির কর, আমি একবার ঘুরিয়া আসি। সতী, তুমি আমার সঙ্গে এস।”

পতি-পত্নী পথে বাহির হইলে স্বামীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনশূন্যা সতীকে দেখিয়া গ্রামের লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল; সতী তাহা শুনিয়াও শুনিল না। গ্রাম-সীমায় আসিয়া সতী কহিল, “আমাকে সে ডাকিতেছে।” ত্রিবিক্রম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ডাকিতেছে সতী?” “যে ডাকে, যে কথা কহে; তাহাকে ত কোনদিন দেখি নাই?” “সে তোমাকে কোথায় ডাকিতেছে?” “ঐ শ্মশানের দিকে।” “চল, আমিও আসিতেছি।” উভয়ে বিটপিচ্ছায়াচ্ছন্ন নদীতীর অবলম্বন করিয়া শ্মশানে পৌঁছিলেন। তীরে একটা অতি প্রাচীন তিন্তিড়ীবৃক্ষ

ঝড়ের দিন গঙ্গালাভ করিয়াছিল, তাহার বৃহৎ কাণ্ডটা উচ্চ তীর হইতে নদীগর্ভে সিক্ত সৈকত পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত সেতুর মত পড়িয়া ছিল। ত্রিবিক্রম সেই স্থানে পৌছিলে বৃক্ষশাখায় শৃগালের রব শ্রুত হইল। শুনিবামাত্র ত্রিবিক্রম স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন নিকটস্থ একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একজন মনুষ্য ভূমিতে পতিত হইয়া উভয়কে অভিবাদন করিল।

দূর হইতে আর একজন মনুষ্য পতি-পত্নীর অনুসরণ করিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সে এই নবাগত ব্যক্তিকে বৃক্ষ হইতে পড়িতে দেখিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সে শব্দ শুনিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন। নবাগত ব্যক্তি কালীপ্রসাদ। সে একটা বৃহৎ রূপার বাক্স সতীর হস্তে দিয়া কহিল, "মা, মা তোমাকে দিয়াছেন, তুমি পরিও।" সতী বিস্মিতা হইয়া পেটীকা খুলিয়া দেখিল, তাহা রজতনির্ম্মিত হীরক ও মুক্তাখচিত অলঙ্কার-পূর্ণ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়দেশে গৃহস্থের কন্যা সে জাতীয় অলঙ্কার কখন দেখিতেও পাইত না। সতী গৃহস্থের কন্যা; রত্নালঙ্কারের চাকচিক্যে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলি আমি কি করিব?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কেন, পরিবে।" "লোকে নিন্দা করিবে যে?" "কেন নিন্দা করিবে, আমি দিয়াছি, তুমি পরিবে, ইহাতে দোষ কি?" "আমাদের গ্রামে এ রকম অলঙ্কার কাহারও নাই।" "সতী, আমরা যেখানে যাইব, সেখানে তোমার মত স্ত্রীলোক সকলেই এই অলঙ্কার পরে।" স্বামী

কহিলেন, কাজেই ভক্তিমতী পত্নী তাহা আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

তখন সতীর হুঁস হইল, যে অলঙ্কার আনিয়াছে সে ত নাই! তখন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "যে আনিল সে কোথায় গেল?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "সে ভৃত্য, কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, আবশ্যক হইলে আবার তাহার সাক্ষাৎ পাইবে। চল, ফিরিয়া যাই।" যে ব্যক্তি কালীপ্রসাদকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সে যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে গিয়া ত্রিবিক্রম সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী, এই কি আমাদের সন্ধান লইতেছিল?" সতী কহিল, "হাঁ।" "তুমি গ্রামে ফিরিয়া যাও, আমি পরে আসিব।" সতী পরম নিশ্চিন্ত মনে বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শিয়রে একটা বৃক্ষকাণ্ডের উপরে ত্রিবিক্রম উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং ত্রিবিক্রমকে দেখিয়া সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ত্রিবিক্রম হাসিলেন।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

মণিয়ার বিদায়

"মণিয়া।" "হুজুর?" "আমাকে হুজুর বলিয়া ডাকিতেছ

কেন?" "জনাব, আপনি আমীর, খোদা আপনাকে বুলন্দ করিয়াছেন। আমি গরীব, পেটের দায়ে মজুরী করিয়া খাই, আমি আপনাকে হুজুর বলিব না ত কে বলিবে?"

গ্রামসীমায় একটা অশ্বত্থ বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া সুদীর্ঘকাল আধিপত্য করিতেছিল। তাহার নিম্নে মুসলমানদিগের অনেকগুলা কবর ছিল; অশ্বত্থের অনুগ্রহে বাকীগুলা বৃক্ষকবলিত হইয়া, মাত্র একটা তখনও বিদ্যমান ছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অসীম ও সুদর্শন তাহার উপর বসিয়া ছিলেন। কবরের নিম্নে গৈরিক-বসনা মণিয়া শ্যামল শষ্প-শয্যায় আসন গ্রহণ করিয়াছিল।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঈজী, তুমি এদিকে আসিলে কেন?" মণিয়া হাসিয়া কহিল, "দোহাই ধর্ম্মের ওস্তাদ, কস্‌বীর যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মের দোহাই; বেশ্যার যদি ঈশ্বরের নাম-গ্রহণের অধিকার থাকে, তাহা হইলে হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের খোদার দোহাই, আমি ইচ্ছা করিয়া জানিয়া এ পথে আসি নাই।" অসীম কহিলেন, "মণিয়া, দাদা হয়ত তোমার কথা অবিশ্বাস করিতেছে, কিন্তু আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই।"

মণিয়া। জনাবের আমার উপর চিরদিন মেহেরবাণী।

অসীম। আবার জনাব?

ম। ব্যক্তিগত অবস্থার পার্থক্য কি ভুলিতে আছে জনাব?

সুদর্শন। দেখ বাঈজী, কথাটা বলিতে আমার বড়ই

সঙ্কোচ হইতেছে; তুমি এখন এখানে আসিয়া আমাকে—না, কৰ্ত্তাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছ।

ম। ওস্তাদ, সত্যকথা বলিতে কি, আমি তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি।

স্থ। ওরে ছোট রায়, বেটী বলে কি! আবার যে সুর ধরিয়াছে?

অ। দাদা, তুমি থাম। মণিয়া তোমাকে নাচাইতেছে, আর তুমি নাচিতেছ। ভয় নাই, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। মণিয়া?

ম। হুজুর?

অ। আবার?

ম। এমন গোস্তাকী কি আমি করিতে পারি হুজুর?

অ। ভাল, তোমার যাহা ইচ্ছা বল।

ম। হুকুম করুন।

অ। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

ম। যেদিকে দু'চোখ যায়।

অ। কাহার সঙ্গে যাইবে?

ম। এই আস্‌মান, তারা, চাঁদ, গাছপালা, চিড়িয়া। আমার মত অবস্থার লোকের সঙ্গীর অভাব কি জনাব?

অ। মণিয়া, তুমি যুবতী, অসামান্যা রূপসী, এই ঘোর দুর্দ্দিনে সঙ্গিহীনা অবস্থায় তোমার কি একা চলা উচিত?

ম। হুজুর, অলঙ্কার পোষাক খুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু রূপ

ত মুখোসের মত খুলিয়া ফেলা যায় না। দুনিয়ার হাওয়ার সঙ্গে মনের হাওয়াও বদ্‌লাইয়া যায়; কিন্তু চেহারা যিনি দিয়াছেন, তিনি না বদ্‌লাইলে আর কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে সে কথা বলিতেছি?

ম। হুজুর, হুকুমে সব হয়, কিন্তু মন বশ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বাদশাহের বেগম গোলামের দিকে নজর করিত না।

অ। মণিয়া, আমি কি তোমাকে হুকুম করিতেছি?

ম। হুজুর, সকল সময়ে জবান দুরস্ত থাকে না। তুমি আমাকে জিহ্বাটা বশে রাখিতে দিবে না। মানুষের মন উড়া পাখীর মত, তাহাকে ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। যে মন ধরিতে যায়, তাহার উপরদিকে নজর থাকে বলিয়া কত বিপদে পড়ে। জলে পড়ে, গর্ত্তে পড়ে, হোঁচট খায়, কারণ সে ত নিজে পথ দেখিয়া চলে না, উড়া পাখীর পিছন পিছন ধাওয়া করে।

অ। তোমার সহিত কথায় পারিয়া উঠিব না। মণিয়া আমি মিনতি করি, তুমি ফিরিয়া যাও।

ম। জনাবের বেগম বাঁদীর উপর নারাজ হইয়াছেন এ কথা বাঁদীর কাণে পৌঁছিয়াছে। খোদাবন্দ, বন্দা-নওয়াজ, আমরা কসবী জাতি, মজুরী করিয়া খাই, আমরা কি কখনও উঁচু নজর করিতে পারি? হুজুর হুকুম করিতেছেন, অবশ্য ফিরিয়া যাইব—তবে কোথায় ফিরিয়া যাইব, তাহা বলিতে পারি না।

অ। সে কি কথা মণিয়া, আমার ফিরিয়া যাও বলার অর্থ, পিতার নিকট ফিরিয়া যাও।

ম। বলিয়াছি ত জনাব, মন উড়া-পাখী, বেগম সাহেবা বাঁদীর উপর নারাজ হইয়াছেন, বাঁদী বুলন্দ্ আখ্‌তরের নজরের অন্তরে যাইতেছে।

অ। মণিয়া, আবার বলি তুমি পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। যো হুকুম খোদাবন্দ!

অ। রহস্য রাখ।

ম। তোবা তোবা, জনাবের সহিত রহস্য করিব?

অ। মণিয়া, আমি মিনতি করি, তুমি পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। সে কি কথা মেহেরবান্, মোগলের রাজ্যে আমীর কি কখনও পথের কুকুরের নিকট মিনতি করে? পাটনার পথে আমীর চলিয়া যায়, দীন, অনাথ ভিখারী কুকুরের স্থায় পদাঘাত লাভ করিয়া পলায়ন করে। দুঃখী-দরিদ্র যখন অন্নের অভাবে হাহাকার করে, তখন আমীরের ঘরে মদিরা ও সঙ্গীতের স্রোতে আনন্দ বহিয়া যায়। জনাব, তুমি সেই আমীর, আর আমি সেই ভিখারী। আমার নিকট মিনতি করা কি তোমার সাজে জনাব? তুমি হুকুম করিয়াছ, আমি তামিল করিবার চেষ্টা করিব।

সহসা অসীমের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। মণিয়া তাহা দেখিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল এবং উভয় হস্তে অসীমের

পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদিতেছ! আমার দুনিয়ার দৌলৎ, তুমি কাঁদিতেছ কেন! তোমার কিসের দুঃখ বল? তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। আমি এখনই পাটনায় ফিরিয়া যাইতেছি। তুমি কাঁদিও না; তুমি চোখের জল মুছিয়া একবার হাস, আমি তোমার হাসি-মুখ দেখিয়া চলিয়া যাই।"

অসীম চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "মণিয়া, তুমি যাইতে চাহিতেছিলে না বলিয়া আমার চোখে জল আসে নাই। তুমি কি ছিলে, কি অবস্থায় ছিলে, আর আমার দোষে কি হইয়াছ, তাহাই ভাবিয়া চোখে জল আসিয়াছিল।" মণিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসীমের নিকট হইতে দূরে গিয়া কহিল, "মনে করিও না যে, তোমার জন্য আমার অবস্থা হীন হইয়াছে, আমি আজ তোমার জন্য কত উচ্চ, তা কি তুমি জান? দিলের, তুমি ভাবিতেছ আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি—শাটিন মখমলের পেশোয়াজ না পরিয়া, হীরা মুক্তার অলঙ্কার না পরিয়া, এই গেরুয়া কাপড় পরিয়া বেড়াইতেছি বলিয়া মনে করিও না যে, মণিয়া ছোট হইয়াছে। লোকের চোখে এ বেশ হীন দেখাইতে পারে; কিন্তু তুমি জান না দিলের, এ বেশে আমি আমার কাছে কত উচ্চ। এখন আমি আমার। এখন পথের কুকুরের মত ডাকিলেই আমাকে লোকের কাছে যাইতে হয় না। যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করি, অর্থের জন্য তাহার সঙ্গে হাসিমুখে কথা কহিতে হয় না;—সে যে কত বড় সুখ, কত উচ্চতা, তাহা

বেশ্যা ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। জনাব, মণিয়া তওয়াইফ চলিল। তুমি আমীর হইয়া, বাদশাহের প্রিয় হইয়া এই দুনিয়ার বন্ধুর পথে অক্ষত চরণে চলিয়া যাইও। বেশ্যাকন্যা বেশ্যার ছায়া কখনও দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করিয়া তোমার ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শ করিবে না।"

সহসা সেই তরুচ্ছায়াশীতল গ্রাম-সীমা মুখরিত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "ছি মা, এই কি তোমার সংযম?" সকলে ফিরিয়া দেখিলেন কবরের অদূরে হরিনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

নবীনের শাস্তি

"নবীন, তোমার চেতনা ফিরিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; সুতরাং চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।" নবীন তৎক্ষণাৎ অতি বিনীত, শান্ত, শিষ্ট ভক্তের ন্যায় উঠিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, করযোড়ে দাঁড়াইল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবীন, আজি আবার আমার পিছু লইয়াছিলে কেন?" নবীন উত্তর দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠতালু ও জিহ্বা সে উত্তর উচ্চারণ করিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "পরামাণিক, বস,—অত ভয়

পাইতেছ কেন? আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।" সাহস পাইয়া নবীন অর্দ্ধস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন ত্রিবিক্রম কহিলেন, "অলঙ্কারের লোভে আসিয়াছিলে;—তুমি জান যে, তোমার মত শত-সহস্র নবীন আসিলেও আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না?" নবীন ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না—না।" "তবে কি জন্য আমার পিছু লইয়াছ?" নবীন নিরুত্তর। তাহা দেখিয়া ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "পরামাণিক, মনে করিয়াছ, চুপ করিয়া থাকিলে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে?" নবীন দাসের দুষ্ট বুদ্ধি তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে ভাবিতেছিল যে, দিনের বেলায় কখনই জলে আগুন লাগিবে না। আর যদিই বা লাগে, কবুল জবানবন্দি পরে দিব। যতক্ষণ বেগতিক না দেখি ততক্ষণ চুপ করিয়াই থাকি। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "মনে করিয়াছ দিনের বেলা, কেমন? ঐ দেখ জল বাড়িয়া উঠিল।"

দেখিতে-দেখিতে নবীন শুষ্ক ভূমিতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল, নদীর জল সহসা ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তখন ত্রিবিক্রম কহিলেন, "ঐ দেখ, একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর।" বলিবামাত্র নবীন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কারণ, সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ত্রিবিক্রমের পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড কুম্ভীর তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভয়বিহ্বল নবীন দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

যখন তাহার দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল যে, সে প্রথমবারে যে শুষ্ক ভূমিতে পড়িয়া ছিল, এখনও সেইখানেই পড়িয়া আছে; আর দূরে ত্রিবিক্রম শুষ্ক কাণ্ডের উপরে বসিয়া আছেন। তাহাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কি নবীন, কেমন আছ?" নবীন দুইবার আছাড় খাইয়া শরীরে ব্যথা পাইয়াছিল; সে ধীরে-ধীরে উঠিয়া ত্রিবিক্রমের উভয় পদ জড়াইয়া ধরিল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইবার বিশ্বাস হইয়াছে?" নবীন অতি বিনীত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে।" "সকল কথা কবুল করিবে?" "আজ্ঞে, নিশ্চয় করিব। প্রাণের তুল্য পদার্থ নাই। এখন ঠাকুর রাখিলে বাঁচি, মারিলে মরি।" "তুমি কে?" "আমি সুবার কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের গোয়েন্দা।" "আমার পিছু লইয়াছ কেন?" "আপনার পিছু লই নাই,—আপনার সহিত যে স্ত্রীলোকটি ছিলেন, তাঁহার পিছু লইয়াছিলাম।" "কেন, সে কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছে?" "না। তবে তাঁহাকে কাল হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের সহিত একত্র দেখিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিকট বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের সংবাদ পাইব।" "তুমি কি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের সংবাদ চাহ?" "কানুনগোই তাঁহারই সন্ধানে আমাকে মুরশিদাবাদ হইতে কাশী পাঠাইয়াছিলেন।" "কেন?" "হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার কানুনগোই এর বিষম শত্রু। তাঁহাকে জব্দ করিতে না পারিলে, হরনারায়ণ রায়ের

বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।” “তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে হরিনারায়ণ এই গ্রামে আছেন?” “তিনি গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন,—আমি নৌকা হইতে তাঁহাকে দেখিয়া নামিয়া পড়িয়াছি” “এখন কি করিবে?” “ঠাকুর যাহা হুকুম করিবেন!” “আর আমি যদি কোন হুকুম না করি?” “তাহা হইলে যেমন করিয়া পারি, কানুনগোইএর ছোট ভাই অসীম রায় মহাশয়কে বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের কাছ-ছাড়া করিব।” “তাহার পর?” “যেমন করিয়া পারি, বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরকে দূরে সরাইয়া দিব।” “যদি সে না সরিতে চাহে?” “জোর করিব।” “তাহার সহিত কি জোরে পারিবে?” “ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারি। কানুনগোইএর হুকুম আছে যে, আবশ্যক হইলে—” “ব্রহ্মহত্যা করিবে?” “তাহাতেও আপত্তি নাই।” ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, “নবীন, হরনারায়ণ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে ঢাকায় হরনারায়ণ রায়, হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার আর আমি একত্র খেলিয়া বেড়াইয়াছি। কানুন-গোই হইয়া হরনারায়ণের তাহা হইলে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে! দেখ নবীন, তুমি যখন আমার হাতে পড়িয়াছ, তখন তুমি হরি-নারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি মুরশিদাবাদে ফিরিয়া যাও। হরনারায়ণকে আমি একখানা পত্র দিতেছি,—তাহা দিলেই তোমার সমস্ত দোষ মাফ্ হইয়া যাইবে। তুমি এখনই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাও,—এখানে থাকিলে দুই দণ্ডের মধ্যে পাগল

হইয়া যাইবে। এখন আমার সহিত এস,—আমি পত্র দিতেছি, তাহা লইয়া এখনই যাত্রা কর।”

ত্রিবিক্রম ও নবীন গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে নবীনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দূর হইতে দুর্গা ও বড়বধূ শিহরিয়া উঠিলেন। হরিনারায়ণ তখনও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি নবীনকে দেখিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু ত্রিবিক্রমের ইঙ্গিতানুসারে পুনরায় উপবেশন করিলেন। ত্রিবিক্রম কাগজ কলম লইয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিলেন, এবং তাহা মোহর করিয়া নবীনের হস্তে দিলেন। নবীন প্রণাম করিয়া উঠিল। ত্রিবিক্রম বিদ্যালঙ্কারকে কহিলেন, “ওহে হরি, হরকে জানাইলাম যে, আমি আবার সংসারী হইয়াছি; এবং সত্বর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।” হরিনারায়ণ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

ত্রিবিক্রম চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অসীম সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব দূরে সরিয়া গেল। এমন সময়ে অসীমের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিনারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তিনি আসিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, “বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, মেয়েটা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির করিতেছে; আপনি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা না করিলে, আমাকে ত আর ঘরে তিষ্ঠিতে দেয় না। সে বলে ঐ বৈষ্ণবের সঙ্গে কে একটা রূপসী মেয়ে আসিয়াছে,—সে না কি

দিন রাত্রি হাঁ করিয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া থাকে; বাবাজীরও না কি ভাবগতিক ভাল নহে।” হরিনারায়ণ বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলেন, “সত্য না কি? তবে কি জানেন মিত্র মহাশয়, অসীম তেমন পাত্র নয়। কিন্তু আপনার কন্যা যদি কাতর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে দু’কথা বলিতে হইবে। দেখুন, এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের পরামর্শে চলা উচিত নহে। আপনি যদি নূতন বধূমাতাকে দুই-এক দিন স্থির করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অসীমের নিকট কোন কথা না বলিয়া মাগীটাকে সরাইয়া দিতেছি।” মিত্রজা কহিলেন, “দেখুন, বাবাজীবন এক প্রকার দয়া করিয়া আমার জাতিরক্ষা করিয়াছে। মাত্র দুই তিন দিন বিবাহ হইয়াছে,—ইহার মধ্যে কোন কথা বলিতে আমার ভরসা হয় না। তবে কি জানেন,—শৈল আমার নয়নের মণি, আমাদের একমাত্র সন্তান। তাহার চোখে জল দেখিলে, বড়ই অস্থির হইয়া পড়ি।” “তা বটেই ত, তা বটেই ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিত্রজা মহাশয়,—আমি যেমন করিয়া পারি, মাগীটাকে বিদায় করিয়া দিতেছি।” মিত্রজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। ত্রিবিক্রম এতক্ষণ একমনে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তিনি মাথা তুলিয়া কহিলেন, “হরি, বৃথা চেষ্টা! এই নববধূ সংসার যাত্রার প্রতিপদে স্বামীকে নাগপাশে বন্ধন করিবে। মণিয়া উপলক্ষ মাত্র,—তুমি কিছুই করিতে পারিবে না।” হরিনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “ইহাই যদি অদৃষ্টের লিখন, তাহা হইলে

আমি আর কি করিব? কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? তুমি কাগজপত্র দেখ, আমি আসিতেছি।"

ষট্ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

মণিয়া অসীমের পদদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া আসিল। অসীম ও সুদর্শন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন মণিয়া কহিল, "বাপজান, আমি আপনার উপদেশ ভুলি নাই,—সংযম ব্রত পরিত্যাগ করি নাই। এক মুহূর্ত্ত দেবতার চোখে জল দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। খোদার কসম বলিতেছি বাপজান, আমি ইচ্ছা করিয়া এ দেশে আসি নাই।" হরিনারায়ণ কহিলেন, "অসীম, তুমি কি কাঁদিতেছিলে?" অসীম কহিলেন, "স্পষ্ট কাঁদি নাই বটে, তবে মণিয়ার অবস্থা দেখিয়া চোখে জল আসিয়াছিল।"

হরিনারায়ণ। মা, এই সামান্য কারণে আত্মহারা হইলে তোমার ব্রত ত রক্ষা হইবে না! তোমার ব্রত অতি কঠিন। তুমি যদি সত্যই অসীম রায়কে দেবতার মত ভক্তি কর, তাহা হইলে চিত্ত আরও কঠিন করিতে হইবে।

মণিয়া। আরও কঠিন কেমন করিয়া করিব ?

হরি। দেখ মা, মানুষের মন মানুষ যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তাহা সেইরূপ আকার ধরিবে। তুমি যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে অসীমের চোখের জল কেন, একদিন অসীমকে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলেও, স্বচ্ছন্দে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।

ম। সে বড় কঠিন কাজ বাপজান।

হরি। কি করিবে মা! আমার ভগবান ও তোমার খোদা তোমার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডাইবার শক্তি কি মানুষের আছে? কেন যে বিধাতা জীবনের প্রথমে তোমার প্রতি এরূপ বিরূপ হইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? যিনি মানুষের অদৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনি আমাদের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন; আমার যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই বলিতেছি মাত্র। দেখ মা, যদি তোমার প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে তাহার ছায়াও স্পর্শ করিও না। তাহাকে যে পথে যাইতে দেখিবে, তাহার বিপরীত পথে যাইও। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দেখিও না, তাহার কথা কাণে তুলিও না, তাহার রূপ মনে আনিও না।

ম। বাপজান, সকল কাজ পারিব,—কেবল শেষেরটি পারিব না।

হরি। যদি চেষ্টা কর, ক্রমে পারিবে।

ম। তবে চেষ্টা করিব। এখন কি করিব বলুন?

হরি। প্রভাতে পাটনায় ফিরিয়া যাও।

ম। আমি এখনই চলিয়া যাইব মনে করিতেছিলাম।

হরি। সন্ধ্যা হইয়াছে না, এখন চলিয়া গেলে লোকে নানা কথা কহিবে। এখন গিয়া কাজ নাই,—আমি প্রভাতে তোমাকে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।

ম। পিতা যদি গৃহে স্থান না দেন, তাহা হইলে কি করিব?

হ। পাটনা সহরে তোমার স্থানের অভাব হইবে না।

ম। বাপজান, সে কথা কতদূর সত্য হইবে, তাহা বলিতে পারি না। পাটনা সহরে মণিয়া বাঈজীর স্থানের অভাব হইবে না বটে, কিন্তু ভিখারিণী মণিয়াকে কেহ স্থান দিবে কি না সন্দেহ।

হ। দেখ না, যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই জীবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরণে মতি থাকিলে, তোমার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। তুমি এখন গৃহে চল,—আমি তোমার পাটনা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

সকলে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিবিক্রম তখনও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ছিল। তিনি হরিনারায়ণকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হরি, অদৃষ্ট-চক্রের গতিরোধ করিতে পারিলে?" হরিনারায়ণ হাসিয়া কহিলেন, "এ আবার কি নূতন ফাঁকীর সৃষ্টি করিতেছ?"

"ফাঁকী আমার নহে, তোমার, ভট্টচায! অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতে কিছু হয় না। চক্রীর ইচ্ছা ভিন্ন চক্রের গতিরোধ হয় না। দেখ, এই গ্রামে তুমি যখন নৌকায় সম্পন্ন গৃহস্থের মত কাশী চলিয়াছিলে, তখন আমি অর্দ্ধনির্ব্বাপিত চিতাগ্নিতে কদর্য্য অন্ন পাক করিয়া দেহপাত করিয়াছি। আর সেই আমি—দেখ, দিব্য অঙ্গরাগ, বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া ঘোর সংসারী হইয়াছি,—এখনও বৎসর ফিরে নাই। তুমি কি মনে কর, আমি চেষ্টা করি নাই? ঝড় আসিতেছে, নৌকা ডুবিবে জানিয়াই নৌকায় উঠিয়াছি। ইচ্ছা ছিল মরিব; কিন্তু চক্রীর ইচ্ছা অন্যরূপ। তোমার চোখের সম্মুখে নৌকা ডুবিল; কিন্তু আমি ত মরিলাম না!" এই সময়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলিয়াছ বাবা; বৃন্দাবন ছাড়িয়া দেশে ফিরিলাম, মনে ভাবিলাম যে, সাধের গোপালটিকে উপযুক্ত হস্তে না দিয়া মরিতে পারিব না; কিন্তু গোপালের ইচ্ছা অন্যরূপ। দেশে ত ফিরিলাম না,—কেবল ভবচক্রে ঘুরিয়া মরিলাম।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবাজী, দেশে ফিরিবে না ত কোথায় যাইবে?" "দেশে আর ফিরি কৈ ঠাকুর! মন বলিতেছে, গোপালের ইচ্ছা—যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই যাইতে হইবে।" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "হরিদাস, বুড়া বয়সে মনের সুরটা অনেকটা গোপালের সঙ্গে মিলাইয়া আনিয়াছ দেখিতেছি!" বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ছি, ছি, অমন কথা মুখে আনিও না, ঠাকুর! আমি হীন, মহাপাপী, আমার

ক্ষমতা কি!" সহসা ত্রিবিক্রমের নেত্রে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "হরিদাস, তুমি ঠিক পথেই চলিয়াছ। আমি এত চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। কেন যে মহামায়া আমাকে আবার সংসারে ফিরাইয়া আনিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" "পারিবে বাবা, পারিবে—অধিক বিলম্ব নাই। মাতা পুত্রকে দিয়া ভক্তের সেবা করিতেছেন; তোমার মত সাধককে বিপথে চলিতে দিয়া মা কখনও কি স্থির থাকিতে পারেন?"

এই সময়ে হরিনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, তোমরা কি বলিতে আরম্ভ করিলে, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "এ যাত্রায় বোধ হয় আর বুঝিলে না।" বৈষ্ণব কহিল, "সে কি কথা ঠাকুর! সংসারের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া বাপ আমার যাহা বুঝিয়াছে, ইহাই চরম কথা। দুই-এক দিনের মধ্যে চোখের পরদা পড়িয়া যাইবে; তখন দেখিবে, বন্ধুতে বন্ধুতে অধিক প্রভেদ নাই।" হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন পরমার্থের কথা ছাড়িয়া, বিষয়ের কথা বল। কাগজপত্র দেখিলে?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "দেখিলাম,—সমস্তই ঠিক আছে।" "অসীম ও ভূপেন্দ্র সমস্ত বিষয়-আশয় হরের নামে লিখিয়া দিয়াছে।" "তাহাতে ক্ষতি নাই। দানপত্রে দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই,—সমস্তই দেবোত্তর; ইহারা তিন ভাই সেবাইৎ মাত্র। আমি ভাবিতেছি, দুই-এক দিনের মধ্যেই মুরশিদাবাদ যাত্রা করিব; অসীম ও সুদর্শন

স্থলপথে এলাহাবাদ যাইবে। হরিদাস চলিতে পারিবে না; সুতরাং তাহাকে নৌকায় যাইতে হইবে; আর আমরা মুরশিদাবাদ যাইব—কেমন কথা?" "উত্তম কথা।"

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

রূপের ঔষধ

হকিম শহীদ্-উল্লাহ খর্ব্বাকার মনুষ্য; তাঁহার যৌবন বহুদিন অতীত হইয়াছে। বাল্যে ও যৌবনে ভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ অতি বিরল হওয়ায় যৌবনান্তে অলক্ষ্মী তাঁহার মুখে একটা চিরস্থায়ী অপ্রসন্নতা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই বোধ হয় সুচিকিৎসক হইলেও যে রোগী একবার তাঁহাকে দেখিত, সে দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট আসিত না। হকিম শহীদ্-উল্লাহের আয় অতি সামান্য ছিল না। কারণ তিনি দিল্লীতে একজন প্রসিদ্ধ হকিমের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সে অভিমান তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আয় অল্প এবং ব্যয় অধিক, সুতরাং হকিম সাহেবের অতি কষ্টে দিন গুজরাণ হইত। লোকে বলিত, অর্থাগমের জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে নানাবিধ অসদুপায়ও অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

পাটনা তখন বড় সহর, সুতরাং নগরে হকিমের অভাব ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র; কাহারও সুচিকিৎসক সুখ্যাতি ছিল, কাহারও বা ছিল না। লোকে বলিত, অসদুপায়ে অর্থ-উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি থাকায় শহীদ্-উল্লাহ চিকিৎসা ব্যবসায়ে পটু হইয়াও যশোলাভ করিতে পারেন নাই। লোকের কথা সত্য হউক বা না হউক, যাহারা কোন কারণে প্রকাশ্যে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে পারিত না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হকিম্ শহীদ্-উল্লাহের নিকট আসিত। এই জন্য হকিম সাহেবের রোগীর সংখ্যা দিবস অপেক্ষা রাত্রিকালেই বৃদ্ধি পাইত।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। গৃহস্থের ঘরে এবং দোকানে বহু আলোক সত্ত্বেও পাটনা নগরীর রাজপথ অন্ধকার। হকিম সাহেবের রোগীরা তীব্র আলোকের পক্ষপাতী ছিল না। সুতরাং তাঁহার গৃহের প্রবেশদ্বার অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে চারি-পাঁচ জন রোগী লুক্কাইত ছিল। হকিম সাহেবের একমাত্র পরিচারক তাহাদিগকে একে একে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাহারা অন্দরে প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা আর সে পথে ফিরিতেছিল না। ক্রমে অন্ধকার গৃহদ্বার শূন্য হইয়া আসিল, শেষে এক বর্ষীয়সী রমণী অবশিষ্ট ছিল; পরিচারক আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, তখন হকিম সাহেবের দুয়ার শূন্য হইল। প্রৌঢ়া যে মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তে আর একটি বুর্খাবৃতা রমণী দ্রুতপদে অন্ধকার দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া

লুকাইল। পরিচারক ও প্রৌঢ়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলে অন্ধকারের আশ্রয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাদিগকে অনুসরণ করিল। তৃতীয় কক্ষে গৃহতলে একটী মলিন শয্যায় হকিম্ শহীদ্ উল্লাহ্ উপবিষ্ট। কক্ষের চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ আধারে হকিম সাহেবের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জাম সজ্জিত। প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল; হকিমের মুখের অপ্রসন্নভাব দেখিয়া তাহার কথা কহিতে ভরসা হইল না। হকিম সাহেব ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি রোগীর দিকে না চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেমার?" প্রৌঢ়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "হকিম সাহেব, বেমার আমার নহে, আমার বেটীর।" "বেটী কোথায়?" "আসিতে চাহে না জনাব।" "তবে চিকিৎসা করিব কেমন করিয়া?" "সেইজন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম, পাটনা সহরে এ রকম রোগের চিকিৎসা আপনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না।"

হকিম সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং বৃদ্ধাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটীর বয়স কত?" বৃদ্ধা দূরে ভূমিতে উপবেশন করিয়া কহিল, "বিশ বাইশ হইবে।" "বেমার কি?" "তাহা পাটনা সহরের কোন হকিম বুঝিতে পারিল না; সেইজন্যই ত আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি রোগের লক্ষণ বলিয়া যাই, আপনি বুঝিয়া লউন। আমার বেটী তয়ফাওয়ালী; দেখিতে খুব সুন্দরী। তাহার এই প্রথম বয়স সুতরাং খোদার মর্জ্জিতে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার হইত।

বুড়া বয়সে আমার নসীব ফিরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি হইল, বেটী আমার এক কাফেরকে দেখিয়া পাগল হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া অবধি মজুরা করা ছাড়িয়া দিল; পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল; অনুনয় বিনয় কিছুই শুনিল না। লোকে বলিল দানো পাইয়াছে। রোজা আসিয়া কত মন্ত্র বলিল; ওস্তাদ আসিয়া ঝাড়িল, তাবিজ পরাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আপনি ছাড়া পাটনা সহরের যত নামজাদা হকিম, সকলকেই ডাকিয়া দেখাইয়াছি; কিন্তু কেহই বলিতে পারে নাই বেমারটা কি? এই একমাস হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আজি সকালে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি সেইজন্য এখন আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হকিম সাহেব হুঁকার নলে মুখ-সংযোগ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বেমার কঠিন, ঔষধ অনেকদিন ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা ফল হইবে না।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া কহিল, "জনাব, আমি অতি গরীব, হকিম ও রোজাকে পয়সা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। যাহা কিছু ছিল বেচিয়া কিনিয়া এই দুইটা আশ্‌রফি আনিয়াছি। আরাম হইলে যেমন করিয়া পারি আর দুইটা আশ্‌রফি আনিয়া দিব।" "দুই আশ্‌রফি ত এক সপ্তাহের ঔষধের দাম, দুই তিন সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার না করিলে ফল হওয়া কঠিন।" বৃদ্ধা হকিমের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং কহিল, "হুজুর, মা বাপ, আমি গরীব নাচার।"

হকিম শহীদ্-উল্লাহ মানুষ চিনিতেন। তিনি বুঝিলেন যে দাবী-দাওয়া অধিক করিলে শিকার পলাইবে। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, দুইটা আশ্‌রফি আন, এক সপ্তাহ পরে আবার আসিও।" বৃদ্ধা কহিল, "ঔষধ যে খাইতে চাহে না জনাব?" হকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহারে অরুচি আছে?" বৃদ্ধা কহিল, "না।" হকিম একটা শ্বেতবর্ণ চূর্ণ লইয়া বৃদ্ধার হস্তে দিলেন এবং কহিলেন, "এই ঔষধটা সুমিষ্ট সরবতের সহিত পান করাইয়া দিবে, তাহা হইলে তোমার বেটী দুই তিন দিন অজ্ঞান হইয়া থাকিবে; সেই সময়ে নিত্য প্রভাতে এই দ্বিতীয় ঔষধটা দুগ্ধের সহিত মিলাইয়া পান করাইয়া দিও। দুই তিন দিন পরে জ্ঞান হইলে তোমার বেটী আর ঔষধ পান করিতে আপত্তি করিবে না।" বৃদ্ধা দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ঔষধ লইল এবং পরিচারক আসিয়া তাহাকে অন্যপথে লইয়া গেল। এই সময়ে দ্বিতীয়া রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

অভ্যাসমত হকিম শহীদ্-উল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেমার?" রমণী অভিবাদন করিয়া কহিল, "জনাব, আমার বেমার রূপ! রূপ কেমন করিয়া জলিয়া যায় বলিতে পারেন?" বেণুনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া হকিম শহীদ্-উল্লাহ মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বুর্খার আবরণের মধ্যেও রমণীর সুগঠিত অবয়বগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হকিম ক্ষুদ্র পাদুকা সন্নদ্ধ চরণের দিকে চাহিলেন। কনকবর্ণ সুন্দর ক্ষুদ্র পদদ্বয় দেখিয়া তাঁহার মুখের চিরস্থায়ী অপ্রসন্নভাব মুহূর্ত্তের জন্য দূর হইল। হকিম শহীদ্-

উল্লাহ্ প্রসন্ন হইয়া রমণীকে কহিলেন "বস।" রমণী গৃহের অপর প্রান্তে এক জীর্ণ গালিচায় উপবেশন করিলে হকিম কহিলেন, "তোমার কি রাত্রিতে নিদ্রা হয় ?" প্রশ্ন শুনিয়া রমণী সহসা বুর্খা দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার রূপে ক্ষুদ্র কক্ষ যেন তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ হকিম তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে না পারিয়া, নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কহিল, "হজরৎ, আমার রাত্রিতে নিদ্রা হয়, আমার আহারে অরুচি নাই, আমি উন্মাদিনী নহি ;—এই রূপ আমার কাল ; এই রূপের জন্য আমার সমস্ত সুখ-সম্পদ দূর হইয়াছে। আমার এই রূপ অপরের সুখের ঘরেও দুঃখের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। হকিম সাহেব, আমার রূপ কেমন করিয়া জ্বলিয়া যায়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন ? শুনিয়াছি আপনি অঘটন ঘটাইতে পারেন, আমার অর্থের অভাব নাই, আপনি যত অর্থ চাহেন আমি দিব। আমার এই অনর্থের মূল রূপ দূর করিয়া দিতে পারেন ?" অসৎপথাবলম্বী চিকিৎসক হকিম শহীদ্-উল্লাহ্ রমণীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী জীবনে বহুবিধ নর-নারী বৈধ-অবৈধ সহস্র কারণে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে ; কিন্তু এরূপ অভাবনীয় আবদার অদ্যাবধি কেহ তাঁহার নিকট করে নাই। বৃদ্ধ হকিম কহিলেন, "বেটী, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বহুদিন সংসারে আসিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি ; কিন্তু তোমার মত অনুরোধ আজি পর্য্যন্ত কেহ

আমার নিকট করে নাই। রূপ ঈশ্বরের দান, রূপ লাভ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। তোমার দেবদুর্ল্লভ রূপ কেন হারাইতে চাহ মা? মাশুক কি চলিয়া গিয়াছে, না বিবাদ করিয়াছে? প্রথম যৌবনে এই সব সামান্য কারণে বিরাগ আসে বটে, মা! তোমার রূপ জ্বালাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একবার জ্বলিয়া গেলে দুনিয়ার সমস্ত হকিম একত্র হইলেও তোমার এই ভুবনমোহিনী রূপ আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।"

রমণী হাসিল এবং ধীরে ধীরে কহিল, "জনাব, আমি কসবী; শুধু কসবী নহি, কসবীর বেটী কসবী। আজি দশ বৎসর ধরিয়া এই পাটনা সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, আলমগীর বাদশাহের মত আমার রূপ জগজ্জয়ী। রূপের গুণ-ব্যাখ্যান শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়াছে। জনাব, বেশ্যার কি মাশুক থাকে? বেশ্যার মাশুক আশরফি। শুনিয়াছি দুই এক জন বেশ্যার মাশুক থাকে; কিন্তু তাহারা তখন আর বেশ্যা থাকে না, তাহারা তখন রমণী হইয়া যায়। এই রূপে জগৎ জয় করিয়াছি, পুরুষ জাতিকে অবহেলায় পদে দলন করিয়াছি; কিন্তু সেই রূপই এখন আমার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; রূপ আমার সদ্গতির অন্তরায়, রূপ আমার কুপথ প্রদর্শক আর কেবল আমার সর্ব্বনাশের কারণ নহে, অনেক গৃহস্থের গৃহদাহের কারণ। জনাব, বেশ্যার রূপ জ্বালাইয়া দিলে দুনিয়ার মঙ্গল হইবে—আল্লাহ প্রসন্ন হইবেন। কত সতী দুই হাত তুলিয়া আপনাকে দোয়া করিবেন। আর আমি

আমার পাপের ধন দিয়া আপনার দুই হাত আশ্‌রফিতে ভরিয়া দিব। জনাব, আপনি আমার বাপের বয়সী; মনে বিচার করিয়া দেখুন, যে বেশ্যা স্বেচ্ছায় নিজ রূপ ধ্বংস করিতে চাহে, সে কি কখনও সে রূপ আর ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করে?"

হকিম রমণীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রমণী তাঁহার পদতলে পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা ফেলিয়া দিল। সুবর্ণ দেখিয়া শহীদ্-উল্লাহের সুমনোবৃত্তি দূর হইল; তাঁহার মুখের চিরস্থায়ী অপ্রসন্ন ভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "তোমার রূপ দূর করিতে পারি, কিন্তু যন্ত্রণা পাইবে।" রমণী কহিল, "হজরৎ, আমি অসহ্য নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। ইহা হইতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই হইতে পারে না।" "সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইবে।" "ক্ষতি নাই।" "মূল্য দশ আশ্‌রফি।" "ঔষধের কার্য্য হইলে আর দশ আশ্‌রফি দিয়া যাইব।" রমণী আর পাঁচটি আশ্‌রফি ফেলিয়া দিল। হকিম একটা মৃৎভাণ্ডে ঔষধ দিয়া তাহাকে কহিলেন, "ইহা চক্ষু বাঁচাইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিও, ক্ষত হইবে, রূপ জ্বলিয়া যাইবে।" রমণী অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্ধকারময় রাজ-পথে এক ব্যক্তি রমণীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, রমণী তাহা জানিত না। সে রমণীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "মা, ঔষধটা আমাকে দাও।" রমণী তাহার অঙ্গস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আগন্তুক কহিল, "ভয় নাই মা, আমি যে তোমার সন্তান, আমি হরিদাস।" মণিয়া

ঔষধ বৃদ্ধের হস্তে দিয়া আশ্রয়চ্যুতা ব্রততীর ন্যায় বৃদ্ধের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

অষ্টষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

নবীনা বৈষ্ণবী

অসীম সুতীগ্রাম পরিত্যাগ করিবার পরে দুই তিনমাস কাটিয়া গিয়াছে, ত্রিবিক্রম ও হরিনারায়ণ মুর্শিদাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ ও হোসেন আলি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বাদশাহ্ ফরুরুখ্‌সিয়র্ কাজোয়ার যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শাহাজাদা আজ্‌জুদ্দীনকে পরাজিত করিয়া আগ্রায় পৌছিয়াছিলেন: দিল্লী হইতে বাদশাহ্ জহান্দর শাহ্ আগ্রার নিকট আসিয়া যমুনার নিকটে সমুগড় নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যমুনা নদীর জল সহসা বাড়িয়া উঠায় জহান্দার শাহের দলের লোক স্থির করিয়াছিল যে, নদীর জল না কমিলে ফরুরুখ্-সিয়রের সৈন্য নদী পার হইতে পারিবে না, তাহারা এই জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল কিন্তু সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ দুই তিন ক্রোশ দূরে অপর এক স্থানে নদী পার হইয়া সমস্ত সৈন্য পার করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাদশাহ্ ফরুরুখ্‌সিয়র্ সেই সঙ্গে পার হইয়া আক্‌বরের সমাধির নিকট আগ্রা হইতে চার ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানের নাম সরাই রোজবাহানী

এবং ইহা আগ্রা হইতে মথুরা ও দিল্লী যাইবার পথে অবস্থিত। জহান্দার শাহের দলের লোক যখন শুনিল যে, ফর্‌রুখ্‌সিয়রের সৈন্য নদী পার হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। ১১২৪ হিজিরাব্দে, ১২ই জিল-হিজ্জা তারিখে, অর্থাৎ বাঙ্গালা সন ১১১৯ সালের পৌষ মাসের শেষ ভাগে রোজবাহানী গ্রামের সরাইয়ের চারি পার্শ্বে ফর্‌রুখ্‌-সিয়রের দলের সৈন্য নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিষ্কার করিতেছিল, বাদশাহী সড়কের উভয় পার্শ্বে বাজার বসিয়া গিয়াছিল, সে বাজারে খাদ্য-দ্রব্য ও পানের দোকানই অধিক কেবল দুই এক-খানা দোকানে বস্ত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রী হইতেছিল। পানের দোকানগুলিতে অত্যন্ত অধিক জনতা, কারণ প্রত্যেক পানের দোকানের সম্মুখে একজন পুরুষ অথবা রমণী সেতার বাজাইতে-ছিল অথবা গাহিতেছিল।

বাজারের উত্তর সীমায় অরহর ক্ষেত্রের ছায়ায় একজন এক-খানা বড় রকমের পানের দোকান খুলিয়াছিল কিন্তু গায়ক অথবা গায়িকা সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহার দোকানে খরিদ্দার জুটিতেছিল না। এই সময়ে সেই পথ দিয়া এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাহার যুবতী কন্যার হাত ধরিয়া মথুরার পথে যাইতেছিল, দোকানদার তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি গাহিতে জান?" বুড়া ভিখারী কহিল, "না, জানি না।" পান-ওয়ালা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার বেটী কি গাহিতে জানে?" বুড়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাহা আমি

বলিতে পারি না।" পানওয়ালা তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আমার উপর একটু মেহেরবানি কর, তুমি দয়া না করিলে আমার বড় লোকসান হইবে। এক-জন গায়ক বা গায়িকা পাই নাই বলিয়া আমার দোকানে খরিদ্দার জুটিতেছে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকালবেলা লড়াই বাধিবে, এখন খরিদ্দার না জুটিলে আমার মাল-মসলা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।" বৃদ্ধ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কি গাহিবে?" রমণী একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি গাহিলে যদি ইহার উপকার হয় বাবা, তাহা হইলে গাহিতে আপত্তি কি?" পানওয়ালা কতকগুলা কাঁচা অরহরের ডালপালা আনিয়া পথের ধারে কাদার উপর বিছাইয়া দিল, বুড়া তাহার উপর বসিল, তাহার কন্যা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান ধরিল—

কাঁহা গেল শ্যামরায়
বিসরি বংশীবট শ্যাম যমুনাতট
বিসরি যশোদা মায়।

গায়িকার সুস্পষ্ট সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শিবিরের তুমুল কোলাহল ভেদ করিয়া উঠিল, মুহূর্তের জন্য জন-সঙ্ঘ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর লস্করের সমস্ত লোক সেই গায়িকার সন্ধানে ছুটিল। গায়িকা গাহিল—

বিসরি গোপকুল ধেনুকুল আকুল
বিসরি শ্রীরাধিকায়।

চারিদিক হইতে লোক আসিয়া যখন সেই পানওয়ালার দোকানের সম্মুখে জমিল তখন গায়িকা এই দুইটি চরণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল। একজন শ্রোতা বলিল, "মাগীটা যেন কোকিল রে!" সত্য সত্যই গায়িকা সুশ্রী হইলেও মসীকৃষ্ণবর্ণা। গায়িকা গাহিল—

তুঁহা পদ পেখন বিরহে অনুখন
চঞ্চল চরণে ধায়।
বিসরি লাজ ভয় সময় অসময়
গোপবধূ যমুনায়।

একজন সিপাহী কাজোয়ার যুদ্ধে লুটিয়া অনেক টাকা পাইয়াছিল, সে গায়িকাকে একটা চাঁদির টাকা দিতে গেল কিন্তু রমণী তাহা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল না; সিপাহী ক্ষুণ্ণ হইয়া টাকাটি বুড়া বৈরাগীকে দিতে গেল কিন্তু সেও মাথা নাড়িয়া টাকা লইতে অস্বীকার করিল। তখন সিপাহী ক্ষুণ্ণ হইয়া একজন শ্রোতাকে বলিল, "টাকা লইবে না তো গান গাহিতে আসিয়াছে কেন?" শ্রোতা কহিল, "উহারা পথ দিয়া যাইতেছিল, দোকানদারের খরিদ্দার না জুটায় তাহার অনুরোধে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।" গায়িকা এই সময়ে গাহিয়া উঠিল—

পদযুগ রাতুল পরশন ব্যাকুল
অতি দীনখিন কায়।
আনমনে যমুনে মৃদু মৃদু গমনে
উদাসে উজানে ধায়।

এই সময়ে জনতার প্রান্তে কোলাহল উঠিল, লোক চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল, পানওয়ালা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল যে, একজন সওয়ার পথ হইতে লোক সরাইয়া দিয়া তাহার দোকানের দিকেই আসিতেছে। গান থামিয়া গেল, লোক সরিয়া গেল, পানওয়ালা বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল, সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সওয়ার পানওয়ালার দোকানের সম্মুখে আসিয়া বুড়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মণিয়া কোথায়? মণিয়া! মণিয়া বাঈ! আমি ফরিদ খাঁ, পাটনার ফরিদ খাঁ।" গায়িকা তখন মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বুড়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, মোগল বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" বুড়া কহিল, "হুজুর, আমি হিন্দু ফকির, বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিতেছি, মথুরায় যাইব। এ আমার পালিত কন্যা।" উত্তর শুনিয়া দীর্ঘাকার মোগল যোদ্ধা যেন সহসা ক্ষুদ্রকায় হইয়া গেল, যে আশা-বল-দৃপ্ত হইয়া সে আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া সে যেন তাহার দেহের সমস্ত বল, দর্প ও গর্ব্ব হারাইয়া ফেলিল, তাহার দীর্ঘ দেহ যেন জরার ভারে নত হইয়া পড়িল। উদ্ধত মোগল শান্ত শিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ফিরিয়া গেল।

তখন চারিদিক হইতে লস্করের লোক ফিরিয়া আসিয়া গায়িকাকে পুনরায় গাহিতে অনুরোধ করিল, পানওয়ালা দোকান হইতে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের হাতে পায় ধরিতে লাগিল। তাহাদিগের অনুরোধে বাধ্য হইয়া গায়িকা আবার গাহিল—

পদযুগ রাতুল পরশন ব্যাকুল
অতি দীন-খিন কায়।
আনমনে যমুনে মৃদু মৃদু গমনে
উদাসে উজানে যায়।
বিসরি বৃন্দাবন গোপিনী বিনোদন
কাঁহা গেল শ্যামরায়।

মোগল তখনো অধিক দূর যায় নাই, গায়িকার কণ্ঠস্বর তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিল, সে ঘোড়ার লাগাম টানিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ফরিদ খাঁ ফিরিল, এবারে অতি ধীর পদে ফিরিল এবং জনতার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া দুই একজন শ্রোতা সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল কিন্তু সে আর অগ্রসর হইল না। ফরিদ খাঁ দেখিল যে গায়িকা মণিয়ার মত বটে কিন্তু তাহার দৃষ্টি চাঞ্চল্য-বিহীন, স্থির, তাহাতে বারবণিতা সুলভ নৃত্য নাই, অঙ্গ-ভঙ্গিতে লালিত্য আছে কিন্তু লজ্জাহীনতা নাই। ফরিদ খাঁ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

একোনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

আগ্রা যুদ্ধের পরে

১৩ জিলহিজ্যা তারিখে সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল এবং ঘন কুয়াশায় সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল। দুই

বাদশাহের পক্ষের লোক যে যেখানে আশ্রয় পাইল লুকাইয়া রহিল। সরাই রোজবাহানীর অনতিদূরে একটা পুরাতন কবরের মধ্যে বুড়া হরিদাস বৈষ্ণব ও মণিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, রাত্রিকালে তিনজন রাজপুত সিপাহী, একটা গর্দ্দভ ও দুইটা কুকুর আসিয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইল, কারণ পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে বৃষ্টির জন্য অনাবৃত স্থানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বৃষ্টি পড়িল। অপরাহ্নে সিপাহী তিনজন বৃষ্টি থামিয়াছে দেখিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় হরিদাসকে বলিয়া গেল যে, এখনই দুই ফৌজে যুদ্ধ বাধিবে সুতরাং সে যেন আজ আর পথে বাহির না হয়।

আগ্রায় যুদ্ধ যখন শেষ হইল তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত রাত্রি হরিদাস ও মণিয়া জাগিয়া রহিল, প্রথম রাত্রিতে যুদ্ধের কোলাহলে এবং শেষ রাত্রিতে আহতদিগের চীৎকারে সে রাত্রিতে আগ্রার চারিপার্শ্বের চারি পাঁচ ক্রোশের লোক ঘুমাইতে পারে নাই। পরদিন প্রভাতে জুলফিকার খাঁ ও বাদসাহ জহান্দার শাহ পলাইয়া গিয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পুরাতন বাদশাহকে ভুলিয়া সকলেই নূতন বাদশাহের বন্দনা করিতে ছুটিল, সেই অবসরে হরিদাস ও মণিয়া কবর হইতে বাহির হইয়া মথুরার পথ ধরিল।

তখন পথের উভয় পার্শ্বের ঘাসের উপরে শিশির জমাট বাঁধিয়া ছিল, হেমন্তের সূর্য্য তখনও পূর্ব্বাকাশের কোল দখল

করিয়া বসিতে পারে নাই। পূর্ব্বের রাত্রে যুদ্ধের চিহ্ন আগ্রা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এতদূর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। একটা সুন্দর ঘোড়া যথাসাধ্য হাত পা ছুড়িয়া শীঘ্র মরিবার চেষ্টা করিতেছিল, একটা বন্দুকের গুলি তাহার উদর ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দুইটা শকুনি ও কতকগুলা কাক সেই হেমন্তের উষালোকেও পথের ধারে বসিয়াছিল। মণিয়া ঘোড়াটি পার হইবার সময় তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বুড়া বৈরাগী বলিল, "মা, দুনিয়ায় থাকিতে হইলে এত সামান্য কষ্ট দেখিয়া শিহরিলে চলিবে কেন? মানুষ ইহার পূর্ব্বপুরুষকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানাইয়াছিল, সেই মানুষই ইচ্ছা করিয়া ইহাকে এত যন্ত্রণা দিয়া মারিতেছে। তুমিও যখন মানুষ, যখন মানুষের সমাজে বাস করিবে তখন মানুষের কাজ দেখিয়া শিহরিলে চলিবে কেন?" মণিয়া দ্বিতীবার শিহরিয়া বলিল, "বাবা, মানুষ ইচ্ছা করিয়া জীবকে এত কষ্ট কেন দেয়, তাহা তো বুঝিতে পারি না।" বৃদ্ধ হরিদাস জিভ্ বাহির করিয়া বলিল, "অমন কথা মুখে আনিও না মা, আমরা ভগবানের লীলার পুতুল, তিনি আমাদিগকে যে ভাবে খেলান আমরা সেই ভাবেই খেলি।" মণিয়া কথাটা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি বলিলে, আমি বুঝিলাম না। জহান্দার শাহ যদি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যুদ্ধ না করিত তাহা হইলে হয় তো এমন সুন্দর ঘোড়াটি অকালে মরিত না।"

"যুদ্ধ না করিয়া উপায় কি মা? যিনি পুতুল নাচান তিনি পুতুলকে যে ভাবে নাচান, পুতুল সেই ভাবেই নাচে। জহান্দার শাহ কি ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিত? সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেও নহে।" মণিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, মণিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, বাদশাহী সড়কের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড ক্রোশমিনার আশ্রয় করিয়া একজন দীর্ঘাকার মোগল পড়িয়া আছে এবং তাহার নিম্নে আরো দুই একটা দেহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কে জীবিত কে মৃত তাহা বলা কঠিন, মণিয়া তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া গেল এবং মোগলকে দূরে সরাইয়া আনিয়া ক্রোশমিনারের পাদপীঠমূলে শোয়াইয়া রাখিল। হরিদাস দূরে দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, সেকন্দ্র হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত মৃত দেহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তুমি কত লোকের শুশ্রূষা করিবে? সমস্ত দিন পথ চলিলে তবে যদি সন্ধ্যাবেলায় মথুরায় পৌছিতে পারি!" মণিয়া বুড়ার হাতের কমণ্ডলু কাড়িয়া লইয়া মোগলের মুখে জল ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিল, "লোকটা এখনো বাঁচিয়া আছে বাবা, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" হরিদাস একটু হাসিয়া দূরে বসিল। এই সময় মোগল মুখব্যাদান করিল, তাহা দেখিয়া মণিয়া কমণ্ডলু হইতে তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল, জল দিয়াই মণিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে বলিল, "ফরীদ, ফরীদ ভাই!" এই সময়ে বৃদ্ধ হরিদাসও চঞ্চল

হইয়া উঠিল যে স্থানে ফরীদের দেহ পড়িয়াছিল বুড়া সেই স্থানে আসিয়া আর একটা দেহ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে ফরীদ্ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিল, তাহার কণ্ঠস্বর তখনও ক্ষীণ, "আমি ফরীদ্ খাঁ, পাটনায় আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন, তাহাদের সংবাদ দিও, বলিও, ফরীদ্ পিতামহের মত মরিয়াছে।" মণিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ফরীদ, ভাই! আমি যে মণিয়া বাঈ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" ফরীদ্ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি দোজখের বাঁদী, আর আমার মণিয়াজান বেহেস্তের চামেলী ফুলের মত সফেদী।" মণিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ফরীদ্, ভাই! আমি যে আত্মগোপন করিবার জন্য রং মাখিয়া আসিয়াছি, আমি সত্য সত্যই মণিয়া, বাঁদীই বল আর পরীজাদীই বল—আমিই সেই মণিয়া।" তখন ফরীদ বহুকষ্টে তাহার আহত হাত দুইখানা তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিল, "মণিয়া! খোদা আমার মত পাপীকেও ভোলে না, তাই মৃত্যুকালে তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মণিয়া, পাটনায় ফিরিয়া যা, বাপজান্‌কে বলিয়া আয় যে, তাঁহার বেটা কসবী তওয়াইফের পিছন পিছন ঘুরিত বটে কিন্তু মৃত্যুকালে্‌ সে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছে, সে মোগল বাদশাহের সাত পুরুষের নিমক ভুলে নাই। আমার বাপজানকে আমার মরণের খবর দিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইও।" মণিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিল, "ফরীদ, তুই যে বাপ-মায়ের নয়নের মণি, আমি তোকে মরিতে দিব না।"

এই সময়ে বুড়া বৈরাগী আসিয়া মণিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমণ্ডলুতে কি আর জল আছে মা?" মণিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সেই প্রাচীন ক্রোশমিনারের মূলে রাশি রাশি মৃতদেহের মধ্যে আর একজন পরিচিতের সুপরিচিত মুখ মৃত্যুর কৃষ্ণ আবরণের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মণিয়া আবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কমণ্ডলু হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখে জল দিতে দিতে বুড়া কহিল, "মা, গোপালের ইচ্ছা নয় যে, আজ মথুরায় যাই, মনে করিয়া ছিলাম বিশ্রাম ঘাটে বিশ্রাম করিব কিন্তু গোপালের ইচ্ছা অন্যরূপ।" মণিয়া তখন মুহূর্ত্তের জন্য ফরীদকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহের নিকটে বসিল, অল্পক্ষণ শুশ্রূষার পরে সে ব্যক্তি কহিল, "আমার নাম অসীম রায়, জগতে আমার কেহ নাই, কাহাকেও সংবাদ দিতে হইবে না।" অসীমের মুখের চারিদিকে রক্ত জমিয়া পৌষের ভীষণ শীতে তুষারের মত কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

সরস্বতীর নবাবতার

দুর্গাঠাকুরাণী কহিলেন, "দেখ বৌ, মুখখানা কিন্তু বড়ই চেনা

চেনা, আমার সর্ব্বদাই মনে হয় যে ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছি।" বধূ বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হয় ঠাকুর ঝি, গলার আওয়াজটা যেন অনেকবার শুনিয়াছি।" নিকটে শৈল বসিয়া ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "দিদিদের যেমন কথা! বৈষ্ণবী-দিদি বলিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী তাঁহার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা সমস্তই ঢাকাই বাঙ্গালের মত। তোমরা কি কখনও ঢাকায় গিয়াছ যে, উহাকে চিনিবে?"

দুর্গা। ঢাকায় যাইব কেন ভাই? ঢাকার কত লোক আমাদের মুর্শিদাবাদের আড়পারে ডাহা পাড়ায় বাস করিয়াছে।

বধূ—ঢাকাই বাঙ্গাল অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ইহার কথাবার্ত্তা তাহাদের মত নহে।

এই সময়ে হাসিতে হাসিতে সতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কথা হইতেছে ভাই?" শৈল মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "সতী-দিদি, নূতন বৈষ্ণবী প্রথম দিন থেকে ইহাদের দুই জনের কোপ নজরে পড়িয়াছে। গরীবের মেয়ে, দুরবস্থায় পড়িয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আসিয়াছে, তাহার উপর তোমাদের এত রাগ কেন?"

বধূ—রাগ কিসের ভাই? গলাটা চেনা চেনা, তাহাই বলিতেছিলাম।

দুর্গা—হ্যাঁ ভাই ছোট-বৌ, তোর নূতন বন্ধু কি গান গাহিতে জানে?

শৈল—না ভাই, উহার যে লজ্জা, উহার মুখ দিয়া গান

বাহির করাই কঠিন। সেদিন উহাকে একখানা নূতন শাড়ী দিয়াছিলাম, লজ্জায় কিছুতেই সেখানা পরিল না।

দুর্গা—আমার কিন্তু মনে হয় ভাই, মাগীটা দিনরাত্তির বহুরূপী সাজিয়াই আছে।

সতী—অমন কথা মুখে আনিও না দিদি, মেয়ে আমার বড় লক্ষ্মী, দুটা একটা জিনিষপত্র দিই বলিয়া কেনা বাঁদীর মত সমস্ত দিন খাটিয়া মরে। সময়ে সময়ে কি ভাবে বটে, এককালে উহাদের অবস্থা ভাল ছিল, এখন সময় মন্দ পড়িয়াছে, সেই জন্য বোধ হয় দুঃখ করে। শ্রীমতী আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে, উহাকে কেহ দোষ দিও না ভাই।

দুর্গা—না ভাই, তোমার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েকে কেহ দোষ দেয় নাই। মাগীর নাম বুঝি শ্রীমতী? আমারা তো এতদিন পর্য্যন্ত জপাইয়া তাহার মুখ হইতে নামটি বাহির করিতে পারি নাই।

এই সময়ে একটি মধ্যবয়সী সধবা আসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া সতী জিজ্ঞাসা করিল "কি চাই মা?" রমণী কহিল, "কিছু না মা, ও বাড়ীর কর্ত্তা-দাদা ছোটমাকে ডাকিয়াছেন।" পিতা ডাকিয়াছেন বলিয়া শৈল চলিয়া গেল, রমণী কিন্তু তখনও দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা দেখিয়া সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি খবর?" রমণী কহিল, "হাতের কাজ সারা হইয়াছে, এখন কি ঘাটে যাইব মা?" সতী বলিল, "তবে আমিও যাই চল।"

গ্রাম হইতে গঙ্গাতীরের পথে চলিতে চলিতে সতী শ্রীমতীকে

নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। "তোমরা কতদিন মুর্শিদাবাদে ছিলে?" শ্রীমতী বলিল, "অনেকদিন।" তাহার পরেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই চার পাঁচ বৎসর।"

"মুর্শিদাবাদ বুঝি খুব বড় সহর?" "এত বড় শহর বাঙ্গালা মুল্লুকে নাই, এমন কি ঢাকার চাইতেও বড়।" "তোমরা কোথায় থাকিতে?" "শহরের কাছেই, লালবাগে।" "সেখান হইতে কীরিটেশ্বরী কত দূর?" "পাঁচ ছয় ক্রোশ।" "তুমি কি কীরিটেশ্বরী গিয়াছ?" "কতবার।"

স্নানান্তে দুইজন গ্রামে ফিরিয়া আসিল। শ্রীমতী সতীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া সিক্ত বস্ত্রেই মিত্রগৃহে প্রবেশ করিল। শৈল তখন প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহার আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি বিন্যাস করিতেছিল। শ্রীমতী তাহার হাতের চিরুণী লইয়া চুল আচড়াইতে বসিল। নানাছন্দে বিনাইয়া নানা কথা বলিতে বলিতে শ্রীমতী হঠাৎ বলিয়া বসিল, "ছোট মা, একটা নিবেদন করি, যদি অভয় দাও তো বলি।" শৈল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অভয় কিসের গা?" "না মা, বড় ঘরের কথা, আমরা ছোটলোক, বলিতে ভয় পাই।" "ভাল, অভয় দিলাম, বল।" "এখানে হইবে না ঘরে চলুন।"

প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতলের একটি কক্ষে যাইয়া শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিতেছিলে বল না।" শ্রীমতী তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি কায়স্থের মেয়ে নহি, আমি জাত বৈষ্ণবের মেয়ে। আমার নাম সরস্বতী, আমি আপনার

শ্বশুরকুলের অনেক কালের পুরাতন দাসী। আপনার বিবাহের সংবাদ পাইয়া আপনার ভাসুর ও বড়-মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।" বলিতে বলিতে সরস্বতীর অঙ্গ-ভঙ্গী হাবভাব ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা বদলাইয়া গেল, শৈল তাহা দেখিয়া বিস্মিতা হইল। সরস্বতী কহিল, "বিশেষ কারণ না থাকিলে আপনার ভাসুর ও মা, আমাকে আপনার নিকট পাঠাইতেন না। আপনার ভাসুর মস্তলোক, এখনও আপনার শ্বশুরের নাম না করিয়া ঢাকার লোকে জলগ্রহণ করে না। আপনার শ্বশুর-বংশের নাম দেশ বিখ্যাত, আপনি এখন সেই ঘরের বৌ, আপনাকে না বলিলে একটা বিপদ নিবারণ হয় না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" শৈল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তুমি যদি আমার শ্বশুর-কুলের পুরাতন দাসী, তবে এমন করিয়া লুকাইয়া আসিয়াছ কেন? আর তোমার কথাই যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি?" সরস্বতী হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "ঠিক কথা মা, বড়-ঘরের বৌয়ের মত কথা, তোমার শ্বশুরের বংশের নামে কলঙ্কের কালী পড়িতেছে বলিয়া তাঁহারা আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন—আর এই তাহার প্রমাণ।" "সরস্বতী তাহার ট্যাকের খুঁট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া শৈলর হাতে দিল, শৈল পড়িতে জানিত না সুতরাং পত্রখানা লইয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুর-বংশের কলঙ্কের কথাটা বলিলে না?" সরস্বতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখ ছোট-মা, কথাটা যে

সরস্বতী বৈষ্ণবী তোমায় বলিয়া গিয়াছে তাহা গোপন থাকিবে না, বল তখন আমাকে বাঁচাইবে ?" শৈল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, বাঁচাইব।" "এই যে কালকোলো গোলগাল দুর্গাঠাকুরাণীটিকে দেখিতেছ উনিই যত নষ্টের মুল। ছোট কর্ত্তাটিকে মুখে বলেন দাদা কিন্তু উহার জন্যই ছোটকর্ত্তা আজ দেশত্যাগী। গ্রামে যখন টি টি পড়িয়া গেল, গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর লোক মিলিয়া বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরকে একঘরিয়া করিয়া দিল, তখন তিনি সন্তানের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। ছোট-কর্ত্তা ঐ দুর্গাঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, ছুঁতায় নাতায় বড়-মার সাথে ঝগড়া করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে দুই দলে দেখা, ঠাকুরাণীটি ছোট কর্ত্তাকে ছাড়িতে হইবে বলিয়া বুড়া ব্রাহ্মণকে কাশীতে যাইতে দিতেছে না। দুর্গার লজ্জাসরম একেবারেই নাই। পাটনায় গিয়া বুড়া বাপের চোখে ধূলা দিয়া স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিয়া আসিল। আর বেশী কথা কি বলিব, ইহাদের দুই-জনকে দুই ঠাঁই করিতে না পারিলে তোমাদের সংসারের আর মঙ্গল নাই।" শৈল মুখখানাকে কালো মেঘের মত গম্ভীর করিয়া বলিল, "বট্‌ঠাকুরকে বলিও, তাহাই হইবে।" সরস্বতী আবার একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল, "ছোট মা, আমি এখন দুই চারি দিন সুতীগ্রামে থাকিব, কোন উপায়ে দুর্গাঠাকুরাণীকে ঘরের বাহির করিতে পারিলে তোমার ভাসুর মোটাটাকা বকশিস দিবেন বলিয়াছেন।"

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার সুবাদার ও কানুনগোই

চেহেল সতুন প্রাসাদ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অসম্পূর্ণ প্রাসাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ তলে সুবা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার মুরশিদ কুলি জাফর খাঁ দরবার করিতেছিলেন। প্রধান কানুনগোই দর্পনারায়ণ রায়, দ্বিতীয় কানুনগোই হর-নারায়ণ রায় প্রভৃতি রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট। সুবাদারের দপ্তর ও সৈন্য তখনও জাহাঙ্গীরনগর ঢাকা হইতে আসিয়া পৌছায় নাই। ফরুরুখ্-সিয়র আগ্রার যুদ্ধের পূর্ব্বে রশিদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার তিন সুবার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের তিন ক্রোশ দূরে পরাজিত হইয়াছিলেন। আগ্রার যুদ্ধের সংবাদ তখনও মুর্শিদাবাদে পৌছায় নাই, মুর্শিদাবাদের ফৌজদার মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ আনওর খাঁ জৌনপুরী এবং মীর বাঙ্গালী প্রমুখ জাফর খাঁর বিশ্বস্ত অনুচরগণ নবাবের বাম পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। নবাবের জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বাঙ্গালার তিন সুবার রাজস্ব লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন, পথে এলাহাবাদে ফরুরুখ্সিয়র সৈয়দ আব্দুল্যা খাঁ সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ রাজস্বের টাকা রক্ষার ছলে তাহাকে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে লইয়া গিয়া অবশেষে সমস্ত টাকা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই অবধি সুজাউদ্দীন খাঁর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

জামাতার খবর না পাইয়া বৃদ্ধ নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত বাদশাহ কে? জহান্দার শাহ, না, ফর্‌রুখ্‌সিয়র, তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল, এই সময়ে একজন চোবদার আসিয়া সংবাদ দিল যে, পরগণে বিক্রমপুরের সাবেক ফৌজদার জাহাঙ্গীরনগর ঢাকার সাবেক থানাদার ও জিন্নত মকাণী শাহজাদা আজিম-উশ-শানের ভূতপূর্ব্ব খান্‌সামান রায় ত্রিবিক্রম রায় দরবারে পেশ হইতে চাহে। নামটা শুনিয়া জাফর খাঁর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, হরনারায়ণ রায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, সৈয়দ আন্‌ওর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দরবারের সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল, কারণ ত্রিবিক্রম রায়ের নাম ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে শোনা যায় নাই। জাফর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিবিক্রম রায় কি হিন্দু ফকীর সাজিয়া আসিয়াছে?" চোবদার তসলীম করিয়া বলিল, "জনাব আলী, রায় সাহেব দরবারী পোষাকে আসিয়াছেন।" জাফরখাঁ সৈয়দ আন্‌ওরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে উঠিয়া দাঁড়াইলে?" আন্‌ওর বলিলেন, "জনাব আলি, ত্রিবিক্রম রায় আমার পুরাতন বন্ধু, জাহাঙ্গীর নগরে ইব্রাহিম খাঁর আমলে একসঙ্গে মন্‌সব পাইয়াছিলাম।" জাফর খাঁ পেশকার নাজির আহ্‌মদ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবার মন্‌সবদারদের মধ্যে ত্রিবিক্রম রায়ের নাম কি এখনও আছে?" পেশকার খাতাপত্র উল্টাইয়া বলিল, "জনাব আলী, আলমগীরী আমলের মধ্যে আপনার, দুইজন কানুনগোইএর ও ত্রিবিক্রম রায়ের নাম এখনও আছে।" তাহা শুনিয়া সুবাদার

সৈয়দ আন্ওরকে বলিলেন, "তুমি গিয়া ত্রিবিক্রমকে লইয়া আইস।" হুকুম শুনিয়া চোবদার একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কারণ একজন নূতন মন্সবদার আনিতে পাইলে সে এক আশরফী বক্শিস পাইত।

আলমগীরি আমল অর্থাৎ—বাদসাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজ্যকালে নিযুক্ত কর্ম্মচারী মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশায় অত্যন্ত সম্মান পাইতেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অমীরউল উমরাহ্ আসদ খাঁ সদ্গুণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় না পাইলে কোন লোককে মন্সব প্রদান করিতেন না। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে, বিশেষতঃ জহান্দার শাহ্ ও ফর্রুখসিয়রের রাজ্যকালে বহু অনুপযুক্ত ব্যক্তি মন্সবদার নিযুক্ত হইয়া মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। সৈয়দ আনওর চলিয়া গেলেন এবং ত্রিবিক্রমকে লইয়া আসিয়া যথারীতি দরবারে পেশ করিলেন। ত্রিবিক্রম একাদশ স্বর্ণমুদ্রা নজর দিয়া কুর্ণিশ করিয়া দরবারে মস্নদ পাইলেন। আদবকায়দা শেষ হইয়া গেলে নবাব [illegible] খাঁ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিবিক্রম রায়, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" ত্রিবিক্রম উত্তর দিলেন, "জনাব, এক আউরতের জন্য ফকীর হইয়াছিলাম, আর এক আউরতের জন্য সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছি।" বৃদ্ধ নবাব হাসিয়া বলিলেন, "রায়জী, আউরতই দুনিয়ার দুশমন্, একদিন সরাফরাজ আউরতের জন্য প্রাণ হারাইবে।" "জনাবআলী, যখন সংসারে

ফিরিয়া আসিয়াছি, তখন দিন পাতের জন্য রোজগার করিতে হইবে, সেই জন্য দরবারে পেশ হইলাম।" নবাব বলিলেন, "তোমার মত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী যে কোনও সুবাদার লুফিয়া লইবে। তোমার মন্‌সব, আয়মা—সমস্তই মৌজুদ্‌, রায়জী, তুমি কি কাম করিতে চাহ?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া বলিলেন, "জনাব, চিরকাল খালসার দফ্‌তরে ছিলাম, একদিন দিউয়ান-ই তানের কাম করিয়াছি। রাজস্ব বিভাগে যে কোন কাম দিবেন তাহাই করিব।" নবাব বলিলেন, "খাল্‌সার সেরেস্তা বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে, রায়জী, নূতন বাদশাহের হুকুম পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি এই তিন সুবার খাল্‌সার নায়েব দিউয়ানী করিতে থাক।" সভার সকলে "কেরামত্‌," "কেরামত্‌" বলিয়া নবাবের সাধুবাদ করিল, বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ রায়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণের মুখ শুখাইয়া গেল।

ত্রিবিক্রম সভার একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর বেলায় সেদিনের সমস্ত আরজী শুনিয়া নবাব যখন দরবার ত্যাগ করিলেন তখন প্রধান কানুনগোই দর্পনারায়ণ রায় হরনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে, তুমি যে ত্রিবিক্রমকে চিনিতেই পারিলে না?" হরনারায়ণ শুষ্ক মুখে বলিলেন, "চিনিতে পারিব না কেন? অনেকক্ষণই চিনিয়াছি, তবে নবাব দরবারে থাকিতে কথা কহা কায়দা বিরুদ্ধ, সেই জন্যই কথা কহি নাই।" ত্রিবিক্রমকে দর্পনারায়ণ ও হরনারায়ণ প্রণাম করিলেন, তখন ত্রিবিক্রম

বলিলেন, "হর, আমার সঙ্গে হরি আসিয়াছে, আমরা লালবাগে বাসা লইয়াছি। তুমি কি সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিবে?" হরনারায়ণ বলিলেন, "হরি যে ভাবে গ্রাম হইতে বিদায় হইয়াছে তাহাতে আমি আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি না।" ত্রিবিক্রম বলিলেন, "দুর্গার অপবাদের জন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। উপস্থিত সে পাটনা হইতে তোমার বৈমাত্রেয় ভাই দুইটির মোক্তার হইয়া আসিয়াছে। আমি বলি, তোমরা দুইজন দেখা করিয়া কাগজপত্র দেখিয়া বিবাদটা মিটাইয়া ফেল, তাহা না হইলে কাল হয় ত নবাব দরবারে অসীম ও ভূপেনের নামে আরজী পেশ হইবে।" হরনারায়ণ শুষ্কমুখে বলিলেন, "নেহাৎ যদি আরজী পেশ হয় আমি আর কি করিব।" "দেখ হর, অসীম এখন একজন আমীর, সে তোমার আমার মত মন্‌সবদার নহে। সে যখন মুর্শিদাবাদে আসিবে তখন নবাব জাফর কুলী খাঁকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তুমি যেমন করিয়া রুকুনপুর পরগণার অংশ লিখাইয়া লইয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বৃদ্ধ দর্পনারায়ণের সহিত হরনারায়ণের একটা চিরস্থায়ী বিবাদ ছিল, ত্রিবিক্রম তাহা জানিতেন। এক সময়ে দর্পনারায়ণ জাফর খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া সুবা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্বের হিসাব সহি করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন সেই সময়ে হরনারায়ণ নায়েব কানুনগোই ছিলেন এবং তিনি জাফর খাঁর মন রাখিবার জন্য রাজস্বের হিসাবে সহি করিয়া

তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তখন জাফর খাঁ সুবা বাঙ্গালার রাজস্বের দিউয়ান, দর্পনারায়ণ রায় প্রথম কানুন গোই এবং হরনারায়ণ দ্বিতীয় কানুনগোই। তদবধি দর্পনারায়ণ জাফর খাঁ বা মুরশিদকুলী খাঁর কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে হর, রুকনপুরের দশ আনা অংশ কবে লিখাইয়া লইলে? সে কথা খালসার পেশকারকে জানাও নাই ত?" হরনারায়ণ তখন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "খুড়া, কাজটা অতি গোপনে হইয়াছিল, সেইজন্য কথাটা খালসার সেরেস্তায় উঠাই নাই। দুই বৎসর ধরিয়া যেরূপ গোলমাল চলিতেছে তাহাতে বিষয় আসয় রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।" ত্রিবিক্রম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি জাননা যে, রুকনপুর খালসা পরগণা, খালসার আয়মা বাদশাহের পঞ্জা ও মোহর ব্যতীত হস্তান্তর হয় না, সে কথা দিউয়ান-ই-কুল ও মুস্তৌফী ব্যতীত আর কেহ বাদশাহী দরবারে পেশ করিতে পারে না?" ত্রিবিক্রমের কণ্ঠস্বর ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া দুই চারিজন হিন্দু ও মুসলমান ক্রমে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা দেখিয়া হরনারায়ণ সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "খুড়া, আর গোলমালে কাজ নাই, তুমি আর ত্রিবিক্রম উপস্থিত থাকিয়া আমাদের শড়ীকী বিবাদটা মিটাইয়া দাও।" বহুদিন পরে শত্রু হরনারায়ণকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া দর্পনারায়ণ মনের আনন্দ গোপন করিতে পারিলেন না, তিনি ত্রিবিক্রমকে

বলিলেন, "তবে সন্ধ্যার পরে দরবারের ফেরত তোমাদের বাসায় যাইব, হরনারায়ণও আমার সঙ্গে যাইবে। কথাটা খালসা দপ্তরের পেশকারকে জানাইয়া রাখা উচিত ছিল।" হরনারায়ণ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুড়া, ইহার পর যাহা বলিবে তাহাই করিব, আর অপমান করাইও না।" রাজস্বের হিসাবের কথা স্মরণ করিয়া ত্রিবিক্রম হাসিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

কিরীটেশ্বরীর পথে

সন্ধ্যার অন্ধকারে রন্ধনশালার দুয়ারে বসিয়া সতী জপ করিতেছিল আর শ্রীমতী চারি হাত তফাতে বসিয়া ছিল। জপশেষ হইলে সতীকে নমস্কার করিতে দেখিয়া শ্রীমতী কহিল "মা, এইবার একটু ছোট মার কাছে যাইব কি?" সতী হাসিয়া বলিল, "মেয়ে, দিনের পর দিন ছোটমার উপর তোর টান বাড়িয়াই চলিয়াছে আর আমার উপর মায়া-মমতা কমিয়া আসিতেছে। তুই এখন যাইতে পাইবি না, এইখানে বসিয়া থাক।" শ্রীমতী ওরফে সরস্বতী হাসিয়া বলিল, "ছোট মা স্নেহ করেন, তাই যাই। মা যদি বারণ করেন, না হয় যাইব না।" "তুই বস্, আমার বড় কিরীটেশ্বরী দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে এখান হইতে কত দূর?" "গাড়ীতে দেড়দিনের পথ।" "পথ কেমন ভয় ডর নাই ত?" "সুন্দর বাদশাহী সড়ক, মা, অনামুখ

ঠাকুরের মন্দিরে একাদশী অমাবস্যায় মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়া হইতে কত মেয়ে ছেলে হাঁটিয়া যায়। ভয় ডর কিসের মা? এরাজ্যে কি ভয় ডর আছে? তবে শুনিয়াছি, দক্ষিণ দেশে ফিরিঙ্গীতে এখনও নৌকা মারে।" "দেখ মেয়ে, কাল একাদশী, আমরা তিন চারিজন একখানা গাড়ী করিয়া ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যাবেলায় রওনা হইব।" "কর্ত্তা বাবাকে বলিয়াছ কি মা?" "সর্ব্বনাশ, বাবাকে বলিলে কি আর যাইতে পাইব? সঙ্গে দুর্গা যাইবে বৌমা যাইবে আর পাড়ার মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক দুই একজনকে লইব। তুই আমাদিগকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইতে পারিবি?"

তখন অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর হৃদয় আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সুতরাং সে অনেকক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না। যখন সে উত্তর দিল, তখন কথাটা অন্য ভাবের দাঁড়াইয়া গেল। সরস্বতী বলিল, "আমিও গৃহস্থের বৌ, মা; তোমরা সকলেই ছেলে মানুষ, আমি একা কি তোমাদের এত লোককে সামলাইতে পারিব?" "কেন পারিবি না? এই ঘোষেদের তিনটি বিধবা বৌ গেল মাসে কিরীটেশ্বরী মা'কে দর্শন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কেবল দীনু বাগদীর বৌ ছিল, একজনও পুরুষ ছিল না।" "তোমরা যদি সাহস কর মা, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে পারি। তবে এখন আমি উঠি।" "যা কিন্তু শৈলকে কোন কথা বলিস না।" মনের আনন্দে বৈষ্ণবী দ্বাদশ ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে

সরস্বতী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যাকালে দুর্গা, বড় বধূ, সতী ও গ্রামের একটি প্রাচীনার সহিত সরস্বতী কিরীটেশ্বরী যাত্রা করিল। গাড়ী সমস্ত রাত্রি চলিল। সকাল বেলা একখানা গ্রামের প্রান্তে গরু খুলিয়া শকটচালক যখন রন্ধনের উদ্যোগ করিল তখন সরস্বতী আহার্য্যের সন্ধানে গ্রামের ভিতর চলিয়া গেল। সে সন্ধান করিয়া জানিল যে, গ্রামের নাম মহীপাল এবং সেই গ্রামে দুই চারিজন পাঠান বাস করে। তাহারা পাঠানের বংশধর বটে কিন্তু বাঙ্গালাদেশের স্নিগ্ধ জলবায়ু তাহাদের পাঠান সুলভ কর্কশতা দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালী কৃষকে পরিণত করিয়াছিল। একজন পাঠান পুরস্কারের লোভে সরস্বতীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া সুদীর্ঘ পদক্ষেপে ডাহাপাড়ায় যাত্রা করিল। সরস্বতী ফিরিয়া আসিলে প্রবীণা সঙ্গিনী রন্ধন চড়াইয়া দিলেন; আহারান্তে যাত্রা করিতে শীতের বেলা পড়িয়া আসিল।

শেষ রাত্রিতে বলদ দুইটিকে যথেচ্ছ চলিতে দিয়া শকটচালক যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তখন চারি পাঁচজন লাঠিয়াল গাড়ী চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল, গাড়োয়ান উঠিয়া দেখিল যে অন্ধকারে গাড়ী লইয়া পলায়ন অসম্ভব, তখন সে বীর পুরুষের মত গাড়ী ও বলদ ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল।

সতী, দুর্গা ও বড় বধূ বসিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের প্রবীণা সঙ্গিনী ও সরস্বতী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বদিকে যখন উষার আলোক দেখা দিল তখন

একজন লাঠিয়াল গাড়ীখানাকে একটা পুষ্করিণীর তীরে খুলিয়া দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে নামিতে আদেশ করিল। বড়বধূ দেখিতে পাইলেন, সরস্বতী তখনও সুর করিয়া চেঁচাইতেছে বটে কিন্তু তাহার চক্ষুতে জল নাই। স্ত্রীলোকদিগকে পুষ্করিণীর তীরে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে বসাইয়া দুইজন লাঠিয়াল পাহারা রহিল আর বাকী দুইজন নিকটের গ্রামের দিকে চলিল।

সেই দিন সেই সময়ে নূতন নগর, মুর্শিদাবাদের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার এক কক্ষে বসিয়া ত্রিবিক্রম নবীনদাসকে প্রশ্ন করিতেছিলেন। শীতের প্রাদুর্ভাবের জন্যই হোক, আর ভয়ের জন্যই হোক, নবীন কাঁপিতেছিল। কক্ষটি রুদ্ধ, নবীনের অঙ্গে একখানা মোটা কম্বল ছিল, তথাপি সে কাঁপিতেছে। তাহার সম্মুখে একখানা কুশাসনে ত্রিবিক্রম বসিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গে গরদের একখানা সূক্ষ্ম নামাবলী। নবীনের সম্মুখে একখানা তাম্রকুণ্ড। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "নবীন আবার আসিয়াছ কেন?" নবীন হাতজোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, বড়-কর্ত্তার ভয়ে।" "আমার হস্তে পড়িয়া তোমার কি অবস্থা হইয়াছিল সে কথা হরনারায়ণকে বলিয়াছিলে?" "আজ্ঞে বলিয়াছিলাম কিন্তু বড়-কর্ত্তা হুকুম করিলেন, নবীন, তুমি ভোল ফিরাইয়া যাও।" "এখন তুমি কি করিতে চাহ?" "দেবতা যাহা হুকুম করিবেন।" "দেখ নবীন, দুইবার তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, এবার আর ছাড়িব না। তাম্রকুণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ।" নবীন ত্রিবিক্রমের পা জড়াইয়া ধরিয়া

শুইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ঠাকুর, এই বারটি মাপ করুন, ঐ জলের ভিতরে আগুন দেখিলে আমি সাতদিন ধরিয়া মাথা তুলিতে পারি না। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

সহসা ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মনে হইল যে, ত্রিবিক্রমের নয়ন-কোণ হইতে উজ্জ্বলবহ্নির শিখা বাহির হইয়া তাম্রকুণ্ডের জলে অগ্নি-সংযোগ করিল। নবীন বসিয়া পড়িল, তাহার হস্তদ্বয় চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। ত্রিবিক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?" নবীন মন্ত্র-মুগ্ধের মত বলিল, "তাম্রকুণ্ডের জলে আগুন জ্বলিয়াছে।" "দেখ, সতী কোথায়।" "কিরীটেশ্বরীর কাছে, কিরীটকোণার দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে।" ত্রিবিক্রম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সঙ্গে কে কে আছে?" নবীন কহিল, "ডাহাপাড়ার বিদ্যালঙ্কার ঠাকুরের মেয়ে দুর্গা, সুদর্শন ঠাকুরের বৌ, সরস্বতী বৈষ্ণবী, বড়-কর্ত্তার লাঠিয়াল কালীমাল আর ভুবন বাগদী; আর একটি বুড়া মেয়ে লোক, তাহাকে আমি চিনি না।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রিবিক্রম চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কিন্তু তখনই আবার শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসীম কোথায়?" অল্প-ক্ষণ পরে নবীন কহিল, "অনেক দূর, দিল্লী। আজমীর দরওাজার পার্শ্বে একটা বড় ভাঙ্গা বাড়ী, সেখানে একটা ছোট কামরায় হরিদাস বাবাজী আর মণিয়া বাঈজী বসিয়া আছে।" ঘরের

দুই ধারে দুইখানা খাটিয়া, তাহার একখানায় ছোট কর্ত্তা শুইয়া আছেন। ছোট কর্ত্তার বোধ হয় চোট লাগিয়াছে, কারণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত। আর একজন লোক আর একখানা খাটিয়ায় শুইয়া আছে, তাহারও সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কিন্তু আমি তাহাকে চিনি না।"

ত্রিবিক্রম তাম্রকুণ্ডে ফুৎকার দিলেন, অগ্নি নিভিয়া গেল, তাহার আদেশে নবীনদাস চক্ষু মেলিয়া চাহিল কিন্তু উঠিতে পারিল না। তাহাকে সেই কক্ষে কুশাসনের শয্যায় শয়ন করিতে বলিয়া ত্রিবিক্রম বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন। সূর্য্যোদয়ের পরে ষোল জন বাহক একখানা প্রকাণ্ড শিবিকা লইয়া আসিল। ত্রিবিক্রম দরবারে যাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে দরবার শেষ হইয়া গেল, সে দিন অমাবস্যা। সভার শেষে ত্রিবিক্রম দর্পনারায়ণকে জনান্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুড়া, এখনও কি উপবাস করিয়া থাক?" বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন বাপু? পঞ্চাশ বৎসরের অভ্যাস কি এক দিনে যায়?" "চল, কিরীটেশ্বরী-মা'র পূজা দিয়া আসি।" "কখন যাইবে?" "চল, এখনই যাই।" "চল, তবে বাড়ী হইয়া যাই।"

খালসার দেওয়ান ও প্রধান কানুনগোইয়ের পাল্কী এক সঙ্গে চেহেলসেতুন প্রাসাদ পার হইয়া গেল, হরনারায়ণ তাহা দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৃতীয় প্রহর বেলায় লালবাগের ঘাটে পাঁচখানা পাল্কী এক সঙ্গে পার হইল,

দুইখানা বড় বড় খেয়ার নৌকা এক সঙ্গে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে পার করিতে হইল। একজন বৃদ্ধ মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "এত পাল্কী কোথায় যাইবে ভাই?" একজন বাহক বলিল, "কিরীটেশ্বরী যাইবে ও আসিবে, তোরা সব নৌকা ঠিক করিয়া রাখিস্ ভোর-রাত্রে আবার পাল্কী পার করিতে হইবে।"

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

আবদুল্লা খাঁ

আগ্রার যুদ্ধের একমাস দুইদিন পরে বাদশাহ্ ফর্রুখ্‌শিয়র দিল্লী হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত খিজিরাবাদ নামক স্থান হইতে জলুস করিয়া আসিয়া শহরের দিল্লী দর্‌ওয়াজা দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। এই জলুসে বাদশাহের হস্তীর পশ্চাতে আর একটি হস্তীর উপরে একজন লোক বংশদণ্ডের অগ্রভাগে মৃত বাদশাহ্ জহান্দার শাহের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া গিয়াছিল এবং আর একটি হস্তীর লাঙ্গুলে মৃত উজীর জুল্‌ফীকার খাঁর মৃতদেহ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অসীম ও ফরীদ খাঁকে লইয়া হরিদাস বৈরাগী, সুদর্শন ও ভূপেন আগ্রার যুদ্ধের দুই দিন পরেই দিল্লী যাত্রা করিয়াছিল। নূতন বাদশাহ্ যেদিন প্রথম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, অসীম তখন কতকটা সুস্থ হইয়াছিল, সে দিল্লী

দর্ওয়াজার পাশে দাঁড়াইয়া সুদর্শন ও ভূপেনের সঙ্গে শোভাযাত্রা দেখিল।

নূতন বাদশাহ সিংহাসন লাভ করিলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান ও অপ্রধান কর্ম্মচারীরা কর্ম্মচ্যুত হইতেন, কাহারও বা পদবৃদ্ধি হইত এবং কেহ বা আমীর হইতে পথের ভিখারী হইতেন। বাদশাহ্ ফর্রুখ্শিয়র নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। অসীম রায় ও ফরীদ খাঁর কথা কেহ তুলিল না, কারণ অসীম রায় খাস বাদশাহের বন্ধু এবং সেই বাদশাহ্ সাম্রাজ্য পদ লাভ করিয়া দুর্দ্দিনের বন্ধুদের বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

বল পাইয়া অসীম একদিন দরবারে হাজির হইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পরিচিত লোক খুঁজিয়া পাইলেন না। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ 'কুতব্-উল্-মুল্ক্' উপাধি পাইয়া বাদশাহের প্রধান উজীর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত অসীমের বিশেষ পরিচয় ছিল না। সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ আগ্রার যুদ্ধে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং অসীম তাঁহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। দিল্লী দুর্গের মধ্যে অসীমের সঙ্গে আফ্রাসিয়ব্ খাঁর সাক্ষাৎ হইল কিন্তু খাঁ-সাহেব সেই দিন সাম্রাজ্যের তৃতীয় বখ্শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অসীমকে চিনিতেই পারিলেন না। অসীম বিরক্ত হইয়া চাকরীর চেষ্টায় দক্ষিণদেশে যাইবার মতলব করিলেন। সুদর্শন ও ভূপেন স্থির করিলেন যে, ফরীদের চেতনা ফিরিয়া আসিলেই তাঁহারা গোয়ালিয়র ও মান্দুর পথে দাক্ষিণাত্য যাত্রা

করিবেন। একদিন দিল্লী দুর্গের আজমীর দর্ওয়াজায় নহবত-খানার নিম্নে অসীমের সঙ্গে আহ্ম্মদবেগের সাক্ষাৎ হইল। আহ্ম্মদ বেগ তখন গাজীউদ্দীন উপাধি পাইয়াছে কিন্তু তথাপি সে ফর্রুখ্‌সিয়রের পূর্ব্ব বন্ধুকে চিনিতে পারিল। অসীমের দিল্লী পরিত্যাগের সঙ্কল্প শুনিয়া নূতন গাজীউদ্দীন খাঁ বাদশাহের নূতন বন্ধু শরীয়ৎউল্লা বা মীর জুম্‌লাকে ধরিয়া অসীম রায়ের আরজী বা দরখাস্ত দরবারে পেশ করিল। আগ্রা যুদ্ধের তিন মাস পরে অসীম বাদশাহের দর্শন পাইলেন, মীর জুম্‌লা তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে লইয়া গেলেন। অসীমের উপরে হাজার টাকা মূল্যের খেলাত বা পরিচ্ছদ বর্ষিত হইল, তিনি এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং সুবা বাঙ্গালায় বাদশাহের যে খালসা পরগণাগুলি ছিল তাহার মধ্যে সরকার জন্নতাবাদের অন্তর্গত রোহনপুর গ্রাম জায়গীর পাইয়া বাঙ্গালা ফিরিবার আদেশ পাইলেন। সেই দিন বাদশাহের শিশু-পুত্র ফর্খন্দাবখ্‌ৎ সুবা বাঙ্গালার নাজিম বা সুবাদার নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নামে কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য নবাব জাফরকুলী খাঁ বা মুর্শিদকুলি খাঁ নায়েব নাজিম নিযুক্ত হইলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার সুবাদারী পদলাভ করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ জাফরখান নাসীরী উপাধি পাইলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সনন্দ ও নিজের জায়গীরের ফর্‌মন লইয়া অসীম মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিবার আদেশ পাইলেন।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অসীম দেখিলেন যে দীর্ঘকাল পরে

ফরীদ খাঁর চেতনা ফিরিয়াছে। সু-সংবাদ শুনিয়া সেই দিনই অসীম ভূপেন ও সুদর্শনের সহিত মুর্শিদাবাদ যাত্রার দিন স্থির করিলেন। সন্ধ্যাকালে মণিয়া কোথা হইতে একটা সারেঙ্গী আনিয়া ফরীদের শয্যার পার্শ্বে সুর বাঁধিতে বসিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, এ কি করিতেছ?" মণিয়া বলিল, "ওস্তাদ, ফরীদ আজ সারাদিন ঘুমাইয়াছে, হকীম বলিয়া গেল তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতে হইবে। সেই জন্য গান গাহিব মনে করিয়াছি। ফরীদ ভাই, গান শুনিবি?" ফরীদ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে গান শুনিতে চাহে। গান শুনিতে শুনিতে ফরীদ ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অসীম আসিয়া মণিয়াকে বলিলেন, "মণিয়া, তোমার সঙ্গে গোটাকতক প্রয়োজনীয় কথা আছে, তুমি একবার বাহিরে আইস।" মণিয়া এস্রাজ রাখিয়া উঠিয়া গেল।

তখন শীত কমিয়া আসিতেছিল, তথাপি বৃদ্ধ হরিদাস দ্বিতলের আর একটা কক্ষে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বসিয়াছিল, মণিয়াকে লইয়া অসীম হরিদাসের নিকটে গেলে বুড়া বৈরাগী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর বাবা?" অসীম কহিলেন, "খবর তো সুদর্শনের কাছে শুনিয়াছ বাবাজী।" হরিদাস কহিল, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমরা কবে দেশে যাইবে?" অসীম কহিলেন, "আমরা কাল যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। তোমার কাছে ফরীদ খাঁকে রাখিয়া আমি মণিয়াকে দেশে লইয়া যাইতে চাহি। আমি তাহাকে না জানিয়া পিতৃ-

গৃহ পরিত্যাগ করাইয়াছি, আমিই তাহাকে পাটনায় তাহার মায়ের কাছে ফিরাইয়া দিতে চাহি।” হরিদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “বাবা, যে জিনিষটা ইচ্ছা কর তাহা কি তখনই করিতে পার? আমি মণিয়াকে পিতৃগৃহে পৌছাইয়া দিবার জন্য সূতীগ্রাম হইতে পাটনায় আসিয়াছিলাম কিন্তু মণিয়া পিতৃগৃহে রহিল কই? তোমার বা আমার ইচ্ছার উপরে মনিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না। গোপালের যখন ইচ্ছা হইবে তখন মণিয়া পাটনায় ফিরিয়া যাইবে।” অসীম বিরক্ত হইয়া মণিয়াকে কহিলেন, “মণিয়া, আমি অনুরোধ করি, তুমি আমার সঙ্গে পাটনায় ফিরিয়া চল।” মণিয়া সেলাম করিয়া কহিল, “তস্‌লিমৎ হুজুর, এখন ফরীদভাইকে ফেলিয়া স্বর্গে যাইতেও পারিব না।” হরিদাস আবার হাসিল, অসীম অত্যধিক বিরক্ত হইয়া হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবাজী, তবে মণিয়া রহিল, তাহার ও ফরীদের জন্য খরচপত্র কত লাগিবে?” হরিদাস কহিল, “এসকল গোপালের খরচ, গোপালই চালাইবেন; বাবা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও, গোপাল তোমার মঙ্গল করুন। খরচ-পত্র তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না।”

পরদিন মধ্যাহ্নে ভূপেন ও সুদর্শনের সহিত বাদসাহের সনন্দ ও ফরমান লইয়া অসীম মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

কিরীটেশ্বরী

সরস্বতী বৈষ্ণবী ও হরনারায়ণের লাঠিয়ালগণ সমস্তদিন সেই দীর্ঘিকার পাড়ে জীর্ণ মন্দিরের চারিদিকে বসিয়া রহিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে স্ত্রীলোকগুলিকে লইয়া স্বচ্ছন্দে ডাহা-পাড়ায় চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু গেল না। সমস্ত দিন স্ত্রীলোকগুলি অভুক্ত রহিল, কেবল সরস্বতী সুবিধা পাইয়া উঠিয়া বল সঞ্চয় করিয়া আসিল। সন্ধ্যার সময়ে দুর্গা বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা হরনারায়ণের আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। তখন তিনি স্নানের অছিলায় সতী ও বড়বধূকে সঙ্গে লইয়া দীর্ঘিকায় নামিলেন। সরস্বতী তীরে দাঁড়াইয়া রহিল এবং লাঠিয়াল দুইজন দূরে তালবৃক্ষের অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে দূরে বহু মনুষ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। লাঠিয়াল দুইজন স্থির করিল যে হরনারায়ণ পাল্কী পাঠাইয়াছেন। লোকজন নিকটে আসিলে তাহারা দেখিতে পাইল যে, পাল্কী মোট দুইখানি, কিন্তু সঙ্গে লোকলস্কর অনেক। তখন একজন লাঠিয়াল হাঁকিল, "কোথাকার পাল্কী?" একজন অগ্রগামী মশালধারী উত্তর করিল, "মুর্শিদাবাদের। হুজুর খালসার দেওয়ান ও কানুনগোই সাহেবের পাল্কী, লোক তফাতে।"

লাঠিয়ালেরা জানিত যে, হরনারায়ণ একজন কানুনগোই সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে, হরনারায়ণ স্বয়ং আসিয়াছেন।

পাল্কী দুইখানা দীর্ঘিকার নিকটে আসিলে তাহারা পাল্কী থামাইতে বলিল এবং দর্পনারায়ণ ও ত্রিবিক্রম নামিলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "হুজুর, সমস্ত গ্রেপ্তার।" পুরস্কারের পরিবর্ত্তে ত্রিবিক্রম যখন তাহাদিগকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন তখন আর তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পাল্কী হইতে নামিয়া দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু হে, এসকল কি? মুর্শিদাবাদে আসিয়াও ঢাকাই চাল ছাড় নাই দেখি!" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, চালটি এবং লাঠিয়াল দুইটি আমার বাল্যবন্ধু হরনারায়ণ রায়ের এবং গ্রেপ্তার হইয়াছে আমার স্ত্রী এবং হরিনারায়ণের কন্যা ও পুত্রবধূ।" ত্রিবিক্রমের কথা শুনিয়া দর্পনারায়ণ এত অধিক বিস্মিত হইলেন যে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। যখন তাঁহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিবিক্রম, তোমার স্ত্রী? আবার বিবাহ করিলে কবে? এবং তাহার সহিত দুর্গার কোথায় সাক্ষাৎ হইল?" ত্রিবিক্রম বলিলেন, "সূতীগ্রামে গতবৎসর বিবাহ করিয়াই সংসারে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছি নতুবা এতদিন চিতাগ্নিতে রন্ধন করিয়া আহার করিতাম এবং চিতাভস্মে শয়ন করিতাম।" "আমরাও তো তাহাই শুনিয়াছিলাম কিন্তু দুর্গাকে কোথায় পাইলে?" "হরিনারায়ণ আমার সহিত পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিতে-ছিল, পথে ঝড়ে নৌকা মারা যাওয়ায় সূতীগ্রামে আমার শ্বশুর-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। আমরা দুইজন, স্ত্রীলোকদিগকে

সূতীগ্রামে রাখিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম।" "হরনারায়ণ ইহাদিগকে বন্দী করিল কেন?" "সে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব খুড়া? কাল নবাব দরবারে হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার অসীনরায়ের আরজী পেশ করিবে সেই সময় হয় তো সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। উপস্থিত আপনি আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ইজ্জত রক্ষা হইয়াছে।"

দর্পনারায়ণ আর কিছু না বলিয়া দীর্ঘিকার পাড়ে উঠিয়া ডাকিলেন, "দুর্গা, ও দুর্গা! আমি দর্পঠাকুরদাদা, তোর কিছু ভয় নাই, আমার কাছে আয়।" লোকজনের গোলমাল শুনিয়া দুর্গা গলাজলে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, দর্পনারায়ণের আহ্বান শুনিয়া বড় বধূ বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে কে ডাকিতেছে।" দুর্গা বলিলেন, "বোধ হয় আমাদিগকে ছল করিয়া জল হইতে তুলিবার জন্য কেহ দর্পঠাকুরদাদার নাম করিয়া ডাকিতেছে। আমাদের উঠিয়া কাজ নাই।" এই সময়ে দুই জন মশালচী দুইটা মশাল আনিয়া দর্পনারায়ণের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং আলোকে শুভ্রকেশ বৃদ্ধকে দেখিয়া দুর্গা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "বৌ, এত ছলাকলা নয়, সত্য সত্যই যে দর্পদাদা দেখিতেছি?" দুর্গা উঠিলেন এবং সিক্তবস্ত্রে দর্পনারায়ণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সত্য সত্যই যে দুর্গা দেখিতেছি। ত্রিবিক্রম, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অগ্রহায়ণের প্রথমে উত্তর-রাঢ়ে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিলক্ষণ

শীত পড়ে। রজনীর প্রথম যামে উত্তর রাঢ়ের মুক্ত সুদীর্ঘ প্রান্তরে প্রবল শীত বায়ু বহিতেছিল, দুর্গা শীতে কাঁপিতেছিল, তাহা দেখিয়া দর্পনারায়ণ মহিলাদিগকে মন্দিরে পাঠাইয়া দিয়া নিজের ও ত্রিবিক্রমের গরদের জোড় পাঠাইয়া দিলেন এবং ত্রিবিক্রমকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিবিক্রম, এখন কোথায় আশ্রয় লওয়া যায়?" ত্রিবিক্রম কহিলেন, "কেন, মায়ের মন্দিরে!" "বাছারা যে সমস্ত দিন কিছু খায় নাই।" "পূজা দিতে আসিয়াছে, খাইবে কি খুড়া! হিন্দুর মেয়ে একদিন না খাইলে মরিবে না।" "মন্দির আর কতদূর?" "অর্দ্ধক্রোশ।" "তবে তুমি মেয়েদের পাল্কীতে উঠাইয়া দাও, আমরা দুইজন হাঁটিয়াই চলিতেছি।"

মহিলা চতুষ্টয়কে দুইখানি পাল্কীতে উঠাইয়া দিয়া ত্রিবিক্রম ও দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চেহেল সতুন প্রাসাদ নির্ম্মাণকালে মুর্শিদাবাদের দশক্রোশ সীমার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত দেবমন্দির সুবাদারের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল, সুতরাং যে কষ্টিপাথরের মন্দির মধ্যে মহাপীঠের চিহ্নস্বরূপ প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত হইত তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র চারিদিকে পড়িয়াছিল। সকলে মন্দিরের অদূরে এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অমানিশার দ্বিতীয়প্রহর অতীত হইলে পূজা ও বলি সাঙ্গ করিয়া দর্পনারায়ণ ত্রিবিক্রমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, হরনারায়ণ এমন কাজ করিল কেন?" ত্রিবিক্রম হাসিয়া কহিলেন, "খুড়া, আমি দুইদিন অসীম সম্বন্ধে

কথা কহিয়া হরনারায়ণের মনের ভাব জানিয়া লইয়াছি, সে মনে করে যে মিথ্যা কথা বলিয়া সে আমাকে প্রতারণা করিতে পারে কিন্তু আমি যে তাহার মনের ভাব কেতাবের হরফের মত পড়িতে পারি তাহা সে বুঝিতে পারে না।" "সে চাহে কি?" "সে চাহে আমাকে মুর্শিদাবাদ হইতে দূর করিতে আর হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারকে দেশান্তরিত করিতে।" "তাহাতে ফল হইবে কি?" "খালসার দেওয়ানী পদটার উপরে তাহার অনেক দিন ধরিয়াই লোভ ছিল কারণ গৌড়ের জায়গীর যে কতদূর মূল্যবান তাহা দিল্লীতে এখনও কেহ জানে না। বাঙ্গালা দেশ নিরুপদ্রব করিয়া রাখিতে পারিলে বাঙ্গালার মাটিতে যে সোনা ফলে, এক সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব দিয়া কাশ্মীর ও মালব সুবা খরিদ করা যায়, তাহা দিল্লীর খালসার সেরেস্তা এখনও বোঝে নাই। বুঝিয়াছে মুর্শিদকুলী, কারণ সে দক্ষিণের ছয় সুবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে আর বুঝিত আজীম উশ্‌শান। তুরানী মোগল কেবল ঝগড়া করিতে জানে কিন্তু দেশ শাসন করিতে জানে ইরাণী আর সে পায়সা খরচ করিতে শিখিয়াছে হিন্দুস্থানী মুসলমান।" "কথাটা সত্য বটে ত্রিবিক্রম, কিন্তু হরিনারায়ণের কন্যা ও পুত্রবধূকে হরণ করিয়া হরনারায়ণের কি হইবে?" "স্বর্গগত হরিনারায়ণ খুড়া মৃত্যুকালে বিষয়-আশয়ের দানপত্র হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারকে দিয়া গিয়াছিলেন, রুকনপুর পরগণা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার জন্য হর ভাই দুইটির সহিত হরিনারায়ণকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়াছিল।

বিদ্যালঙ্ক পাগল মানুষ, সে চিরকাল দাবাখেলা লইয়াই ব্যস্ত, বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাঁহার স্মরণ ছিল না যে দলীল দস্তাবেজ তাহার নিকটেই আছে। সে কথা স্মরণ হওয়ায় সে পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য হর এখন তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূকে ধরিয়া রাখিয়া তাঁহাকে নিজের কব্জার মধ্যে রাখিতে চাহে।" "তবে আর রাত্রিকালে ফিরিয়া কাজ নাই, সকালে আর চারিখানি পাল্কী আনাইয়া একত্র যাওয়া যাইবে।"

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

সুবাদারের বিচার

বাদশাহের দরবার হইতে বিদায় হইবার দুইমাস পরে অসীম মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে পৌছিল। সংবাদ পাইয়া হরিনারায়ণ ও ত্রিবিক্রম নগরের বাহিরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বৃদ্ধ দর্পনারায়ণ রায় নিজে আসিতে না পারিয়া একজন আমলা পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিবিক্রমের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া অসীম ডাহাপাড়া যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। হরিনারায়ণ জানাইলেন যে, পরগণে কঙ্কণপুরের দশ আনা তেরগণ্ডা দখলের দরখাস্ত পেশ হইয়াছে, হরনারায়ণ অসীম রায়কে

সাক্ষ্য মানিয়া আরঙ্গজীর হুকুমনামা বিলম্ব করাইতেছে। অসীম শুনিয়া হাসিল।

একদিন পরে নিয়মমত জলুস করিয়া অসীম বাদশাহী সনন্দ ও ফরমান মুর্শিদকুলী খাঁকে দিতে চলিলেন। মোগল বাদশাহী আমলে বাদশাহের ফরমান বা সনন্দ যে দিতে আসিত সে বাদশাহের ন্যায় সম্মান পাইত। অসীম নিজে হাতীতে চড়িয়া চলিল, তাহার সম্মুখে চব্বিশজন হরকরা আসাসোটা ও নিশান লইয়া চলিল। পশ্চাতে অসীমের সৈন্যদলের পঞ্চাশজন সওয়ার চলিল। এই জলুস একেবারে চেহেল সতুন দরবার কক্ষের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। অন্যদিন অসীমকে মুর্শিদাবাদের ত্রিপলীয়া দরওজায় হাতী হইতে নামিতে হইত কিন্তু অদ্য তিনি বাদসাহের পত্র লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ নাসীরী নিজে দরবারের দুয়ারে আসিয়া অসীমের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বাঙ্গালার প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। অসীম হাতী হইতে নামিলে মুর্শিদকুলী খাঁ তিনবার তাহাকে কুর্ণিশ করিয়া মখমলের থলিয়ায় আবদ্ধ বাদশাহী ফরমান ও সনন্দ তাহার নিকট হইতে লইলেন এবং তাহা একখানা সোনার থালায় রাখিয়া দিল্লীর দিকে ফিরিয়া তিনবার কুর্ণিশ করিলেন। গোলামেরা আসিয়া থালার উপর ছাতা ধরিল, খোজারা স্বর্ণের আসাসোটা মাহী, মরাতব প্রভৃতি নানা আকারের রাজচিহ্ন লইয়া দুইধারে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। নকীব হাঁকিল,

"ফর্‌মান রওয়ান শাহানশাহ্‌ বাদশাহ্‌-ই-গাজী আবুল মোজাফ্‌ফর মহম্মদ ফর্‌রুকসিয়স সুলতান-উস্‌-সলাতীন নাসীর-আমীর-উল-মৌমীনীন্‌।"

সুবাদারের শোভাযাত্রা চেহেল সতুন দরবারের দরওজা হইতে মসনদ পর্য্যন্ত পৌছিল, হরকরাগণ পথ ছাড়িয়া চারিদিকের দেওয়ালে সারি বাধিয়া দাঁড়াইল। মুর্শিদকুলী খাঁ নায়েব নাজিম সৈয়দ আক্রাম খাঁর হস্তে সুবর্ণথালা দিয়া মখমলের থলিয়ার উপরের বাদশাহী মোহর কাটিয়া ফেলিলেন এবং মোহরটি সযত্নে নিজের পাগড়ীর উপর রাখিয়া বাদশাহী ফরমান ও সনন্দ পড়িলেন। ফরখন্দা বখ্‌তের সুবাদারীর সনন্দ, নিজের উড়িষ্যা সুবার সুবাদারীর সনন্দ, সুজাউদ্দিনের উড়িষ্যার নায়েব সুবাদারীর সনন্দ, নিজের বাঙ্গালা সুবার নায়েব সুবাদারীর সনন্দ ও ফরমান পাঠ করিয়া নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ অসীম রায়ের নূতন জায়গীরের ফর্‌মান পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফর্‌মানের নিম্নে একটুকরা অতি সূক্ষ্ম কাগজে একটি পার্শী কবিতা লিখিত ছিল—

"সাধুর কবরের উপরের কাঁটাগাছ সুন্দর গোলাপ অপেক্ষা সুন্দর, রাজার পদের ছিন্ন পাদুকা মণিমুক্তা শোভিত নূতন পাদুকা অপেক্ষা সম্মানের পাত্র, এই কাফের যুবা বাদশাহের যুদ্ধে বাদশাহের গোলাম হুসেন আলী খাঁর সহিত স্বর্গে যাইতেছিল কিন্তু এখনও তাহার দুনিয়ায় কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই বলিয়া খোদা তাহাকে হুসেন আলীর নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

"বনামে কুতুব-উল-মুল্ক আবদুল্লা সৈয়দ-ই-বাহো
বন্দা-ই বন্দে গান্ বখীদ্‌মতে ফররুক শাহ্ ।"

অন্যমনস্ক হইয়া কবিতা দুইটি পড়িয়া নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ একটু হাসিলেন, ক্ষুদ্র হরনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রতর হইয়া দর্পনারায়ণ ও সৈয়দ আক্রমখাঁর মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। বাদশাহী সনন্দ ও ফরমান পাঠ শেষ হইয়া গেলে মুর্শিদ কুলী খাঁ কাট্‌রা মসজিদের পেশইমাম সৈয়দ আফজল খাঁকে নূতন বাদশাহের নামে খোৎবা পাঠের আদেশ দিলেন, শেঠ মাণিক চন্দ মুর্শিদাবাদ জহাঙ্গীর নগর ও কটক টাঁকশালে নূতন টাকা ছাপাইবার আদেশ পাইলেন। এই সময় দরবারের আরজ্ বেগী উঠিয়া জানাইলেন যে, নূতন মনসবদার আমীর অসীম রায় বাহাদুরের নামে যে আরজী পেশ আছে, আরজদারের জবানবন্দী লইয়া তাহার উপর হুকুম দিতে হুকুম হয়। চতুর মুর্শিদ কুলী খাঁ আবার একটু হাসিলেন। আরজবেগী আরজী পড়িল, প্রধান কানুনগোই দর্পনারায়ণ রায় অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমীর সাহেব, আপনি কি আপনার পৈত্রিক তালুকের অংশ কানুনগোই হরনারায়ণ রায়ের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন?" অসীম কহিল, "হাঁ, দিয়াছিলাম কিন্তু তখন আমি জানিতাম না যে আমার পিতা মৃত্যুকালে রুকণপুর পরগণা দেবতাকে দান করিয়াছিলেন এবং আমরা তিন ভাই সেবাইত মাত্র। আমাদের দান-বিক্রয়ের অধিকার ছিল না।" দর্পনারায়ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুকনপুর খালসার পরগণা, কানুনগোই হরনারায়ণ

রায় এখন তাহার ষোল আনা দাবী করিতেছেন এবং অসীম রায়ের দানপত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সহি মোহর হইয়া গেলেও হস্তান্তর বাদশাহ্ দরবারে মুস্তৌফী বা দিউয়ানী-ই-কুলকে জানানো হয় নাই কেন?" মুর্শিদ কুলী খাঁ একবার হরনারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন কিন্তু হরনারায়ণ উত্তর না দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নায়েব স্ববাদার হুকুম দিলেন, "দানপত্র নাকচ, রুকনপুর পরগণা আলমগীর বাদশাহের হুকুম মত হরিনারায়ণ রায়ের তিন পুত্রের নামে সমান ভাবে লেখা যায়।" সভার সকলে "কেরামত কেরামত" বলিয়া স্ববাদারকে ধন্যবাদ দিল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল, সভাভঙ্গ হইল। ত্রিবিক্রম হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কার ও অসীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন ডাহাপাড়ায় গিয়া ঘরবাড়ী দখল কর।" এই সময় দর্পনারায়ণ আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিবিক্রম বলিলেন, "খুড়া, অসীমকে এখন পৈত্রিক ভিটা দখল করিতে বলিতেছি, তুমি কি বল?" দর্পনারায়ণ কহিলেন "ঠিক কথাই বলিয়াছ। বিদ্যালঙ্কার তুমিও কন্যা পুত্র বধূ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও, কতদিন আর দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিবে?" বিদ্যালঙ্কার বলিলেন, "সুদর্শন আসিলে বৌমাকে দেশে পাঠাইয়া দিব কিন্তু আমি আর ডাহাপাড়া গ্রামে বাস করিতে যাইব না। হরের দর্প চূর্ণ করিয়াছি, স্বর্গগত হরিনারায়ণ রায়ের আদেশ পালন করিয়াছি, এখন নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কাশী যাইব। অসীম, তোমার নিজস্ব তুমি

ফিরাইয়া পাইয়াছ। যখন গ্রামে যাইবে তখন আমার ভিটা দখল করিয়া রাখিও। সুদর্শনকে তোমার হাতে দিয়া গেলাম, ভিটা দখল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইও। সে দুর্ব্বল, তাহাকে রক্ষা করিও। দুর্গাকে লইয়া এখনই কাশী যাত্রা করিলাম।”

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি ক্ষুদ্র পান্সী পাল উঠাইয়া তীর বেগে উত্তর দিকে ছুটিল।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

ঝড়

অসীমের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অসীম স্ত্রী ও ভ্রাতার সহিত ডাহাপাড়া গ্রামে বাস করেন, সুদর্শন গান বাঁধিয়া সময় অতিবাহিত করে। অসীমকে রাজকার্য্যে বাঙ্গালার নানাস্থানে যাইতে হয়, তখন ভূপেন্দ্র বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। হরনারায়ণ স্বতন্ত্র ঘরে বাস করেন কিন্তু তাঁহার পত্নীর সহিত অসীমের স্ত্রী শৈলর প্রগাঢ় প্রেম। শীতের প্রারম্ভে দিল্লী হইতে বাদশাহের সহিত কুতব-উল-মুল্ক সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এবং হুসেন আলী খাঁর বিবাদের সংবাদ আসিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রাজকর্ম্মচারীগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে একজন আহদী দিল্লী হইতে অসীমের নামে একখানা পত্র লইয়া আসিল, তাহা পাঠ করিয়া অসীম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি

ভূপেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া একখানি ক্ষুদ্র পাল্কীতে গঙ্গা পার হইয়া ত্রিবিক্রমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শৈল অসীমের উদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া জায়ার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। হরনারায়ণের পত্নী তাঁহার বিশাল নাসিকায় বিশাল নথ দুলাইয়া বলিলেন, "এতদিন যে ছোটকর্ত্তা কি করিয়া প্রাণের দুর্গা-ঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া আছে তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।" শৈল কহিল, "দিদি, সরস্বতী সন্ধান লইয়া জানিয়াছে যে, লোকটা দিল্লী হইতে আসিল।" "ও সকল বাজে কথা ভাই, বাদশাহ অনেক কাল ছোট কর্ত্তাকে ভুলিয়া গিয়াছে। ছোট কর্ত্তা এখন বাদশাহের নাম করিয়া দুর্গার সহিত রাসলীলা করিতে চলিল। তুই যদি এখন ভাল চাহিস তাহা হইলে সঙ্গে যা।"

হরনারায়ণের স্ত্রী তাহাকে যাহা বুঝাইলেন শৈল তাহাই বুঝিল। বিপদে পড়িয়া ফর্‌রুখ্‌সিয়র অসীম ও ভূপেন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছিলেন। যখন মীরজুম্‌লা প্রভৃতি সারশূন্য চাটুকারগণ সৈয়দ আব্দুল্লা ও হুসেন আলী খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিল না এবং তিনি যখন শুনিলেন যে, আব্দুল্লা খাঁর আহ্বানে সৈয়দ হুসেন আলী খাঁ আওরঙ্গাবাদ হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন তখন তিনি বুঝিলেন যে, এইবার ময়ূরসিংহাসনে বসিয়াও তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, তখন বাল্যের বন্ধু, পিতৃ-বন্ধু যাঁহাকে যাঁহাকে মনে পড়িল, হতভাগ্য বাদশাহ প্রাণভয়ে তাঁহাদিগকেই দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অম্বরের মহারাজা

জয়সিংহ কছ্‌বাহা, যোধপুরের মহারাজা অজিতসিংহ রাঠোর, দ্বিতীয় মীরজুম্‌লা উপাধিধারী শরীয়ৎউল্লা খাঁ হইতে ক্ষুদ্র অসীম রায় পর্য্যন্ত সকলেই দিল্লীতে আহূত হইলেন।

পরামর্শ অনুসারে শৈল স্থির করিয়া রাখিল যে, অসীম ডাহাপাড়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই সে সঙ্গে যাইবে। ত্রিবিক্রমের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া অসীম যখন বলিলেন যে তাঁহাদের দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া শৈল বলিল, "তোমরা তো ঘোড়ায় যাইবে, আমি কিসে যাইব?" অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে?" শৈল হাসিয়া বলিল, "আমি এই শত্রু-পুরীতে একা বাস করিতে পারিব না, তুমি যেখানে যাইবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" অসীম শৈলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না। অবশেষে অসীম বলিলেন, "তবে চল তোমাকে সূতীগ্রামে রাখিয়া যাই।" উত্তরে শৈল বলিল, "সকলের মুখেই শুনিয়াছি যে, আমার শ্বশুর বংশের কোন বউ বড় হইয়া বাপের বাড়ী যায় না, এখন আমি গেলে জ্ঞাতিরা নিন্দা করিবে।" "দিল্লী ঘোড়ার ডাকে একমাসের পথ, পাল্কীতে গেলে তিন মাস এবং নৌকায় ছয় মাস। যে বাদশাহের অন্ন খাই, তাঁহার বিপদের সময় তিনি তলব করিয়াছেন, এখন কেমন করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব?" "আমাকে লইয়া না গেলে আমি তোমার পায়ে রক্তগঙ্গা হইয়া মরিব।"

তখন উপায় না দেখিয়া অসীম, ত্রিবিক্রম ও সুদর্শনের সহিত পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল যে দুই খানা পাল্কী লইয়া সুদর্শন ও ভূপেন্দ্রের সহিত অসীম দিল্লী যাত্রা করিবেন। সুবাদারের পরওয়ানা লইয়া পাল্কী বেহারার ডাক বসাইয়া দুই মাসে দিল্লী পৌছানো সম্ভব। অসীম মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট বিদায় লইয়া পরদিন সুদর্শন ও তাহার পত্নী, শৈল ও ভূপেন্দ্রের সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে ত্রিবিক্রম অনেক দূর আসিয়া অসীমকে বলিয়া দিলেন, "রায়জী, বয়স হইয়াছে, হয় তো তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তিনটি কথা মনে রাখিও, বিপৎকালে স্ত্রীলোকের পরামর্শে চলিও না, স্বার্থের জন্য কর্তব্য বিস্মৃত হইও না, জীবন-যৌবন-ধন-সম্পদ সমস্তই অতি তুচ্ছ, স্ত্রী-পুত্র কেহই তোমার নহে, সংসারে কেবল তুমিই তোমার, একা আসিয়াছ, একাই চলিয়া যাইতে হইবে।" পাল্কী দুইখানি ও অসীমের হাজার সওয়ার অদৃশ্য হইয়া গেলে ত্রিবিক্রম আপন মনে কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, হর-নারায়ণই জিতিল।"

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

নিজামউদ্দীন

মাঘ মাসের মধ্যভাগে অসীম দিল্লী পৌছিল। পথে কাশীতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুদর্শন তাহার পত্নীকে

রাখিয়া আসিয়াছিল। দুর্গার ভাব দেখিয়া শৈল আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কারণ একটিবার সম্ভাষণ ব্যতীত দুর্গা অসীমের সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না। কাশী হইতে দিল্লী যাত্রা কালে দুর্গা ভূপেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল, বিপৎসঙ্কুল দিল্লীতে শৈলকে যাইতে নিষেধ করিল, এমন কি তাহাকে কাশীতে থাকিতে অনুরোধ করিল। শৈল মনে করিল এ সমস্ত ছলনা, অসীম একা চলিয়া গেলেই দুর্গা তাহাকে কাশীতে রাখিয়া পলাইবে এবং অন্য পথে অসীমের সঙ্গে জুটিবে। সে কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত দিল্লী যাত্রা করিল।

১১৩১ হিজরার রবি-উস্-সানী মাসের চতুর্থ দিবসে (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে) আব্দুল্লা খাঁ ও হুসেন আলী খাঁ বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইহার দুই দিন পূর্ব্বে অম্বরের রাজা জয়সিংহ এবং বুন্দীর রাজা বুধসিংহ হাড়া দিল্লী ত্যাগ করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। আব্দুল্লা খাঁও হুসেন আলী খাঁর ভয়ে বাদশাহ একে একে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচরগুলিকে দিল্লী হইতে বিদায় করিতেছিলেন। অসীম দরবারে বাদশাহের দর্শন পাইয়া তোগ্‌লকাবাদ বা গাজীয়াবাদে সৈন্য পাঠাইবার আদেশ পাইলেন, রাজা জয়সিংহ দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অসীম তাঁহার পরামর্শ লইয়া তোগলকাবাদের নিকটে ওখ্‌লা গ্রামে সৈন্য পাঠাইলেন। তিনি নিজে দিল্লী দর্ওয়াজার নিকটে সপরিবারে আশ্রয় লইলেন।

হুসেন আলী খাঁ ও আব্দুল্লা খাঁ বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলে সকলেই মনে করিল যে, উজীর ও প্রধান সেনাপতির সহিত বাদশাহের বিবাদ মিটিয়া গেল। অসীম অশ্বারোহণে দিল্লী দর্‌ওয়াজা দিয়া দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া ওখ্‌লা যাত্রা করিলেন। তখন দিল্লীতে ভীষণ শীত। প্রত্যুষে পথে অধিক লোকজন ছিল না। অসীম সূর্য্যোদয় কালে নিজাম-উদ্দীনের সমাধির নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমাধির নিকট একটি পুরাতন কবরের মধ্যে বসিয়া এক রমণী ভজন গাহিতেছিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অসীম ঘোড়া ফিরাইয়া কবরের দিকে চলিলেন।

আলাউদ্দীন খলজী নির্ম্মিত বিরাট মসজিদের প্রাঙ্গনে শুভ্র মর্ম্মরের ক্ষুদ্র সমাধি মন্দিরে বিখ্যাত সাধু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া সমাহিত আছেন। সমাধি মন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে শাহজহান দুহিতার মুক্ত-সমাধি-মন্দির। এই উভয় সমাধির মধ্যস্থলে মর্ম্মরের আচ্ছাদনের উপর বসিয়া এক রমণী সারেঙ্গী বাজাইয়া ভজন গাহিতেছিল। অসীম সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণীর সর্ব্বাঙ্গ হরিৎবর্ণ বস্ত্রের বোর্‌খায় আবৃত, সুতরাং তাহার সহিত বাক্যালাপ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অসীম দূরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। গীত শেষ হইয়া গেল, অসীম মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া গেলেন, রমণী সারেঙ্গী রাখিয়া উঠিল, একটি সুন্দর বালক সারেঙ্গী উঠাইয়া রমণীর হাত ধরিল। এই সময়ে অসীম গিয়া রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রমণী শিহরিয়া

উঠিল এবং বোরখার সম্মুখের আবরণ ফেলিয়া দিয়া সেলাম করিল। অসীম বলিলেন, মণিয়া তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে বাদশাহী সড়ক হইতে ডাকিয়া আনিয়াছে। আমি দিল্লী দরওয়াজা হইয়া ওখ্‌লা যাইতে ছিলাম পথে পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসের মধ্যে তোমার গলার আওয়াজ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মণিয়া, তুমি কি বৃন্দাবন যাও নাই? উত্তরে মণিয়া বলিল, "বৃন্দাবন গিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আমি পরিত্যাগ করিলে ফরীদ ভাই সংসারে স্থির হইয়া থাকিবে না, সেই জন্য বাবাকে বলিয়া, চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী চলিয়া আসিয়াছি। আপনি কবে আসিলেন।" "দুই চারিদিন পূর্ব্বে আসিয়াছি। উজীরের সহিত ঝগড়া আরম্ভ হইলে বাদশাহ আমাদিগকে ফৌজ সমেত তলব করিয়াছেন।" অসীম বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার মূর্ত্তি নয়ন পথে পতিত হইলে মণিয়ার কুরঙ্গনয়ন যেরূপ আনন্দে নাচিয়া উঠিত আজি আর সে ভাবে নাচিল না। তিনি অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, ফরীদ খাঁ কোথায়?" মণিয়া কহিল, "উপস্থিত এইখানেই, আমরা কাল দিল্লী হইতে আসিয়াছি, দুইদিন থাকিয়া ফিরিব। আল্লার কৃপায় ফরীদের মতিগতি ফিরিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়াছি, সে এখন আমীন খাঁ চীনের লস্করে পঞ্চশদী।" "ফরীদ খাঁও কি এখানে আসিয়াছে?" "আসিয়াছে বই কি, ফরীদ ভাই আসিয়াছে, তাহার স্ত্রী আসিয়াছে, এই শিশু ফরীদের জ্যেষ্ঠ

পুত্র।" "তবে চল ফরীদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" "আপনি আজ এই খানেই থাকুন না কেন ?" "চল, থাকিব।"

শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া মণিয়া নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার সমাধির চত্বর পরিত্যাগ করিল, অসীম তাহার অনুসরণ করিলেন। অদূরে একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল কবরের মধ্যে, একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠে ফরীদ খাঁ সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। এখনও যাহারা নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রে আসে তাহারা জীর্ণ সমাধিমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সমাধিমন্দিরে ফরীদ খাঁ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আকবরের রাজ্যকালের একজন বিখ্যাত আমীরের। ত্রিতল সমাধিমন্দির, পশ্চাতে মসজিদ ও চারি পার্শ্বে প্রাচীর। মণিয়া ফরীদের পুত্রকে লইয়া সমাধির মধ্যে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফরীদ খাঁ আসিয়া অসীমকে আলিঙ্গন করিল। দুই চারিটী কথা কহিয়া ফরীদ খাঁ বলিল, "রাজা সাহেব, আপনার ফৌজ কোথায় ?" অসীম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" "দিল্লী হইতে খবর আসিয়াছে যে কিল্লা হইতে কুতব-উল্-মুল্ক আবদুল্লা খাঁ বাদশাহী ফৌজ দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং মহল-সরা দখল করিয়াছে। বাদশাহ এখন বন্দী, সকলেই বিশ্বাস ঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিকাদ খাঁ, গাজীউদ্দীন খাঁ আহমদ বেগ ও বাদশাহের শ্বশুর সাদৎ খাঁ চারিদিক হইতে লোক ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমি এই নিজাম-উদ্দীনে মণিয়ার কাছে স্ত্রী পুত্র রাখিয়া এখনই দিল্লীতে ফিরিয়া যাইব। রাজা সাহেব, আপনি বাদশাহের বন্ধু, আপনি

কি করিবেন?" "আমি কোনও সংবাদ পাই নাই, তবে আপনি যখন ফিরিয়া যাইতেছেন, আমিও যাইব।" "আপনার ফৌজ কোথায়?" "অনেক দূরে ওখলা মণ্ডীতে।" "রাজা সাহেব, আপনি এখনই চলিয়া যান, ফৌজ লইয়া ফিরিয়া আসুন আপনার ফৌজ কি রাজপুত না পাঠান? যে রকম খবর শুনিতেছি তাহাতে আপনার ফৌজে আপনার কথা শুনিবে কিনা সন্দেহ, সমস্ত হিন্দুস্তানী মুসলমান ও রাজপুত নিমক হারাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" "খাঁ সাহেব আমার ফৌজ বাঙ্গালী হিন্দু।" "তবে আপনি এখনই চলিয়া যান, যত শীঘ্র পারেন ফৌজ লইয়া পুরাণ সহরের কাবুল ফটকের কাছে আসিবেন। আমি দিল্লীর খবর লইয়া আপনার জন্য সেই স্থানে অপেক্ষা করিব।"

অসীম তখনই ঘোড়ায় চড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন, ফরীদ খাঁও অশ্বারোহণে উত্তর দিকে যাত্রা করিল।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যের শেষ দিন

১১৩১ হিজরার রবী-উস্-সানী মাসের নবম দিবসে প্রভাতে দিল্লী শহর স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেই শুনিল যে নগরী

হুসেন আলী ও আবদুল্লা খাঁর হস্তগত, বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌সিয়র প্রাসাদে বন্দী। কেহ বলিল যে বাদশাহের শ্বশুর যোধপুরের রাজা অজিৎ সিংহ জামাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আবদুল্লা খাঁকে হত্যা করিয়াছেন। কেহ বলিল চীন কিলিচ খাঁ নিজাম-উল-মুলক্‌ ও আমীন খাঁ চীন বাদশাহকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু পরে লোক দেখিতে পাইল যে এই দুইজন বিশ্বাসঘাতী তুরাণী মোগল সেনাপতি বাদশাহকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। সেদিন ফর্‌রুখসিয়রের রাজ্যের শেষ দিন। বিশ্বাসঘাতক মুসলমান ও রাজপুত সেনানীদিগের মধ্যে কেহই হতভাগ্য বাদশাহের সাহায্যে অগ্রসর হইল না দেখিয়া ইতিকাদ খাঁ, ইস্‌লাম খাঁ, মুখ্‌লিস খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সামান্য সেনানায়ক নগরীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিল্লা দিল্লীর-দরওয়াজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু নির্লজ্জ রাজপুত অজিত সিংহ ও সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ এই সৈন্যের উপরে গোলা চালাইতে আরম্ভ করায় তাঁহারা হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। ইতিকাদ খাঁ আহত হইলেন। এই সৈন্যদিগের মধ্যে শিক্ষিত সৈন্য ছিল না, যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহারা কিল্লার কামানের গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে পলাইল।

তৃতীয় প্রহর বেলা শেষ হইলে হাজার সওয়ার লইয়া অসীম যখন পুরাতন দিল্লীর কাবুল ফটকের নিকট আসিলেন তখন করীদ খাঁ বাহির হইয়া বাদশাহী সড়কে দাঁড়াইলেন। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি খবর খাঁ সাহেব!” বিষণ্ণ

বদনে ফরীদ খাঁ কহিলেন, "সংবাদ শুভ নহে রাজা সাহেব, সমস্ত মুসলমান ও রাজপুত বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীন কিলিচ খাঁ অথবা আমীন খাঁ চীন বাদশাহকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে নাই। কিল্লা আক্রমণ করিতে গিয়া [illegible]দ খাঁ আহত হইয়াছে, বাদশাহের কোন খবরই পাওয়া যাইতেছে না। নূতন শহরের দিল্লী ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সৈয়দ্‌দিগের বখ্‌শী দিলাবর আলী খাঁ দিল্লী ফটকের উপর তোপ সাজাইয়া বসিয়া আছে, পাছে কেহ দক্ষিণ দিক হইতে বাদশাহের সাহায্য করিতে আসে। সরবুলন্দ খাঁ লাহোরের পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। চল দেখি, ঘুরিয়া অন্য দরওয়াজা দিয়া ফৌজ লইয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করা যায় কি না?"

ফরীদ খাঁর পরামর্শমত অসীম হাজার সওয়ার লইয়া দুই ক্রোশ পথ ঘুরিয়া আজমীর দরজায় আসিয়া শুনিলেন যে সহরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, হুসেন আলী খাঁর হুকুমে অস্ত্র লইয়া কেহ দিল্লী সহরে প্রবেশ করিতে পাইতেছে না। তখন আজমীর ফটকের বাহিরে, পাহাড়গঞ্জের সরাইতে ফৌজ রাখিয়া ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অসীম ও ফরীদ সন্ধ্যাকালে আজমীর ফটকের পথে দিল্লী শহরে প্রবেশ করিলেন।

দিল্লীর রাজপথ জনশূন্য। দোকান বাজার সমস্তই বন্ধ, পথে আলোক পর্য্যন্তও নাই। বহু কষ্টে অন্ধকারে পথ চলিয়া অসীম যখন বাসায় পৌছিলেন তখন রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। বাসার সংবাদ লইয়া ও আপাদ-মস্তক লৌহ

বর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া সংবাদ সংগ্রহের জন্য অসীম ও ফরীদ খাঁ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে বহির্গত হইলেন। চাঁদনী চকের নিকটে তাহারা পথে দুই চারিজন লোক দেখিতে পাইলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই সৈনিক এবং সৈয়দদিগের দলভুক্ত। কিল্লার দক্ষিণ দিকে আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনৎ-উন্নিসা বেগমের মস্‌জিদের নিকটে ফরীদ খাঁ দুই চারিজন পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাইলেন। ফরীদ ও অসীম তাহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে যুদ্ধে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের মধ্যে ইতিকাদ খাঁ ও তুরাণী মোগলদিগের মধ্যে আগর খাঁ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আহত হইয়াছেন। যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ হুসেন আলী খাঁ স্বয়ং বাদশাহ হইবেন।

তাহাদিগের সহিত অধিক কথা না কহিয়া ফরীদ ও অসীম যমুনার শুষ্কগর্ভে নামিলেন—এবং দিল্লী দুর্গের পূর্ব্বদিক দিয়া সলিমগড় দুর্গের নিকটে পৌছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে যমুনাতীর ও সুরক্ষিত, জাঠ রাজা চূড়ামণের অধীনে সৈয়দদিগের বেতন ভোগী বহু হিন্দু সেনা যমুনা গর্ভে শিবির স্থাপন করিয়াছে। কাবুল ও কাশ্মীর-ফটক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া অসীম ও ফরীদ যখন বাসায় পৌঁছিলেন তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রভাতে ফরীদ খাঁ একাকী নির্গত হইলেন, অসীম তাহাকে বলিলেন যে তিনি আজমীর ফটকের বাহিরে ফৌজের ব্যবস্থা করিতে যাইবেন। ফরীদ খাঁ প্রস্থান করিলে শৈল অসীমকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং অসীম অন্দরে আসিলে শৈল

তাহার সুন্দর মুখখানা বাঁকাইয়া কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে? অসীম বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে খবরে তোমার প্রয়োজন কি?" শৈ[illegible]ঙ্কা দিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি আবার রাত্রি বেড়ান অভ্যাস কেন? অভ্যাসটা দুর্গা ঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল, ঠাকুরাণী কি আবার আসিয়াছেন নাকি?" অসীম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "শৈল তোমার পাপ জিহ্বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুর দিয়া খাওয়ান উচিত।" শৈল বিকৃত কণ্ঠে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "দাড়াও আগে তোমার পুণ্যবতী ব্রাহ্মণীকে জীবন্ত কুকুর দিয়া খাওয়াই, তাহার পরে আমার জিহ্বা কাটিতে আসিও। কাল রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে বল?" অসীম অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "কিছুতেই বলিব না," শৈল বলিল, "তবে দুর্গা নেহাৎ আসিয়াছে?" অসীম উত্তর না দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং অশ্বারোহণে আজমীর ফটকে যাত্রা করিলেন।

আজমীর ফটকের ভিতরে আপাদ মস্তক বোরখা মণ্ডিত এক ভিখারিণী গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অসীম তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনিয়া তুমি কখন দিল্লীতে আসিলে?" মনিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর কাল সমস্ত দিন ভিক্ষা মিলে নাই, আট প্রহর খাইতে পাই নাই, খোদা আপনার মঙ্গল করিবেন, ঐ একখানা রুটীর দোকান খুলিয়াছে, দয়াময় একমাত্র আল্লার দিব্য আমাকে এক-খানা রুটী কিনিয়া দিন।" মনিয়ার অনুরোধ শুনিয়া অসীম

অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে বিশেষ উদ্দেশ্য না থা[illegible]ল মনিয়া কখনই ভিক্ষায় বাহির হইত না। আজমীর [illegible]কট একজন রুটী ওয়ালা দোকান খুলিয়া গরম রুটী [illegible] করিতেছিল, অসীম তাহার দোকান হইতে এক পয়সায় [illegible]খানি বড় রুটী কিনিয়া মনিয়াকে দিলেন, মনিয়া একখানা রুটী মুখে দিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বাহির করিয়া অসীমের অঙ্গে ছুড়িয়া মারিল, অসীম স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কুৎসিৎ ভাষায় অসীমকে গালি দিতে দিতে মনিয়া বাকী তিন খানা রুটী পথের কতকগুলা কুকুরের দিকে ছুড়িয়া মারিল। যে রুটী খানা সে অসীমের অঙ্গে মারিয়াছিল, তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন না দেখিয়া মনিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “কাফের, হারামখোর, হারামজাদ, নিমকহারাম আমি কি শূকর যে পথের ময়লা তুলিয়া খাইব? তুই হারাম তোর রুটী ও হারাম, তুই নরকে গিয়া তোর হারাম খা।” অসীম বুঝিলেন যে মনিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে রুটীখানা তুলিয়া লইতে বলিতেছে। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া রুটীখানা তুলিয়া লইলেন এবং এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে রুটীর ভিতর একটা কঠিন পদার্থ প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

অসীম রুটীখানা বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া পাহাড়গঞ্জের দিকে চলিলেন, ফটক পার হইয়া তিনি দেখিলেন যে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় হিন্দু ও রাজপুত জাতিকে গালি দিতে দিতে মনিয়াও বাহিরে আসিতেছে। তিনি একটা পুরাতন কবরের সম্মুখে ঘোড়া হইতে নামিয়া রুটীর ভিতর হইতে কঠিন পদার্থটা বাহির

করিলেন। অসীম দেখিলেন যে তাম্র নির্ম্মিত একখানা তাবিজের মধ্যে একখানা পত্র রহিয়াছে, পত্র দেখি[illegible] সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল কারণ পত্রখানি বাদশা[illegible] সিয়রের স্বহস্ত লিখিত। বাদশাহ লিখিয়াছেন,—

"দোস্ত, আজ আমি অন্ধ। নিমকহারাম আমার [illegible] উপর দিয়া তপ্ত শলাকা টানিয়া দিয়াছে। আজ আমি একা, কারণ আমার বাদশাহী ঘুচিয়া গিয়াছে। যদি প্রকৃত বন্ধু হও তাহা হইলে আমাকে মুক্ত করিও।"

পত্র পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বে মনিয়া সেই পুরাতন কবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনিয়া এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে?" মনিয়া কহিল, "কিল্লার লাহোর ফটকে ভিক্ষা করিতে গিয়া পাইয়াছি। তুমি এখন চলিয়া যাও, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ফরীদের সহিত দুইটা ঘোড়া লইয়া লাহোর-ফটকের বাহিরে থাকিও। আজমীর ফটকের পাহারা ঘুষ দিয়া বশ করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া পুনরায় অকথ্য ভাষায় রাজপুত রাজা অজিত সিংহকে গালি দিতে দিতে মনিয়া চলিয়া গেল; অসীম বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

উনাশীতিতম্ পরিচ্ছেদ

ঋণ পরিশোধ

ফর্‌রুখ্‌ সিয়রের অধঃপতনের ইতিহাস আজি সুপরিচিত। আবদুল্লা খাঁ প্রাসাদ ও অন্দর মহল অধিকার করিবার পরে হতভাগ্য বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌ সিয়র, তাহার শ্বশুর যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের আদেশে তাহার মাতা ও পত্নীর আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিউয়ান-ই-খাসে আবদুল্লার খাঁর সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক সৈয়দের আদেশে তাঁহার চক্ষুর উপর দিয়া তপ্ত শলাকা টানিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পরে বাদশাহ্‌ ফর্‌রুখ্‌ সিয়রকে দিল্লীর দুর্গের মধ্যে তির পোলিয়া-দরওয়াজার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। আবদুল্লা খাঁ ও হুসেন আলি খাঁ যখন নরপিশাচ অজিত সিংহের সহিত ফর্‌রুখ্‌ সিয়রকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিলেন তখন ফরীদ খাঁ ও অসীম তাঁহাকে মুক্ত করিয়া জয়পুরের রাজা জয়-সিংহের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

সমস্ত দিন বাসায় থাকিয়া সন্ধ্যার পরে অসীম যখন বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময়ে একজন হরকরা সংবাদ দিল যে একটী ভিখারিণী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। অসীম মনে মনে বুঝিলেন যে মনিয়া তাহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে তথাপি তিনি হরকরা ... খুলিলে
"ভিখারিণীকে সদর ফটকে অপেক্ষা করিতে বল, আমি
আসিতেছি।" কথাটা কেমন করিয়া অন্দরে পৌঁ...
তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার সম্মুখে একজন হরক...
জলন্ত মশাল লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। ভিখারিণী ম...
সে তাহার সর্ব্বাঙ্গ একটা মলিন জীর্ণ বোরখায় আবৃত করিয়া
আসিয়াছিল এবং অসীমকে দেখিয়া বোরখার মুখের পর্দ্দা খুলিয়া
ফেলিল। মশালের উজ্জ্বল আলোক মনিয়ার মুখের উপরে
পড়িতেই ত্রিতলের উপরে একজন হাসিয়া উঠিল। অসীম
বিস্মিত হইয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে ত্রিতলের
গবাক্ষে অবগুণ্ঠন শূন্যা শৈল দাড়াইয়া আছে এবং তাহার
সম্মুখে একজন দাসী একটা প্রদীপ ধরিয়া আছে।

শৈলের মনিয়া-দর্শন যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন কতদূর
বিষময় করিয়া তুলিবে অসীম তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।
তিনি বিরক্ত হইয়া ত্রিতলের বাতায়ন পথ হইতে মুখ ফিরাইয়া
লইলেন। মনিয়াও কিছু না বুঝিয়া বলিল "হুজুর আপনি এখন
বাহির হইবেন না। ফরীদ ও আমি সমস্ত ঠিক করিয়া
আপনাকে ডাকিতে আসিব।" মনিয়ার কথা শৈলের কানে
পৌঁছিলে সে আর একবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল
অসীম তাহা শুনিয়া আরও অধিক বিরক্ত হইলেন কিন্তু কিছু
বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মনিয়া বলিল, "অনেক
কষ্টে পাঠান আবুতুল্লা খাঁকে বশ করিয়াছি কিন্তু রতন চাঁদে

বাঙ্গ খবর দিয়াছে যে বাদশাহকে কাল হত্যা যা... স্থতরাং আজ রাত্রিতে যদি কিছু না করিতে পারা ...হইলে এত যত্ন, আয়োজন ও চেষ্টা সমস্তই বৃথা হইয়াছে। মনিয়ার কথা শুনিয়া অসীম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ...ন,—"দেখ মনিয়া, রাত্রিকালে তুমি একা আসিও না, ফরীদ খাঁকে সঙ্গে আনিও।" অসীমের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে শৈলের উচ্চ হাস্যধ্বনি অসীমের ও মনিয়ার কর্ণে প্রবেশ করিল, অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। মনিয়া সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইলে একজন দাসী আসিয়া অসীমকে বলিয়া গেল, "ঠাকুরাণী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনাকে শীঘ্র ডাকিতেছেন।" শৈলের ব্যবহারে অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দাসীকে বলিলেন, "একজন হরকরাকে বলিয়া দাও হাকিম ডাকিয়া আনে, তবে এতরাত্রে হাকিম পাইবে কি না সন্দেহ। আমি এখন পোষাক পরিতেছি আমার ভিতরে যাইবার বিলম্ব হইবে।" দাসী চলিয়া গেল, অসীম সর্ব্বাঙ্গে লৌহজাল নির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার তাহার উপরে পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল সুতরাং দিল্লীতে সেদিন ভীষণ শীত। অসীম একটা মোটা তুলার কুর্ত্তা পরিয়া তাহার উপরে একটা মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত চোগা পরিলেন, মস্তকে লৌহ নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ স্থাপন করিয়া তিনি যখন পাগড়ী

বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন তখন সেই দাসী ছুটিয়া
"হুজুর শীঘ্র আসুন, হকিম পাওয়া যায় নাই,
কেমন করিতেছেন।" অসীম দ্রুত পদে অন্দরে গি
যে শৈল তাহার শয়ন কক্ষের তলে পড়িয়া ছট্‌ফট ক
তখন পূর্ব্বের বিরক্তি ভুলিয়া অসীম পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে শৈল? এমন করিতেছ কেন?"
শৈল একটা বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য বিষ খাইয়াছি। মণিয়া যে রাস-যাত্রা করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহা নিজের চোখে দেখিয়াছি। অনেক সহ্য করিয়াছি আর পারিলাম না, এইবারে ডাহিনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিও। নারায়ণ সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়াছিলে সেই সম্পর্কে ডাকিয়াছি, আমার অন্তিমকালে আমাকে এই বিদেশে ফেলিয়া মণিয়ার সহিত স্ফূর্ত্তি করিতে বাগানে যাইও না, আমার প্রাণটা বাহির হইয়া গেলে যাইও।"

শৈলের কথা শুনিয়া অসীম স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেই সময়ে বহির্দ্বারে বংশীধ্বনি শ্রুত হইল, অসীম চমকিয়া উঠিলেন, শৈলও তাহা শুনিতে পাইল। এবং অসীমকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ঐ আসিয়াছে তোমার প্রেমময়ী রাধে আজ শ্যামের বাঁশি বাজাইয়া শ্যামকে যমুনা পুলিনে ডাকিতে আসিয়াছে। যাইও, কাল যাইও, মনের সুখে বিনা বাধায় ষোল শত গোপী লইয়া রাসলীলা করিও, কিন্তু আজিকার দিন ধর্ম্মের অনুরোধে

াক।" আবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, অসীম তাহা
াহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মানস পটে বাদশাহ ফররুখ্-
র কান্তি ও মলিন মুখ ফুটিয়া উঠিল, নিমেষের জন্য
াত্মহারা হইলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন যে রক্তবর্ণ
নির্ম্মিত উচ্চ নকারাখানার অন্ধকারময় কক্ষে বাদশাহ
ফররুখ্‌সিয়র উভয় বাহু বিস্তার করিয়া ডাকিতেছেন, "দোস্ত,
আজি তুমি আমাকে ভুলিও না, আমি ময়ুর সিংহাসনের কণ্টকময়
পিচ্ছিল পথে পদস্খলিত হইয়াছি, বাদশাহীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত
দুনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; বন্ধু, আজ এই
বন্ধুহীন ফরুরুখ্‌সিয়রকে পরিত্যাগ করিও না।" সঙ্গে সঙ্গে
অসীম শুনিতে পাইলেন বজ্রনাদে ত্রিবিক্রম বলিতেছেন, "তিনটী
কথা মনে রাখিও, বিপৎকালে স্ত্রীলোকের পরামর্শে চলিও না,
স্বার্থের জন্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না, জীবন-যৌবন-ধন-সম্পদ
সমস্তই তুচ্ছ।" সঙ্গে সঙ্গে আবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। অসীম
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শৈল, আমার সম্মুখে কঠোর
কর্ত্তব্য, বাদশাহ ফররুখ্‌সিয়র বিপন্ন, বন্ধুহীন নিরাশ্রয় ফরুরুখ্-
সিয়র আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসীম রায়কে স্মরণ করিয়াছেন আম
আমাকে ছাড়িয়া দেও, তুমি স্ত্রী—ধর্ম্মপত্নী, কর্ত্তব্যই একমাত্র ধর্ম্ম,
তুমি আমাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিও না; যদি ভুল
বুঝিয়া বিষ খাইয়া থাক তাহার এখনও সময় আছে, এখনও
উপায় আছে; আমি হকিম পাঠাইয়া দিতেছি, বাদশাহকে
যদি উদ্ধার করিতে পারি তাহা হইলে এখনই ফিরিয়া আসিব।"

অসীমের কথা শুনিয়া শৈল তাহার কণ্ঠ।
উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল, "আমা
যে তুমি! ওগো তুমি আমার মৃত্যুকালে এই বিদে
একা ফেলিয়া কোথায় যাইবে? অসীম উঠিতে যাই
তিনি শৈলকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন।
দাসীকে বলিলেন, "ছোট কর্ত্তাকে ডাকিয়া আন।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূপেন্দ্র আসিলেন। অসীম অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, মণিয়াকে দেখিয়া শৈল বিষ খাইয়াছে, অথচ বাদশাহের উদ্ধারের জন্য মণিয়া আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে। আমি যাইতে পারিব না। ভূপেন, সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য। মণিয়ার সঙ্গে যাও, জীবন পণ করিয়া বাদশাহের উদ্ধারের চেষ্টা করিও।"

অসীম উঠিয়া ভূপেন্দ্রকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন, অন্ধ যুবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। অশ্রু-অন্ধ নেত্রে অসীম তাহাকে বিদায় দিলেন কিন্তু শৈলের ওষ্ঠ প্রান্তে ক্রুর হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নিয়তিও হাসিল।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে ভীষণাকার দিল্লী দুর্গের প্রাকার বহিয়া অন্ধ ভূপেন্দ্র আকাশ চুম্বী নকারাখানায় আরোহণ করিতেছিল, দূর হইতে একজন পাঠানসৈন্য তাহাকে দেখিতে পাইল। মণিয়া সেই পাঠানকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়াছিল সুতরাং সে অন্যান্য প্রহরীদিগকে সতর্ক না করিয়া নকারাখানার ত্রিতলের একটী অন্ধকারময় কক্ষে গিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল,

যে পথে পেরেক লাগান হইয়াছিল সেই পথে আসিতেছে।" অন্ধ বাদশাহ ফরুরুখ্‌সিয়র উৎকণ্ঠিত ...মের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া পাঠান বলিল, "হজরৎ, আপনি ... হইবেন না, আমি আপনার বন্ধুকে এই স্থানে আনিতেছি।" ভূপেন্দ্র পেরেক বহিয়া প্রাকারের উপর উঠিবামাত্র পাঠান তাহার নিকটে গিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "আমি বন্ধু, নিকটে পাহারা আছে, সাবধান, আমার হাত ধরিয়া উপরে আইস।" পাঠান ভূপেন্দ্রের হাত ধরিয়া তাহাকে বাদশাহের নিকট লইয়া গেল, বাদশাহ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "দোস্ত, তোমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম, সেই সুদূর বঙ্গদেশে তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে এই নিমক-হারামের দুনিয়ায় তুমি কখনও নিমকহারাম হইবে না।" ভূপেন্দ্র বাদশাহকে তস্‌লীম করিয়া বলিল, "শাহান্‌শাহ্‌, কথা কহিবেন না, যে পথে আমি আসিয়াছি সেই পথেই আপনাকে যাইতে হইবে।" ফরুরুখ্‌সিয়র বলিলেন, "দোস্ত, আমি যে অন্ধ" ভূপেন্দ্র বলিল, "শাহান্‌শাহ্‌, আমাকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন, ...হা পাড়ার অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে প্রথমে আমার সহিতই আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি যে জন্মান্ধ।"

ফরুরুখ্‌সিয়র ভূপেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইলেন। অনশনে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়াছিল, কক্ষের বাহিরে আসিয়া ছিন্নবস্ত্রে পা জড়াইয়া তিনি পড়িয়া

গেলেন, পাঠান ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

বলিলেন, "দোস্ত্, তুমি পলাও, শব্দ শুনিয়া এখনই ছুটিয়া আসিবে!" ভূপেন্দ্র বাদশাহকে জড়াইয়া ধরি... "শাহান্‌শাহ্, অন্ন-দাতাকে মরণের মুখে ফেলিয়া নি... বাঁচাইতে পলাইব? এমন বংশে ভূপেন্দ্র রায় জন্মে ... দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে ভীষণ-মূর্ত্তি পাঠান প্রহরী ছুটিয়া আসিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই জনের বর্ষা শক্তিহীন অন্ধ যুবার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিল। ভূপেন্দ্রের দেহ দিল্লী-দুর্গের লাহোর-দরজার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া পাঠানগণ হতভাগ্য বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌সিয়রকে তাঁহার কারাগারে আবদ্ধ করিল।

শেষ রাত্রিতে হকিম আসিয়া শৈলকে যখন জোলাপ খাওয়াইতে গেল তখন সে বিকট হাস্যে অট্টালিকা কম্পিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি বিষ খাইতে যাইব কেন? তোমাকে মনিয়ার সঙ্গে যাইতে দিব না বলিয়া তামাকপোড়া খাইয়া ছিলাম।" হকিম ফিরিয়া গেল, অসীম উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন।

তখন পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে উষার মধুর হাসি ফুটিতেছিল সঙ্গে সঙ্গে ক্রূরা নিয়তিও হাসিতেছিল।

অশীতিতম পরিচ্ছেদ

"খতম্ শুদ্, বিল্ খয়ের্"

[illegible]দিন দিল্লী নগরী সহসা জাগিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র ভিক্ষুক [illegible]াহ্‌জহানের রক্তপ্রস্তরের দুর্গদ্বারে সমবেত হইল; তাহাদিগের সম্মুখে অবগুণ্ঠনশূন্যা মণিয়া ও উষ্ণীষবিহীন উদ্ভ্রান্তচিত্ত অসীম। লাহোর দরজার সম্মুখে সৈয়দদিগের সেনাগণ তাহাদিগের গতিরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল যে ত্রিপোলিয়া দরজার নিম্নে দুইটী শব পতিত আছে। বহু কষ্টে দিলাবর আলী খাঁর অনুমতি লইয়া অসীম লাহোর দরওয়াজার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। ত্রিপোলিয়ার উচ্চ তোরণের নিম্নে তালপত্র নির্ম্মিত ছিন্ন চাটাই জড়িত বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌সিয়রের শব পতিত ছিল; ফর্‌রুখ্‌সিয়রকে চিনিয়া অসীম কুর্ণীশ করিয়া বলিলেন, "শাহান্‌শাহ্, দুনিয়ার বাদশাহ, কাল তুমি দীন ও দুনিয়ার মালিক ছিলে আর আজ তোমার এই দশা!" তাহার কথা শুনিয়া আবদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলীর সৈয়দসেনাগণ পর্য্যন্ত অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, দূরে দুর্গদ্বারে দিল্লীর ভিক্ষুক সম্প্রদায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সহসা অসীম পাগল হইয়া উঠিলেন, তিনি ছুটিয়া দ্বিতীয় শবের নিকটে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, ভাইরে ভূপ!"

তখন ও ভূপেন্দ্রের মৃতদেহে বর্ষাদ্বয় বিদ্ধ ছিল, অসীম তাহা

"খতম্ শুদ্ বিল্ খয়ের্"

সযত্নে বাহির করিয়া ভূপেন্দ্রের মৃতদেহ কোলে উঠা
এবং তাহা মৃত বাদশাহের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিয়া
"শাহান্‌শাহ্, জহাঁপনা, আমি নিমকহারাম, আমি নি
আমি নিমকহারাম। কিন্তু তুমি অতীতের অন্ধকার প
যাও নাই, আমার ভূপ ভাই অন্ধকারে তোমাকে পথ দেখা
আসিয়াছিল, সেই তোমার সঙ্গে গিয়াছে। আমাদের পিতৃ ঋণ,
তোমার নিমকের ঋণ সে শোধ করিয়াছে; কিন্তু অন্তিম কালে
তুমি যাহাকে দোস্ত্ বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে সে রূপসী
যুবতীর বাহু পাশ ছাড়াইয়া আসিতে পারে নাই।"

অসীমের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সৈয়দ ও পাঠানসৈন্যগণ কাঁদিতে আরম্ভ করিল; দেখিতে দেখিতে বখ্‌শী দিলাবর আলী খাঁ ও সৈয়দ আলী খাঁ আসিয়া পৌছিলেন। বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌সিয়রের মৃতদেহ শবাধারে স্থাপিত হইল, দুই চারিজন দরিদ্র প্রভুভক্ত মন্সবদার ও খোজা ব্যতীত কেহই আসিল না। বাদশাহের শবাধারের সঙ্গে চারিজন হিন্দু ভূপেন্দ্রের শব বহন করিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে চাঁদনী চকের পথে সহস্র সহস্র নাগরিক সমবেত হইল, পথে প্রত্যেক গৃহের দ্বারে অবরোধ-বাসিনী ললনাগণ মৃত বাদশাহের দেহ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন; আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইল। নূতন শহরের দিল্লী দরওয়াজা ও পুরাতন শহরের কাবুল দরওয়াজার পথে উভয় শব হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে নীত হইল। সেই বিশাল কবরের গহ্বরে এক অন্ধকারময় কক্ষে বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌সিয়র সমাহিত আছেন।

...মাধি শেষ হইলে হিন্দুগণ যমুনাতীরে ভূপেন্দ্রের ...করিল। সৈয়দগণের আদেশে সহস্র সহস্র রুটী, তাম্র ...রা, মোগল সম্রাট-বংশের প্রাচীন রীতি অনুসারে, ...র সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল; মণিয়া এক খণ্ড রুটী তুলিয়া তাহাতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়া দিল; সে ...লিয়া উঠিল, "ভাই সব, নিমকহারামের রুটী নিমকহালালের হারাম।" তাহা দেখিয়া বিশ হাজার ভিক্ষুক রুটী ও মুদ্রায় নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া দিলাবর আলী ও সৈয়দ আলীর অঙ্গে ছুড়িয়া মারিল, তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

কলস ভরিয়া যমুনার জল আনিয়া ভূপেন্দ্রের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অসীম যখন যমুনা সৈকতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া মণিয়া বলিল, "জনাব, এইবার ঘরে ফিরিয়া চলুন!" অসীম উন্মত্তের মত মণিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঘর? কোথায় ঘর?" তখন মণিয়া হাসিয়া সস্নেহে অসীমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "বুঝিয়াছি ভাই, বুঝিয়াছি, গোপাল তোমাকেও ডাকিয়াছে। চল গোপালের ঘরে যাই।" ঊর্দ্ধদৃষ্টিনিবদ্ধ অসীম কহিলেন, "চল।"

তখন সদ্যঃ-স্নাতা সুসজ্জিতা শৈল অসীমের প্রতীক্ষা করিয়াছিল—আর নিয়তি হাসিতেছিল।

STATE LIBRARY

সমাপ্ত

ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১। বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম

২য় সংস্করণ, ৩২ খানি চিত্র সম্বলিত, মূল্য ৩৲ টাকা।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয়

৩১ খানি অপ্রকাশিত চিত্র সম্বলিত, মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন :—

"বাংলার ইতিহাস এই কয়দিনে একরূপ পড়িয়াছি, আমার এ অবস্থায় নূতন বই পড়ার যেরূপ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তার চেয়ে ভালই পড়িয়াছি। প্রথম ভাগ পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া সেইরূপ আনন্দ পাইলাম। কেবল আনন্দ কেন অনেক নূতন কথা শিখিলাম। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠান আমলের কথা সে কালের ষ্টুয়ার্ট ও লেথব্রিজের বহি হইতে যৎকিঞ্চিৎ জানিতাম এ দিকে নূতন তথ্য কি বাহির হইয়াছে তাহার কোনও খবর রাখি নাই। এই সকল বহি হইতে সে সকল কথা জানিয়া শিখিলাম, এ জন্য তোমাকে গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে গেলে যদি তোমার অকল্যাণ বোধ কর, তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম ... ... বাঙ্গালার ইতিহাস তোমার পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও তোমার নিকট ঋণী হইল, কেন না এখন হইতে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে হইলে বিদেশী পণ্ডিতদেরও এই বাঙ্গালা বহি আশ্রয় করিতে হইবে।"

W. THOMAS Librarian, India Office,

ার :—

Rakhal Das Banerji············is one of the
wn Indian workers in the field of Epi-
and Numismatics. His writings in English
haracterised by an open mind and the em-
ment of sound methods and reliable materials.
The two volumes of which the titles are given above should not be passed over in this journal simply because they are written in the author's native Bengali. It is indeed a gratifying fact that the modern devotion of Bengali writers to their own language should cover the production of works having so strictly sober and methodical character.

"Mr. Banerji's style is simple and entirely matter of fact, more so, indeed, than would be expected in an English work treating of the same subject. His statements are supported by constant citations of standard works on Indian Numismatics, Epigraphy and History and of the Orientalist journals—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, pp. 853-854.

PROFESSOR JADUNATH SARKAR.—

"············and lastly the monumental history (in Bengali) of Rakhal Das Banerji. They have all been indebted to coins and inscriptions (and in the case of the last two to literary sources as well) ·········The Student of Bengal's history cannot be at stay even with Rakhal Das Banerji's masterly work·········Modern Review, April, 1923.

প্রাচীন মুদ্রা—প্রথম ভাগ ২০ খানি চিত্র সম্বলিত,

মূল্য ২৲।

ভারতবর্ষের প্রাচীন মুদ্রার বিশদ বিবরণ ; ৫
ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই। ডাক্তার টমাস বলেন :—

"This volume may be cordially recomm to the attention of specialists, as late Supe dent of the coin department in the Indian Mus he writes with full competence, and his statemei are supported by constant refernce to the literatu.. —Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1917. page 858.

গ্রন্থকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাস-মালা

১। **শশাঙ্ক** (২য় সংস্করণ) মূল্য ২৲ দুই টাক।
২। **করুণা** „ ২৲ „ „
৩। **ধর্ম্মপাল** (৩য় সংস্করণ) মূল্য ৷৷০ আট আনা
৪। **ময়ূখ** (৩য় সংস্করণ) „ ৷৷০ „ „
৫। **পাষাণের কথা** (২য় সংস্করণ) মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর গল্পের বই

১। **গুচ্ছ** মূল্য ১৷৷০ টাকা।
২। **স্তবক** মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।
৩। **রসির ডায়ারী** মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।